আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা—৯

…তিনটে চারটে ছদ্মনামে

আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে ·

এক

..ামের রাস্তায় একটি বাঙালীর ছেলে ঘুরছে। হয়তো তার খুব একা একা লাগছে। কারুর সঙ্গে বসে দু'দণ্ড প্রাণের কথা বললে প্রাণটা খোলা-মেলা লাগতো। বিখ্যাত রোমের ভগ্নাবশেষের পাশ দিয়ে হাঁটছে দু'জন ভারতীয়। বাঙ্গালীর ছেলেটি ওদের দেখে উৎসাহিত হল। কিন্তু তখুনি ছুটে গিয়ে কথা বলতে পারলো না। আগে দেখা যাক, ওরা কোথাকার লোক। বাঙালী ছেলেটি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের কাছাকাছি গিয়ে পিছন পিছন হাঁটতে লাগলো। মুখের ভাব এমন, যেন সে দু'জনকে দেখতেই পায়নি। আসলে ছেলেটি কান খাড়া করে শুনছে, ওরা কি ভাষায় কথা বলছে। যদি বাংলায় হয়, তা হলেই একমাত্র সান্ত্বনা। তৎক্ষণাৎ তবে ডেকে বলা যায়, কি দাদা আপনারা কবে এলেন? এখন কোথায় চললেন? চলুন না একসঙ্গে যাওয়া যাক।

কিন্তু, ছেলেটি অনেক দূর অনুসরণ করার পর তবে বুঝতে পারলো —ওরা কি যেন এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে। হিন্দীও নয়, মারাঠী বা গুজরাতী, ছেলেটি যার এক বর্ণও জানে না। নিরাশ হয়ে গেল ছেলেটি। তা হলে আর ডেকে লাভ কি, একটাও তো প্রাণের কথা বলা যাবে না। সেই কথা বলতে হবে মুখে ফেনা-ওঠা ইংরেজিতে। ছেলেটি এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল—যাতে ওদের সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। ওরা দু'জনেও বোধ হয় ছেলেটিকে দেখেছিল, দেখে চিনেছিল বোধ হয় বাঙালী বলে, বাঙালীদের নাকি দেখলেই চেনা যায়, এরাও ডেকে কথা বলেনি। একই দেশের তিনজন মানুষ, দূর বিদেশে এসে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বললো না।

গ্লাসগোতে থাকে শীলা ভট্টাচার্যি। প্রত্যেকদিন সকালে চিঠির বাক্সের কাছে দৌড়ে যায়, যদি চিঠি বা 'দেশ' আসে তবু যা হোক খানিকক্ষণ বাংলা ভাষার জগতে থাকা যাবে নইলে যে শুধু নিজের সঙ্গেই কথা বলতে হয়। ইংরেজি আর ইংরেজি আর ইংরেজি, আর পারা যায় না। ল্যান্ডলেডি

খুব ভালো, পাড়া প্রতিবেশী খুব ভালো, কলেজে চমৎকার পরিবেশ। কোথাও কোনো অসুবিধে নেই, একমাত্র শুধু প্রাণ খুলে কথা বলতে না পারার কষ্ট। একদিন ল্যান্ডলেডির মেয়ে লিনডা এসে বললো, শীলা, আজ সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে একটা পার্টিতে যাবে।

—না ভাই, আজ আমার সন্ধ্যেবেলা অনেক কাজ।

—আহা, চলো না, প্রত্যেক দিনই তো ঘরে বসে বসে পড়াশুনা করছো। তা বলে শুক্কুরবারটা নষ্ট করবে?

—না ভাই, আজ বাদ দাও। গত সপ্তাহে আমার সর্দি হয়ে তিনদিন নষ্ট হল। আজ একটু মেকআপ করে নিতে হবে।

আসলে শীলার যে ইচ্ছা নেই, তা তো নয়। কিন্তু একে সারা সপ্তাহে একটাও চিঠি আসেনি বলে মন খারাপ, তার ওপর পার্টিতে গেলে শুধু যে ইংরেজি কথাবার্তা তা তো নয়। বিলিতি কায়দায় হাসতে হবে, হাঁটতেও হবে বিলিতি চালে! থাক বাবা, দরকার নেই! লিনডা তবু জোর করে বললো, চলো চলো, আজ বনির ওখানে একটি নতুন ইনডিয়ান ছাত্রও আসবে। ইউ ওনট ফিল লোনলি।

নতুন ভারতীয় ছেলে? যদি বাঙ্গালী হয়! শীলা ভট্টাচার্য তখনি রাজী হয়ে গেল। শীতকালে যদি বৃষ্টি হয়,' তখুনি রাজ্যের মন খারাপ হয়। তখন ভালো লাগে না বিদেশে একা থাকতে। যে কোনো কথা, আজবাজে কথা, কিন্তু বাংলায় বলার জন্য একজন সঙ্গী পেতে ইচ্ছে করে।

কলেজের ছেলেমেয়েদের পার্টি, খুব হৈ-হল্লা চলছে। তিনটে ঘর জুড়ে হুল্লোড়। নাচ শুরু হয়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে পানীয়। প্রথম ঘরে কোনো ভারতীয় নেই। দ্বিতীয় ঘরের কোণের দিকে একজন ভারতীয় পানীয় নিয়ে চুপ করে বসে আছে। ছেলেটিও যেন শীলাকে দেখে উৎসাহে দপ করে উঠলো। কাছে এগিয়ে এসে আলাপ হলো। শীলা তুমি একে চেনো? লেট মি ইনট্রোডুশ মিস্ ভট্···ভট্টাচারিয়া, মিঃ আয়েংগ্যার। আয়েংগ্যার? ভট্টাচার্যি? সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের উৎসাহ নিভে গেল। ভারতীয় হয়েও ওরা হয়ে রইলো বিদেশী। শুক্‌নো নমস্কার সেরে দু'জনে দু'দিকে চলে গেল। যদি ইংরেজিতেই কথা বলতে হতে হয়, তবে খাঁটি ইংরেজিতে বলা ভাল।

সানফ্রান্‌সিস্‌কোর ভারতীয় দূতাবাসে এসেছে একটি ভারতীয় ছেলে। ওর পাসপোর্টে মেক্‌সিকো যাবার এনডোর্সমেণ্ট করিয়ে নিতে। ধরা যাক ছেলেটির নাম অমুক মুখোপাধ্যায়। অফিস প্রায় খালি, ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় কর্মচারীটি আমেরিকান মেয়ে টাইপিস্টদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। আমাদের অমুক মুখোপাধ্যায় সানফ্রান্‌সিস্‌কোতে নতুন এসেছে কারুকে চেনে না। ভেবেছিল নিজের দূতাবাসে এসে চেনা পরিবেশ পাবে, নিজের কাজ ছাড়াও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করতে পারবে। কর্মচারীটি মুখে কেজো গম্ভীর ভঙ্গি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু?

ছেলেটি বিনীতভাবে নিজের দরকারের কথা নিবেদন করলো।

—দেখি পাসপোর্ট? বলার স্বর এমন যেন ছেলেটি ওঁর ভৃত্য কিংবা চাকরির জন্য ইনটারভিউ দিতে এসেছে।

পাসপোর্ট হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে লোকটি বললেন ইংরেজিতেই, পাশের মেয়েটিকে শুনিয়ে, কি নাম? মু-খো-পা-ড্যি-য়া-য়? জি! প্রিটি লং নেম!

আমাদের চেনা ছেলেটি এবার রেগে গেল। বক্র হেসে বললো, আর তোমার নামটা কি শুনি? নিজলিঙ্গাপ্পা না ভেঙ্গটেশ্বরম? বাঁদর কোথাকার!

আমেরিকান মেয়েটি অবাক! বিদেশে দেখা দু'জন ভারতীয়ের এই প্রথম সম্ভাষণ!

বিদেশেও ভারতীয় মাত্রই ভারতীয়ের স্বদেশবাসী নয়। দু'জন ভারতীয়ও পরস্পর নিজেদের কাছে বিদেশী। ভারতীয় হলেই চলবে না। তোমার আর আমার কি এক প্রদেশ? ভাষা কি এক? নইলে যাও, কোন বন্ধুত্ব নেই। পাশাপাশি হয়তো থাকে এক বাঙালী আর এক মারাঠী! দু'জনেই বেশ ভদ্র ও মার্জিত। তবু পুরো বন্ধুত্ব হয় না, প্রাণ খুলে কথা হয় না। দু'জনের সমস্যা হয়তো দু'ধরনের। বাঙালী ছেলেটি ভাবছে ইস্, কতদিন টাট্‌কা মাছ খাইনি! এ এণ্ড পি-তে টাট্‌কা মাছ এসেছে কিনা একবার খোঁজ করতে গেলে হয় না? মারাঠী ছেলেটির মাছের নামেই বমি আসে! তার দুঃখ, কতদিন তেঁতুলের আচার খায়নি! নিউ ইয়র্ক থেকে কয়েকখানা পাঁপড় এবার লিখে আনতেই হবে।

প্যারিসে কোন বাঙালী শিল্পীর বাড়িতে হয়তো চার-পাঁচজন বাঙালী বসে রবিবার সকালবেলা আড্ডা দিচ্ছে। ওরা প্ল্যান করছে আগামী রবিবার ওরা ভার্সাইয়ে গিয়ে সারাদিন থাকবে। এমন সময় ইলেকট্রিকাল এনজিনিয়ার যোগীন্দার সিং এসে হাজির হতেই ওরা চুপ করে গেল। এখন আর ও আলোচনা থাক, অন্য কথা হোক। কে কতটা ফরাসী শিখেছে তাই নিয়ে হাসি ঠাট্টা চলুক বরং। কারণ, এখন ওর সামনে রবিবারের পিকনিকের প্ল্যান করলে, ওকেও যেতে বলতে হয়। আর, যোগীন্দার গেলে কি প্রাণ খুলে বাংলা বলা যাবে! ওর সঙ্গে কথা বলতে হবেই ইংরেজিতে, ও যে একটা বর্ণ বাংলা বোঝে না। তা ছাড়া শুনতে হবে ওর হিন্দী!

আবার এক প্রদেশের বলেই যে সব সময় বন্ধু হবে তার কোন মানে নেই। বার্লিনে রঞ্জনা বোসের সঙ্গে দেখা হল শান্তা রায়চৌধুরীর। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন শান্তা! রঞ্জনাকে বললেন, আপনি কোন্ পাড়ায় থাকেন বলুন! আমিও সেখানে উঠে যাবো। উঃ, বাংলা কথা না বলে হাঁপ ধরে যাচ্ছে! খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে রঞ্জনা বললেন ইংরেজিতে, আমি বাঙালী হলেও বেশীর ভাগ থেকেছি বাংলাদেশের বাইরে, পড়েছি সাহেবী স্কুলে, বাবা মা আমাকে বাংলা শেখায় নি। কি লজ্জা যে হয় সেজন্য! রঞ্জনা বসুর সঙ্গে শান্তা রায়চৌধুরীর বন্ধুত্ব হল না। শান্তা বাড়িতে চিঠি লিখলেন— এখানে একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। কী দেমাকী মেয়ে বাবা! দেখলে গা জ্বলে যায়!

ল্যান্ডলেডি সদাশিব রাওকে বললেন, তোমাকে ঘর দিচ্ছি বটে, কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে বলে দিচ্ছি! আমি জানি, তোমরা ইনডিয়ানরা বড্ড নোংরা হও!

—কি করে জানলে?

—আগে যে আমার বাড়িতে একজন ইনডিয়ান ছিল। নোংরার হদ্দ

—কি নাম তার?

—পড্মা··পন্ল্···ওঃ এই যে লেখা আছে, পদ্মনাভ বড়ুয়া।

—ওঃ, অসমীয়া কিংবা বাঙালী! তা ওর জন্য তুমি আগে থেকেই আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন?

—কেন ? ও কি ইনডিয়ান নয় ? তোমার দেশের লোক নয় ?

থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন সদাশিব। না, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আসাম কিংবা বাংলা ভারতবর্ষেই, ঐ লোকটি পদ্মনাভ বড়ুয়া তারই স্বজাতি। কিন্তু সদাশিব রাও কোনদিন আসাম যান নি, জানেন না সেখানকার ভাষা, জানেন না আসামের লোকের খাদ্য কি, আচার ব্যবহার কি। আসাম কিংবা কাশ্মীর কিংবা উড়িষ্যার কোন ছেলেকে দেখলে তাকে বিদেশীর মতই প্রায় ব্যবহার করতে হবে। আর কলকাতার ছেলেগুলোতো অতি পাজী হয়! ইংরেজিতে বাক্যালাপ, মামুলি সম্ভাষণ। কিন্তু ল্যান্‌ডলেডির কাছে অস্বীকার করবেন কি করে যে, হ্যাঁ, লোকটি আমারই স্বজাতি ভারতীয়, বিদেশে ওর সুনাম ও দুর্নামের আমিও সমান অংশীদার।

দুই

একজন ভারতীয় তরুণ আমেরিকায় প্রবাসজীবন সেরে দেশে ফিরছে। ফেরার পথে ইওরোপ দেখা তার অতিরিক্ত লাভ। কারণ ইওরোপ ঘোরার জন্য তার আলাদা প্লেনের টিকিট কাটতে হবে না। যে ইওরোপ অনেক ভারতীর যুবার কাছেই স্বপ্নের জগৎ, আজ এই বিশেষ তরুণটির পক্ষে ইওরোপের যে কোনো শহরের অজানা পথে পথে ঘুরে বেড়ানো কত সহজ। যেখানে ইচ্ছে যাও, যে হোটেলে ইচ্ছে বসে বিশ্রাম নাও, যে-কোনো স্মৃতিস্তম্ভের সামনের মাঠের ঘাসে শুয়ে থাকো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোনো কাজ নেই, কোনো তাড়া নেই,—এমন কি বিস্ময়ও কোথাও বিপুল নয়। এক একটি জগৎবিখ্যাত দর্শনীয় স্থানের সামনে এসে সে বলতে পারে, জানতুম, এরকমই হবে। যতখানি কল্পনা করেছিলুম, তার চেয়ে বেশী কিছু দেখাতে পারেনি কেউ। তাই বুঝি সব ভ্রমণের সার মনসা মথুরা ভ্রমণ।

ছেলেটি একটি কাজ করেছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। বিদেশে গিয়ে খুঁজে খুঁজে অপর ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করে সময় নষ্ট করেনি। যে-দেশে

গেছে, সেখানে মিশেছে শুধু সেই দেশের লোকের সঙ্গে। আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলে সে চিনেছে আমেরিকা, ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ করে ইংলন্ড, তেমনি ফরাসী দেশ ও জারমানীতে এসে সে শুধু গ্রহণ করেছে ফরাসী ও জারমান বন্ধু। ওসব দেশের কয়েকজনের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয়ের সূত্র ছিল, কোথাও চিঠিপত্রে, কোথাও বন্ধুর বন্ধু হিসেবে।

একমাত্র রোমেই তার পরিচিত কোনো ইতালীয় ছিল না। অথচ রোম দেখার আগ্রহ ছেলেটির অসীম, রোমের দু হাজার বছরের পুরানো স্টেডিয়ামের প্রাচীর এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যে প্রাচীর সম্বন্ধে বলা হয়, যেদিন ঐ প্রাচীর একেবারে ভেঙে পড়বে, সেদিন রোম শহরেরও পতন হবে। আর রোমের পতন হলে পৃথিবীরও পতন। সেই রোম দেখবে না? কিন্তু সেই রোম কি সে দেখবে পেশাদার টুরিস্টদের মতো কনডাক্টেড টুরে? শুধু রোম কেন, সে দেখতে চায় ভেনিস, সম্পূর্ণ ইতালী। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ইতালীতে কোনো নির্ভরযোগ্য ইতালীয় বন্ধুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

বরং ইংলন্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে যেখানেই রোম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়, ঐ সব দেশের লোকেরা সকলেই একবাক্যে বলতো, রোমে যাচ্ছো? সাবধান!

রোমের সম্পর্কে ইওরোপের অন্যান্য দেশের অনেকের অভিযোগ এই যে রোমের মত এমন শিল্প-সুষমামণ্ডিত প্রাচীন শহরে ভ্রমণ করতে যেতে সকলেরই লোভ হয়, কিন্তু রোম বা ইতালীর যে-কোনো শহরই প্রায় জুয়াচোর-প্রতারকে ভরা। ইতালীতে জিনিসপত্র দরাদরি করে কিনতে হয়। রোমের হোটেলওলাদের ব্যবহার সাংঘাতিক, অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি ছাড়া তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা সম্ভব নয়। যেমন প্রথমে হোটেলে যাওয়া মাত্রই তারা অসম্ভব হাসিখুশী ব্যবহারের সঙ্গে আশাতিরিক্ত সস্তা দাম চাইবে। প্রসন্ন পর্যটক সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভাড়া নিয়ে মালপত্র রেখে চাবি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। কয়েকদিন পর ভ্রমণ-পর্ব সমাপ্ত করে হোটেল পরিত্যাগ করার সময়, যখন কাউন্টারে দাম চুকিয়ে দেবার জন্য দাঁড়ালেন, তখন হাতে পেলেন তাঁর নিজস্ব হিসেবের দুগুণ বা তিনগুণ একটি বিল। কী ব্যাপার?

ঘর ভাড়া তো অনেক কম বলা হয়েছিল ? আহা, সে তো শুধু ছিল ঘরভাড়া, তার সঙ্গে যোগ হবে ইলেকট্রিকের চার্জ, চাকরদের সার্ভিস, জলের খরচ, আর আপনাকে বলা হয়েছিল ছোট এক-বিছানা ঘরের খরচ, কিন্তু তার বদলে সে আপনাকে সুন্দর, প্রশস্ত, দু-বিছানার ঘর দেওয়া হয়েছিল !

এ ছাড়া, রোমের কুলিরা নাকি মালপত্র নিয়ে দরাদরি করে খুব। ট্যাক্সিওয়ালা এক নম্বরের ফেরেব্বাজ। অনেক ট্যাক্সির মিটার থাকে না বা মাঝপথে সুযোগ বুঝে মিটার খারাপ হয়ে যায়, তারপর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যা-তা ভাড়া হেঁকে বসে। ইটালীর রেস্টুরেণ্টগুলোও জোচ্চুরির জায়গা, একই খাবার একজন ইতালীয় খেয়ে গেল যে দাম দিয়ে, আরেকজন বিদেশীকে সেজন্য দিতে হল ডবল্। অনেক সময় ইতালীর আর ইংরেজি দু ভাষায় আলাদা মূল্য তালিকা ছাপা থাকে, কিন্তু ভাষা অনুযায়ী দামের অনেক হেরফের। আর সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে দাম নিয়ে বা টাকা পয়সা নিয়ে কোনো বিদেশী যখন তর্ক করতে চায়, তখন হঠাৎ সুযোগ মতো ইতালীয়রা একবর্ণও ইংরেজী বা কোনো বিদেশী ভাষা না বোঝার ভান করে উল্টে, দুর্বোধ্য ইটালীয়ানে কী যেন বক্‌বক্ করে যায়।

এই সব অভিযোগ ভারতীয়টি শুনলো ইওরোপের অনেকগুলো দেশে। প্রমাণ হিসাবে, সদ্য ইতালী ফেরৎ একজন ফরাসী তাকে খবরের কাগজের একটি অংশে আঙুল দিয়ে দেখালো। খবর বেরিয়েছে, ভেনিসের কয়েকটি হোটেলে পুলিশ অকস্মাৎ হানা দিয়ে শাসিয়েছে যে বিদেশীদের কাছ থেকে যদি আবার বেশী দাম নেওয়া হয় তবে ঐ সব হোটেলের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। সুতরাং আশা করা যায় রোমের বিশাল বিমানবন্দরে আত্মীয়হীন নির্বান্ধব দেশে ছেলেটি যখন প্লেন থেকে নামলো, তখন সে হয়তো মনে মনে দুর্গা নাম জপ করেছিল একবার। আগে থেকেই সে ঠিক করে নিয়েছিল রোমে ট্যাক্সি চাপবে না, কুলির হাতে মালপত্র সঁপে দেবে না, হোটেলের ঘর নেবে খুব সাবধানে।

এয়ার টার্মিনালের একটু দূরেই ক-একটি হোটেলের নাম জ্বলছে আলোতে। দুটি ভারী স্যুটকেশ দুহাতে বয়ে নিয়ে ছেলেটি চলেছে হোটেলের নাম পড়তে পড়তে। ক্লান্ত চেহারায় ওরকম স্যুটকেশ বওয়া, রাস্তার

লোক দেখছে ফিরে ফিরে। ছেলেটি হাঁটতে হাঁটতেই মনে মনে ইতালীর মুদ্রা লিরার সঙ্গে টাকা কিংবা ডলারের হিসেব ঝালিয়ে নিচ্ছে—যাতে ওদিক দিয়ে অন্তত কেউ ঠকাতে না পারে।' সামনে একটি হোটেল দেখেই ঢুকে পড়লে। একটিই ঘর খালি আছে। কত ভাড়া? বেশ সস্তা। সেয়ানা ছেলেটি প্রশ্ন করল, পরে আর কী কী চার্জ দিতে হবে? ভদ্র ম্যানেজার স্পষ্টভাবে বললেন, আর কিছু না, সার্ভিস চার্জ পর্যন্ত না, এবং ঐ টাকার মধ্যেই সকালের জল খাবার, এক বেলা খাবার ধরা আছে। আশ্চর্য, এ হোটেলটিকে দেখা যাচ্ছে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

পরদিন একটা ডলারের ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানো দরকার। মানেজারকে বললো। ম্যানেজার বললেন এখন তো পুরো টাকাটা নেই আপনি চেকটা রেখে অর্ধেক টাকা নিয়ে যান, বিকেলে বাকি টাকাটা নেবেন। কী সর্বনাশ। কোন ভরসায় রেখে যাবে, যদি বিকেলে বাকি টাকাটা দিতে অস্বীকার করে! অনেক টাকা অথচ ম্যানেজার চেকটির জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। একটা মুস্কিল এই, আমাদের পরিচিত ভারতীয় ছেলেটি একটু লাজুক ধরনের। মুখের ওপর কোন লোককে অবিশ্বাস করতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেকটি রেখেই এলো, সারাদিন কাটল বিরস মনে। বিকেলবেলা স্নান সেরে জামা-কাপড় বদলাচ্ছে, দরজায় টোকা দিয়ে ম্যানেজার এসে বাকি টাকাটা দিয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা ডিনার খেতে ঢুকল একটা রেস্টুরেন্টে। যে-কোন রেস্টুরেন্ট, আগে থেকে নাম না জানা। তার টেবিলের উল্টোদিকে একজন ইটালীয়ান। সব রকম খাবার-দাবারের নাম জানে না বলে ইটালীয়ান ভদ্রলোক যে-যে খাবারের নাম বললেন ইতালীয় ভাষায়, ছেলেটিও ঠিক সেইগুলোই পুনরুক্তি করে গেল। তারপর খেতে লাগল ঠুকঠাক করে, ধীরে সুস্থে। বেশ সুখাদ্য অন্য লোকটি চেনা খাবার চটপট খেয়ে দাম দিয়ে উঠে গেলেন। ছেলেটি আড়চোখে দেখে নিয়েছিল, তিনি কত দাম দিচ্ছেন। এবার দেখা যাক, একই খাবারের জন্য তার কাছে কত দাম চায়। অবাক কাণ্ড, তাকে বিল দেওয়া হল একটু কম টাকার। উচ্চারণের দোষে বুঝতে না পেরে, তাকে নাকি স্যুপ দেওয়া হয়েছে একটা অন্য কম দামের।

সত্যি আশ্চর্য কথা, রোমে তার সাতদিনের অবস্থানে একটি লোকও তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। কেউ তাকে ঠকাবার চেষ্টা করেনি। একেবারেই প্রতারিত না হতে পেরে বিরক্ত বোধ করে, সে শেষ চেষ্টা হিসেবে একবার ট্যাক্সিও চেপে বসল। গন্তব্যে পৌঁছুবার পর দেখা গেল, তার কাছে একটা বড় নোট, ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে পুরো খুচরো নেই। ড্রাইভারটি তখন পঞ্চাশ লিরা কম নিয়েই বলল, ঠিক আছে, আর দিতে হবে না! ছেলেটি বললো, না, না, তা-কি হয়, আমি টাকাটা ভাঙিয়ে নিচ্ছি কোথাও। ড্রাইভারটি চমৎকার হেসে বলল, গ্রাৎসি সেনর! ব্যস্ত হবার কী আছে। আপনি না হয়, পরে অন্য কোন ড্রাইভারকে বক্সিস দিয়ে দেবেন।

ভ্যাটিকান দেখে ফেরবার পথে বিকেলে বাসে যাবার সময় ছেলেটির পাশে এক সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলা বসেছেন, বারবার তাকাচ্ছেন ছেলেটির দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ দেশের ? ছেলেটি জানালো। ভদ্রমহিলা বললেন, আমি তোমাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে খুব কম জানি। কিন্তু কি সুন্দর তোমার গায়ের রং। পাকা জলপাইয়ের মতো। এমন রং আমি পেলে ধন্য হয়ে যেতাম!—এরকম কথা সারা পশ্চিম জগতে অন্য কোন অপরিচিত মেয়ে বলেনি। ছেলেটির মন পূর্ণ হয়ে গেল।

রোম, একি রহস্য তোমার। অর্ধেক পৃথিবীর কাছে শুনে এসেছি তোমার অধিবাসীদের বদ্‌নাম। অথচ ছেলেটি ভাবলো, আমার অভিজ্ঞতা অপরূপ সুন্দর, নিখুঁত, সারা পশ্চিম জগতের মধ্যে সবচেয়ে সু-ব্যবহার পেলাম। উপরন্তু একটি সুন্দরী মহিলার মুখে আমার গাত্র বর্ণের স্তুতি। ভাবতে ইচ্ছে হয়, রোম যেন এই ভারতীয় ছেলেটিকে বিশেষ রকম আন্তরিকতা দেখিয়েছে।

তিন

কোন কোন নতুন শহরে এসে পৌছুবার সময় মনে হয় কেউ আমার জন্য এয়ারপোরটে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঈষৎ ক্লান্ত রুক্ষ মুখে একটু এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পাবো কেউ আমার জন্য হাতছানি দিচ্ছে। মুহূর্তে কাস্‌টমসের সামনে দাঁড়ানো বিরক্তি অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

অসম্ভব এই আশা। জুরিখে আমি কারুকে চিনি না। এখানে কোথাও আমার কোনো হোমিওপ্যাথিক সম্পর্কের আত্মীয়-বান্ধব আছে বলেও শুনিনি। তা ছাড়া সেদিন জুরিখে আমার পৌছবার কথা আমি নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। তবু যুক্তিহীনভাবে আকাঙ্খা করছিলুম, কেউ আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে এয়ারপোর্টে।

এয়ারপোরট পেরিয়ে যখন আসছি, দেখি দূবে দাঁড়িয়ে এক বাঙালী ভদ্রমহিলা হলুদ রঙের শাড়ি-পরা, পাশে একটি দেবকান্তি শিশু এবং হ্যানডলুমের শারট পরা এক ভদ্রলোক—আগত যাত্রীদের দিকে দেখছেন। হয়তো ওঁরা আমারই জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, হয়তো আমার কোনো মাসীমা কিংবা বৌদির ননদ হঠাৎ এখানে এসেছেন আমি জানতুম না, কী করে ওঁরা আমার আসার খবর পেলেন ইত্যাদি এসব ভেবে লাভ নেই, নিশ্চয়ই ওঁরা আমারই জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। সারাক্ষণ ধরে বুক চাপা মন খারাপ, কোনো কারণ নেই তবু মন খারাপ, এক একটা নতুন শহর দেখবার আগেই একটা চমৎকার উত্তেজনা থাকে বুকের মধ্যে, আবার কোনো কোনো নতুন শহরে আসবার আগে মনে হয়—এই সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় আমার সম্পূর্ণ একাকীত্ব হয়তো এক এক সময় অসহ্য হয়ে উঠবে। মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে—অনেক সময় একা একা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও নিজেকে একা মনে হয় না, কিন্তু ক্রমাগত নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকলে, নিজের একাকীত্ব হঠাৎ বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে, তখন ইচ্ছে হয়, হঠাৎ কেউ পিছন থেকে আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলুক, আরেঃ তুই এখানে!

আমি সেই ভদ্রমহিলা, শিশু ও পুরুষটির ছোট্ট দলের দিকেই এগুতে লাগলুম। ওদের দেখলেই মনে হয় ওঁরা কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন, এই প্লেনেরই কোনো যাত্রীর জন্য। কিন্তু আমার এ প্লেনে আর তো কোনো বাঙালী যাত্রী দেখিনি। ওঁরা কি আমারই জন্য! আমার খুব দরকার একটি চেনা মুখ, আমি এই শহরে অচেনা আগন্তুক হয়ে থাকতে চাই না। আমি জানি, তবে জুরিখ আমার ভালো লাগবে না! জেনিভা আর জুরিখের মধ্যে রেষারেষি আছে, ফরাসী আর জারমান ভাষার মন কষাকষি। তা থাক, আমি আগে জেনিভা গেছি বলেই জুরিখের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু এই অকারণ মন খারাপের তো কোনো যুক্তি নেই। এরকম মন খারাপ থাকলে মনে হয়, কিছুই ভালো লাগবে না। অনবরত ভাঙা ইংরেজী বলতে বলতে মনে বোবা হয়ে গেছি।

আশ্চর্য, সেই ভদ্রমহিলা ও শিশুটি আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াতে লাগলেন। ওরা নিশ্চই ভুল করেছেন, আমাকে অন্য কেউ ভেবেছেন—আমার তো কেউ চেনা নেই এখানে, আমি যে জুরিখে আজ আসবো, তা তো আমি নিজেই জানতুম না গতকাল পর্যন্ত। কিন্তু ওদের ভুল হোক, ক্ষতি নেই—আমিও ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লুম। আমিও তো ওঁদের চেনা লোক বলে ভুল করতে পারি!

ওঁরা হাত নাড়া বন্ধ করলেন না। আর খুব বেশী দূরে নেই মহিলার লাবণ্যময় বাঙালী মুখ, শিশুটির বাংলা হাসি, পুরুষটির বাঙালী ধরনের সিগারেট টানা। কিন্তু, এ কথা নিশ্চিন্ত, এঁদের আমি আগে কখনো দেখিনি, আমার কোনো আত্মীয় হওয়া এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু আমি নিবৃত্ত হলুম না। ওঁদের তো এখনো ভুল ভাঙেনি। আমি তখনও হাত নেড়ে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে যেতে লাগলুম। আমার মন খারাপ অনেকটা কেটে যাচ্ছিল। ওঁদের কাছে তখুনি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিলুম। এবার একেবারে মুখোমুখি।

বিদেশে যা হয়, দেশের লোক দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া! আমি তখনও হাসিমুখে আশা করছিলুম ওঁরাই প্রথম কথা বলবেন। ওদের মুখে হাসি—পুরুষ ও মহিলাটি সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, হ্যালো মিঃ ব্যাবকক্!

আমি মুহূর্তে পিছনে তাকিয়ে দেখলুম, আমার পিছনেই একজন বুলডগ মুখো জারমান বিশাল থাবা বাড়িয়েছে ওঁদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করার জন্য। ওঁরা আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না।

এই তো স্বাভাবিক, ওঁদের চেনা কোনো লোককে নিতে এসেছেন। আমি কেউ নই, অন্য লোক, অচেনা—আমার সঙ্গে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনার জন্যই জুরিখ শহর একেবারে ভালো লাগলো না।

চার

প্যারিসে দেখা হলো পরিতোষের সঙ্গে, বিলেতে বিমান, আর ভবশংকর আর নন্দিতা, জার্মানিতে হৃষীকেশ, আমেরিকায় অসিত আর কৃষ্ণেন্দু আর আরতি মুখার্জি—ওরা আর ফিরে আসবে না! ওদের কারুকে আগে চিনতাম, অনেকের সঙ্গে প্রবাসে আলাপ হল, আরও তো বাঙালী বা ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় বিদেশে—অনেকেরই মুখ ভুলে যাই কয়েকদিন পর। কিন্তু দেখা হবার পর কয়েকটি কথার শেষেই যারা বলেছে, আমরা আর দেশে ফিরে যাবো না, এখানেই আছি, তাদের মুখ কিছুতেই ভুলতে পারি না, ইচ্ছে হয় একটা অ্যালবামে ওদের খুশির মুখোস পরা চাপা বিষণ্ণ মুখগুলি জমিয়ে রাখি।

ভবশংকরদাকে চিনতাম খুব ছেলেবেলায়, ফুটবলের মাঠ থেকে রোজ সন্ধেবেলা জলকাদা মেখে ফিরতেন, সেই মূর্তিটাই মনে আছে। আমাদের বাড়ির রকে বসে আমার মাকে বলতেন, ছোট মাসীমা, চা-তো তৈরী করেছেন জানিই, একটু আদা দিয়ে তৈরী করবেন? সেই ভবশংকর হঠাৎ কী করে যেন বিলেতে চলে যান, তেমন লেখাপড়া শেখেননি, অথচ কী করে যে বিলেতে গিয়ে পৌঁছুলেন, কোনদিন আমরা জানতে পারিনি। সোহো'র একটা হোটেলে খাবার পর বিল দিতে গেছি হঠাৎ বেয়ারাটি

ललো, পয়সা দিতে হবে না। অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালুম, একটু চেনা চনা লাগলো, বেয়ারাটি বললো, কোথায় উঠেছিস ? সন্ধ্যের পর দেখা রতে পারবি ? ভবশংকরদা !

একটা বাড়ীর পাশাপাশি ছুটো ঘরে ভবশংকরদা আর হাসান সাহেব াকেন। ছু'জনেই এসেছেন পূর্ববঙ্গের একই গ্রাম থেকে। দেশ স্বাধীন বার আগে। ছু'জনের গভীর বন্ধুত্ব। কেউই আর ফিরে যাবেন না। বশংকরদা আমাকে হাজার প্রশ্ন করলেন, অন্তত পঞ্চাশ জনের খবর নলেন। কারুর কথা ভোলেননি, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির প্রতি মমতা, মামাদের বাড়ীতে বছর দশেক আগে একটা কুকুর ছিল, সেটার কথা মামাদেরই মনে নেই—অথচ সেটার মারা যাবার খবর শুনে ভবশংকরদা যন মুষড়ে পড়লেন।

জিজ্ঞেস করলাম, ভবশংকরদা, এই চোদ্দ-পনের বছরে তো আপনার এখানে মন বসেনি বুঝতে পারছি। ফিরে যাবেন না ?

—না রে !

—কেন ?

কী করবো ফিরে গিয়ে ? মুখ্য-স্থখ্য মানুষ। বামুনের ছেলে হয়ে সাহেবের দেশে তবু বেয়ারার চাকরি করা যায়, কিন্তু নিজের দেশে পারবো না। বেশ আছি এখানে। It's a fact.

আরতি মুখার্জি ছিল আমেরিকার একটি ছোট শহরে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যমণি। প্রায় সত্তর-আশী জন ভারতীয়দের মধ্যে ঐ একজনই ছিল কুমারী মেয়ে এবং স্থন্দরী। কে একটু ওর সঙ্গে কথা বলবে, বেড়াতে বা সিনেমায় যাবে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতো। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা টেলিফোন পেলাম। শুনুন, কেমন আছেন, আমি আরতি, আমি, মানে··· আমি কাল, ইয়ে··ইস···দেখুন কী রকম লজ্জা পাচ্ছি, আমি না পরশুদিন বিয়ে করেছি।

—বিয়ে করা হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ ! করে ফেললাম আর কি, আপনি তো ছুদিন ছিলেন না এখানে, তাই খবর শোনেন নি। অন্য ছেলেরা এমন সব বিচ্ছিরি আলোচনা করছে !

—সৌভাগ্যবানটি কে ?

—হ্যারল্ড। হ্যারল্ড ক্লার্ক !

—বাঃ ! ও তো খুব ভালো ছেলে। শুনে খুব খুশী হলাম।

—কাল আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট পার্টির আয়োজন করেছি। বেশী লোককে বলিনি, খুব ঘরোয়া, আপনি আসবেন কিন্তু।

—হায়, হায়, এ খবরে কত ছেলের যে বুক ভেঙে যাবে !

—আপনার যে যাবে না, সেটা ঠিক জানি। আপনি তো আমাকে গ্রাহ্যই করলেন না কখনো।

—আহা-হা ! তুমি এ রকম ভাবো, একথা যদি আগে জানতাম !

এরপর দু'জনের হাসি। টেলিফোন রেখে দিলাম।

আরতি মেয়েটি ছোটখাটো ফুরফুরে, ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলে না। কিন্তু আমি ওকে খুকী বলে ডাকতাম। যার সঙ্গে বিয়ে হল সেই হ্যারল্ড ক্লার্ক চমৎকার সপ্রতিভ ছেলে, সুন্দর স্বাস্থ্য ওর। বাবা আমেরিকান, মা ক্যানেডিয়ান। ওর সঙ্গে আরতিকে খুব সুন্দর মানিয়েছে। পার্টিতে কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর আরতিকে একা জিজ্ঞেস করলাম বাংলায়—হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে ? আর একটু ভাবা উচিত ছিল না ?

—কিন্তু আমার যে ভিসা ফুরিয়ে এসেছে। তিন বছরের জায়গায় সাড়ে চার বছর টেনেটুনে করেছি। এবার তাড়িয়ে দিত। কিন্তু আমি যেতে চাই না। আমি ফিরতে চাই না। আমি এদেশেই থাকতে চাই। এখন আমাকে ভিসা না দিয়ে দেখুক তো !

—কিন্তু ফিরতে চাও না কেন ?

—উপদেশ টুপদেশ দেবেন না বলছি ! চাই না তো চাই না। দেখুন আমি দেশে থাকতে বরাবর ইংরেজি ইস্কুলে পড়েছি। বাড়িতে ছিল বিষম সাহেবী আদবকায়দা। বাবা-মা চাইতেন যে, আমরা সাহেব মেমের মতো থাকি। বাড়িতে যখন এরকম শিক্ষাই পেয়েছি তখন সত্যিকারের সাহেবদের দেশেই যে আমার ভালো লাগবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ! মিথ্যেমিথ্যি এখন আর ভারতীয়ত্ব দেখিয়ে লাভ কি ? তাছাড়া, আমি হ্যারল্ড ক্লার্ককে ভালবাসি।

আহা, ভালবাসা-টালবাসার কথা থাক। বললে ওটাই প্রথমে বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু তুমি বড়লোকের মেয়ে। দেশে থাকলে তোমার নির্ঘাৎ কোন ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হতো, এখানে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হলো ক্লার্কের সঙ্গে!

কৃষ্ণেন্দু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলাম। সাত বছর ধরে আমেরিকায়, ফেরার নামটি নেই! বিষম লাজুক, গোবেচারা ধরনের ছেলে ছিল, ধুতি ছাড়া প্যানটালুন পরত না কোন দিন, এতদিন বিদেশে কি করছে কে জানে। ওর ছোট বোন আমাকে চিঠি লিখে জানাল দাদার একটু খোঁজ করুন না। মাসে মাসে শুধু টাকা পাঠায় বাবার নামে, কিন্তু চিঠি লেখে না। ওকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমেরিকায় তিন বছর থাকার পর দু'বছর গিয়ে কানাডায় ছিল, তারপর আমেরিকায় আবার ফিরে নাগরিকত্ব পাবার চেষ্টা করছে কৃষ্ণেন্দু, শুনলাম। কিন্তু ও থাকে আমার চেয়ে দেড় হাজার মাইল দূরে, দেখা করা সহজ নয়, সুতরাং আমি একটা চিঠি লিখলাম ওর নামে।

হঠাৎ একদিন মাঝ রাত্রে টেলিফোন। লং ডিসটেন্‌স কল। কৃষ্ণেন্দুর গলা। 'এই শূয়ার, তিনবার টেলিফোন করে তোকে পাইনি! চার মাস হলো এখানে এসেছিস্ আর এখনও আমার সঙ্গে দেখা করলি না? তুই আসবি, না আমি যাবো? কালই চলে আয়!'

কী স্মারট্, তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ হয়ে গেছে কৃষ্ণেন্দুর। যে ছিল মার্কামারা ক্লাশে-ফার্স্ট হওয়া লাজুক ভাল ছেলে। কত বদলে গেছে। বললুম, দাঁড়া, দাঁড়া, অতদূরে চট্ করে যাওয়া সহজ! পয়সা কোথায়? ক্রিসমাসের সময় নিউ ইয়র্কে যাব, ওখান থেকে তোর বাড়িতে।

—তাহলে কখন বাড়ি থাকিস্ বল্? প্রায়ই তোকে টেলিফোন করব।

—সেকি রে! ঘন ঘন লং ডিস্‌টেন্‌স কল? তোর পয়সা খুব বেশী হয়ে গেছে বুঝি? বরং চিঠি লিখিস।

—গুলী মারো পয়সা! ডলারের নিয়মই হচ্ছে, যেমন পাবে তেমনি ওড়াবে। ওসব চিঠিফিটি লেখা আমার দ্বারা হয় না। তাওতো তোকে আবার লিখতে হবে বাংলায়! ঝঞ্ঝাট!

এখনও গোপনে বিয়ে করেনি, একাই থাকে, তবু কৃষ্ণেন্দু তিনখানা ঘরের বিশাল অ্যাপারট্‌মেণ্ট ভাড়া নিয়ে আছে। রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ-রেকর্ডার, রেডিওগ্রাম, গোটাতিনেক ক্যামেরা, সিনেমা প্রোজেক্‌টার--ইত্যাদি। বিচ্ছিরি জিনিসে ঘর ভর্তি। দরজার সামনে ঝকঝকে মোটর গাড়ি। ওয়ার্ডরোবে আধশো সৌখিন পোষাক। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ছাত্র ছিল, কি যেন একটা গবেষণা ধরণের কাজ করে প্রচুর টাকা পায় শুনলাম। আমাকে দেখে কৃষ্ণেন্দু হৈ হৈ করে উঠলো। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর বলল, গ্যাখ, তুই এসেছিস্ এখন তিন চারদিন খুব হুল্লোড় করব, খাদ-দাব ফুর্তি করব, আমার গাড়িতে তোকে নায়েগ্রা ফল্‌স দেখিয়ে আনছি চল্—কানাডার ওপাশ দিয়ে, কিন্তু খর্বদার বলে দিচ্ছি আমার দেশে ফিরে যাবার কথা তুলে প্যান প্যান করবি না!

বললুম্ যা যা বয়ে গেছে আমার। ভারতবর্ষের ঐ জনসংখ্যা, তোর মত কিছু কিছু কমে গেলেই তো বাঁচি!

কিন্তু ফিরে যাবার প্রসঙ্গ কৃষ্ণেন্দু নিজেই তুললে। জানিস্, গাড়ি চালানো আমার এমন নেশা হয়ে গেছে! যখন কোন কাজ থাকে না, গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শ' খানেক মাইল এমনিই ঘুরে আসি। এটা আমার সাত নম্বর গাড়ি। গরীবের ছেলে, কোনদিন গাড়িতে চড়ার স্বপ্নই দেখিনি, এখন ইচ্ছে মত গাড়ি কিনছি। গত ফলে (শরৎকালে) গাড়ি চালিয়ে আরিজোনা গিয়েছিলাম। আড়াই হাজার মাইল, ভেবে গ্যাখ! কী চমৎকার ছিল সেই গাড়িটা, সাদা রং ঝকঝকে নতুনের মত, ঠিক যেন রাজহাঁস। কিন্তু কী হল জানিস্ গাড়িটার সব ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে কোথায় যেন ক্রীক-ক্রীক করে শব্দ হতে লাগলো। কোথা থেকে শব্দটা বেরুচ্ছে কিছুতেই বুঝতে পারি না, সব খুলে দেখলাম—কোন ক্রটি নেই, অথচ আমি শুনতে পাই। গাড়ি চলবে বেড়ালের মত, কোন শব্দ হবে না—আশী মাইল স্পীডে চললেও। কিন্তু আমার গাড়ীটা--অন্য লোক চড়ে কিছু শুনতে পায়নি, অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু আমি একা ঠিক শুনতে পেতাম ক্রীক্, ক্রীক্ ক্রীক্। শেষে কি করলাম জানিস্? জলের দামে অমন সুন্দর গাড়িটা বেচে দিলাম। এ গাড়িটা দেখবি—নিজের মুখে কি বলব—

আমি চুপ করে শুনছিলাম। কৃষ্ণেন্দু আপন মনেই বলল, ফেরার সময় শ্য একটা গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু কেনই বা ফিরব ?

—সত্যিই তো, কেনই বা ফিরবি ?

—বেশ করবো ফিরবো না! কী আছে তোদের দেশে ? গাড়ি নিয়েও মেনটেন করা সহজ। যা-তা সব রাস্তা! আর গেলেও তো খেতে পাব। যাদবপুর ইউনিভারসিটিতে পড়াতুম, চারশো কুড়ি টাকা মাইনে পেতুম, ার টুয়েন্টি! হাঃ হা, ঐ জন্য আবার ফিবে যাওয়া! নাকে খৎ দিচ্ছি!

—কে তোকে ফেরার জন্য মাথার দিব্যি দিচ্ছে রে!

—জানি কেউ দিচ্ছে না! কেনই বা দেবে! আগে দেশে থাকতে াারে দিতুম তিনশো টাকা, এখন হু'হাজার টাকা প্রত্যেক মাসে পাঠাই। রও বেশী পাঠাতে পারি—কিন্তু লোভ বেড়ে যাবে বলে, চেপে রেখেছি নিকটা। বাড়িতে এখন আর আমার ফেরার কথা ভুলেও লেখে না! ন লিখবে, জানে তো—ফিরে গেলে বড়জোর সাত আটশো টাকার ইনের চাকরি হবে আমার—সংসারে এখন যত বাবুয়ানি চলেছে—সব চ যাবে ? কেউ লেখে না। খালি লেখে আমার শরীর ভাল আছে না। অর্থাৎ আমি অসুখে পড়লে টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যাবে যে!

—ওরকম বাজে কথা বলিস না। তোর মায়ের কাছে নিশ্চয়ই কার চেয়ে তোর দাম বেশী।

—আমি মাকে ভুলিনি। কিন্তু মায়ের আরও ছেলেমেয়ে আছে। মা াদের মানুষ করে সুখে থাকুন। আর সত্যিই বল, টাকার কথা ছেড়েই লাম। দেশে ফিরলে আমাদের লাইনে রিসার্চ করার সুযোগ আছে ? না াছে যন্ত্রপাতি, না আছে কোন আধুনিক ধারণা—

—বাজে কথা বলছিস্ এবার! তোর আবার রিসার্চ কি রে ? তোকে নি—তুই মুখস্থ করা ভাল ছেলে, মেধাবী; কিন্তু বিজ্ঞান পড়েছিস লই কি তুই বৈজ্ঞানিক ? তুই নেহাৎ একটা টেকনি-সিয়ান। তোর ত্যিই নতুন কিছু আবিষ্কার করার ইচ্ছে আছে ? না সে জিনিসই াদের মধ্যে নেই আমি জানি, ওসব রিসার্চের নামে বড় বড় কথা বলিস টাকা পাচ্ছিস, টাকার নেশা ধরেছে, থেকে যা!

—আচ্ছা, টাকাও কি কম কথা। আমি মহাপুরুষ নই যে টাকা
আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারবো। প্রতি মাসে ডলার পাঠাচ্ছি, ভার
সরকারের ফরেন এক্সচেনজ লাভ হচ্ছে। টাকার জন্য এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য
মজা উল্লাস পাচ্ছি—আমি এই নিয়েই থাকবো। যখন যেখানে খুশি বেড়াতে
যাব। এখানেই একটা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতব, ইচ্ছে হলে
এইতেই আমার সুখ।

—সুখ? কৃষ্ণেন্দু তুই এখানে থেকে যাতে চিরকাল সুখে থাকতে
পারিস—আমি মনে প্রাণে তাই কামনা করব।

এর পর সর্ত করেই আর আমরা দেশে ফেরার কথা আলোচনা করব না
ঠিক করলাম। আমারও ইচ্ছে নেই। নিজের জীবনের গতি ঠিক করার
জন্য প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনতা আছে। কয়েকটা দিন আমরা প্রচু
খাওয়াদাওয়া, ফিল্ম দেখা, গাড়িতে চড়ে পাগলের মত ঘোরাঘুরি করলাম
একদিন রাত্রে খাওয়া শেষ করে আমরা দু'জনে তাস খেলতে বসেছি। বাইরে
অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে। বরফ পড়ার সময় দূরের কোন শব্দ শোনা যা
না, চারদিক অস্বাভাবিক নিঃশব্দ। আমরাও দু'জনে অনেকক্ষণ কোন কথা
বলিনি। হঠাৎ কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, ঠনঠনেতে এখনও বৃষ্টির দিনে
জল জমে? আমি গম্ভীরভাবে এক শব্দে উত্তর দিলাম, জমে।

—ভাস্করদের বাড়িতে এখনও তোদের নিয়মিত আড্ডা হয়?

—হয়।

—জানিস, আর দু'-একদিনে পরে সরস্বতী পূজো। কলকাতায় এ
সময় সব মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ী পরে ঘুরবে না?

—হুঁ।

—যাঃ, আর তাস খেলতে ইচ্ছে করছে না।

কৃষ্ণেন্দু হাতের তাসগুলো ফেলে দিয়ে উঠে গিয়ে জানলার কাছে
দাঁড়াল। তারপর বরফ পড়া দেখতে লাগল একদৃষ্টে। আমি ওর মুখের
দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। হঠাৎ আমার মনে হল এখন আর আমার
এ ঘরে থাকা ঠিক নয়। ওকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দেওয়াই বুঝি উচিত
আমি কৃষ্ণেন্দুকে কিছু না বলে নিঃশব্দে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পাঁচ

কিছুই মেলে না, না রে? পায়ের নিচে এই তো সত্যি সত্যি প্যারিস। সামনে স্যেন নদী, ঐ যে নতর্‌দাম গীর্জা—এসব সত্যি, যেমন তুই আমার সামনে বসে আছিস, আমি এই যে পা দোলাচ্ছি—এ সবই সত্যি। অথচ যা ভেবেছিলুম, তা কি মিলেছে? সত্যি করে বল্‌।

আমি বললুম, রেণু, তুই বোধহয় এবার কেঁদে ফেলবি? অমন গলা ভারী করে বলছিস কেন?

রেণু স্থির চোখে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। পুব হাওয়ায় ফুরফুরিয়ে উড়ছে ওর চূর্ণ চুল, সবুজ রঙা শাড়ীর সঙ্গে মেলানো পান্নার দুল দুটো চিকচিকিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, ডান হাতের তর্জনী চিবুকে ছোঁয়ানো, রেণু উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ রেণু ভঙ্গি বদলালো, মুখখানা কুঁচে বলল, তাই আয় না, দু'জনে মিলে ছেলেবেলার মতন ভেউ ভেউ করে কান্না সুরু করে দিই। তুই তো জন্ম ছিঁচ কাঁদুনে, একবার বললেই হল, চোখ দিয়ে গঙ্গা বইবে!

—বাজে কথা বলিস না।

—বাজে কথা? মনে নেই, ছোট কাকার পকেট থেকে সিকি চুরি করেছিলি, ধরা পড়ে মার খাবার আগেই কেঁদে ভাসালি?

—পয়সা চুরি করেছিলুম? কি মিথ্যাবাদী তুই রেণু?

—আহা-হা, এখন কোট-টাই পরে সাহেব সেজেছিস—তাই স্বীকার করতে লজ্জা! পয়সা কি তুই মোটে একবার চুরি করেছিলি? আমার পুতুলের বাক্সে ছ'আনা জমিয়েছিলাম—তা কে চুরি করেছিল? আমার সব মনে আছে!

—ভারী তো ছ'আনা পয়সা! নে, তোকে পাঁচ ফ্র্যাংক দিয়ে দিচ্ছি এখন। সুদে-আসলে সব শোধ হয়ে যাবে।

রেণু খিলখিল করে হেসে উঠলো। দুস্টুমি-ভরা উদ্ভাসিত মুখে বলল,

ভারী টাকা দেখানো হচ্ছে এখন। ছেলেবেলায় ছ'আনা বড় হলে এক হাজার টাকা দিলেও শোধ হয় না। তখন কাচপুঁতির মালা কিনতে পারি নি, সে দুঃখ আমার এখন ঘুচবে ?

—তখন কাচপুঁতির মালা কিনতে পারিস নি বলেই তো সে-কথা তোর এখনো মনে আছে !

-আমার সব মনে আছে।

—সব ? সেই তোর জ্যাঠামশাই-এর পিকচার পোস্টকার্ড·

রেণু আর আমি প্যারিসের নদী পাড়ে হেমন্ত সন্ধ্যায় বসে বসে শৈশব স্মৃতি মেলাতে লাগলুম। কলকাতার ভবানীপুর থেকে প্যারিস কত দূর, তার চেয়েও অনেক দূরে রেণুকে আমি ফেলে এসেছিলাম।

গত দশ বছরে বোধহয় রেণুর কথা আমার একবারও মনে পড়ে নি। তারও আগে রেণু নামে অন্য মেয়ের সঙ্গেও আমার ভাব হয়েছিল। হাজারীবাগে গিয়ে সুজিতের বোন রেণুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, বিকেলবেলা ব্যাডমিণ্টন খেলায় সে হতো আমার জুটি, তারপর একদিন ক্যানারি হিল্‌স-এ বেড়াতে গিয়ে আমরা ইচ্ছে করে হারিয়ে গিয়েছিলাম, কালকাসুন্দি ঝোপের আড়ালে গিয়ে আমি তাকে চুমু খেয়েছিলাম। জীবনে সেই প্রথম। স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে সুজিতের বোন রেণু আমার দিকে বিস্ময় বিহ্বল চোখে তাকিয়েছিল। আমি অতীব লজ্জা পেয়ে কিছুটা কথা বলার জন্যই বোকার মতন বলেছিলাম, জানো, আমি রেণু নামে আর একটা মেয়েকে চিনতাম। সে তখন ঈষৎ আলোছায়ায় সরে গিয়ে বলেছিল, সে বুঝি দেখতে খুব সুন্দর ছিল ! তাকে বুঝি তুমি···? আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিলাম না, না, সে একটা কেলটি রোগা মেয়ে, কানভর্তি পুঁজ···শুধু নামের মিল···

এক মেয়ের সামনে যে অন্য মেয়ের প্রশংসা করতে নেই, সেটা সেই সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ বয়সেই আপনা-আপনি জেনে গিয়েছিলাম। কিন্তু খুব বেশী মিথ্যে কথাও তো বলতে হয় নি। আজ আমার সামনে যে বসে আছে এই আঁটো শরীরের যুবতী, নারকোল পাতার মতন ঝকঝকে কালচে-নীল রং, চোখে মুখে বিচ্ছুরিত আলো—এই সেই ভবানীপুরের রেণু !

মহিম হালদার স্ট্রীটের এক পুরোনো বাড়িতে আমরা পাশাপাশি ভাড়াটে থাকতাম। রেণুর বাবা পোস্ট অফিসে কাজ করতেন, ওরা সাত ভাই-বোন ছিল, জিরজিরে নড়বড়ে সংসার। এতদিন আর একটা পোস্ট অফিসের কেরাণী কিংবা কোর্টের মুহুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে রেণুরও চার-পাঁচ সন্তান বিইয়ে চেতলা কিংবা উল্টোডাঙ্গায় সংসার পেতে বসার কথা ছিল। তার বদলে, রেণু অনর্গল ইংরেজি আর ফরাসী বলছে, ছুটি কাটাতে যায় সুইজারল্যাণ্ডে, নামের আগে ডক্টরেটের শোভা বা বোমা। জীবনে কিছুই মেলে না।

রেণু কিন্তু কিছুই মেলে না বলছে অন্য মানে ভেবে। এক হিসেবে ওর সবই ঠিকঠাক মিলে গেছে। রেণু আর আমি ছিলাম একেবারে সমান বয়সী। সাত বছর বয়েস থেকে বারো বছর পর্যন্ত আমরা একবাড়িতে পাশাপাশি ছিলাম। রেণু আর আমি এক ক্লাশে পড়তুম। রেণুর স্বভাব ছিল অনেকটা ছেলেদের মতন, কালো-রোগা চেহারা, প্রায়ই কানে পুঁজ হতো, দশ-এগারো বছর বয়সে রেণুর মাথায় উকুন হয়েছিল বলে ওর মা ওকে ন্যাড়া করে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট চুল, রেণু তখন অবিকল ছেলেদের মতন, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ছোটাছুটি করতো, আমি যখন ঘুড়ি ওড়াতুম, তখন লাটাই ধরতো রেণু। সুতো মাঞ্জা দেবার সময় ওকে দিয়ে হামানদিস্তেয় কাচ গুঁড়ো করাতুম। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই এনে ওকেও পড়তে দিতুম বলে রেণু আমাকে ওর মায়ের কুলের আচার চুরি করে এনে খাওয়াতো। রেণুর সঙ্গে ওরকম বন্ধুত্ব ছিল বলেই মেয়েদের সম্পর্কে কোন আলাদা কৌতূহল তখনও জাগে নি। আমি আর একটা মেয়ে যে কিসে আলাদা—তা বুঝি নি। হাফ প্যাণ্ট কিংবা ফ্রকের রহস্যের কথা মনে আসে নি। ছাতের ঘরে রেণু আর আমি—বারো বছরের দুই কিশোর-কিশোরী যখন পাশাপাশি শুয়ে বই পড়তুম—তখন কখনো আমার ইচ্ছে হয় নি রেণুর জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিই। চুমু খাওয়ার ব্যাপার তো জানতুমই না।

কিন্তু, সেই ভবানীপুরের এঁদো বাড়ির গুমোট সংসারে মাঝে মাঝে বিলেতের হাওয়া আসতো। রেণুর এক জ্যাঠামশাই বহুকাল ধরে ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী। কবে যেন ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি,

কোনদিন ফিরবেনও না। তিনি মাঝে মাঝে ওদের উপহার পাঠাতেন। কী সুন্দর সুন্দর সব প্যাকেট আসতো, রেণুদের ভাইবোনদের জন্য চমৎকার রঙীন সোয়েটার আর জামা। রেণুদের সেইরকম প্যাকেট এলে হিংসেয় আমার বুক জ্বলে যেত! আর আসতো ছবির পোস্টকার্ড। রেণুর জ্যাঠামশাই ফ্রান্স্, ডেনমারক্, হল্যান্ড বেড়াতে গেলে সেইসব জায়গা থেকে ছবির পোস্টকার্ডে ওদের চিঠি পাঠাতেন।

আমাদের পরিবারে কেউ কখনো বিলেত যাওয়া তো দূরের কথা, বাংলাদেশের বাইরেও আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। আমরা কখনো ওরকম চিঠি পাই নি। রেণু এই এক ব্যাপারে আমায় টেক্কা দিত। আলতো ভাবে পিকচার পোস্টকার্ডগুলো ধরে আমাকে দেখাতো, আমি হাত দিতে গেলে বলতো, এই, এই, ও রকম ভাবে ধরে না, বাবা বলেছেন, ছবির মাঝখানে আঙুল লাগলে ছবি খারাপ হয়ে যায়। আমি তখন রেগে বলতুম, যা যা, দেখতে চাই না, ভারী তো ছবি!

রেণু বলত, জানিস, আমিও একদিন বিলেতে যাবো! ইজেরের দড়ি ছিঁড়ে গেছে বলে বাঁ হাত দিয়ে ইজেরটা চেপে ধরা ঢলঢলে ফ্রকটা কাঁধ থেকে বারবার নেমে যাচ্ছে, কদম ছাঁটা চুল, নাক দিয়ে ফ্যাৎ ফ্যাৎ করে শিকনি টানছে একটা কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে—সে বিলেত যাবে! আমি হি-হি, ইল্লি আর টকের আলু, অত খায় না।

রেণু বলতো, হ্যাঁ, ছাখ না, জেঠু লিখেছেন, আমি ভালো করে লেখাপড়া করলে আমাকেও বিলেত নিয়ে যাবেন। বাবা তো লিখেছিলেন, আমি এবার ফার্স্ট হয়েছি।

আমি বলতুম, ভ্যাট্, মেয়েরা আবার বিলেতে যায় নাকি? দেখিস্, আমিই বরং একদিন বিলেত যাবো।

—তুই বিলেত যাবি? হি-হি, তুই তো অঙ্কে গাড্ডু পেয়েছিস এবার।

—তাতে কি হয়! আমি জাহাজে চাকরি নেবো, আমি নাবিক হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরবো।

—তোর যা প্যাংলা চেহারা, তোকে জাহাজে চাকরি দেবে না ছাই!

আমি তখন ঠাঁই করে রেণুর মাথায় একটি চাঁটি মেরে বলতুম, আমি ্যাংলা ? আর তুই কি রে কেলটি ?

তখন ঝটাপটি মারামারি শুরু হতো।

আবার যখন দু'জনে খুব ভাব থাকতো, রেণু আর আমি পাশাপাশি ায়ে গা ঠেকিয়ে বসে সেই ছবির পোস্টকার্ড দেখতুম। জ্যাঠামশাই-এর ঠি পড়ে পড়ে রেণু আমার তুলনায় বেশী জানতো, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে লতো, এই যে এটা দেখছিস, এটার নাম নতরদাম গীর্জা, সেই যে বইটা ড়লুম হাঞ্চব্যাক অব নতরদাম—সেই একই, একদিন আমি এটার পাশ ়য়ে হাঁটবো, ভেতরে ঢুকবো,···এটার নাম টাওয়ার অব লনডন, এটা াসলে একটা দুর্গ—ইতিহাসে পড়িস নি, এটার মধ্যে ওয়াল্টার র‍্যালেকে দী করে রেখেছিল—কত দেখার জিনিস আছে এর মধ্যে, জেঠু লিখেছেন ামাদের কোহিনূর হীরেও ওখানে আছে,···এই জায়গাটার নাম ভেনিস··· থানে জলের রাস্তা···আমি একদিন এখানে বেড়াবো, উঃ সেদিন যা লাগবে আমার !

আমি নেহাৎ গায়ের জোরে বলার চেষ্টা করতুম, দেখিস, আমিও ঠিক বো। হঠাৎ একদিন বিলেতের রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে ! ভারী তোর ্যাঠামশাই আছে, আমি একাই···

পরের বছর রেণুর বাবা পাটনায় বদলি হয়ে যেতে ওরা সবাই পাটনা ল যায়। আমরাও ভবানীপুরের বাড়ী ছেড়ে পাইকপাড়ায় উঠে গেলাম। ারপর, সেখানকার ইসকুলে বিমল বলে একটা গোঁপকামানো বখা ছেলের ঙ্গ ভাব হলো, সে আমায় ছাদের ট্যাংকের পাশে বসে সিগারেট খাওয়া আরও সব অসভ্যতা শেখাতে লাগলো, তার সঙ্গে আমি দুপুরে টিফিন ালিয়ে সিনেমায় যাওয়া শুরু করলুম। অর্থাৎ বড়দের নিষিদ্ধ জগতে বেশের উত্তেজনায় তখন আমি ব্যাকুল, তখন কোথায় রেণু হারিয়ে গেল। ণুর আর খোঁজ রাখি নি।

কিন্তু রেণুর সব মিলে গেছে। রেণু পড়াশুনোয় ভালো ছিল। াঠামশাই-এর বিশেষ সাহায্য নিতে হয়নি, রেণু এম. এস. সি-তে বটানিতে াস্ট ক্লাস পেয়েছিল, সুতরাং স্কলারশিপ পেতে তেমন অসুবিধে হলো না।

ছেলেবেলায় জ্যাঠামশাই-এর সেই সব পিকচার পোস্টকার্ড দেখে ওর (
বিলেত যাবার তীব্র ইচ্ছে জেগেছিল—সেই ইচ্ছের জোরেই ও পড়াশুনো
অত ভালো করেছে। ওদের পরিবারে তেমন শিক্ষার আবহাওয়া ছিল ন
ওর ভাই বোনরা কেউ বেশীদূর এগোতে পারেনি। রেণু আমাকে বলতে
তুই বিলেত যাবি কি করে? তুই তো অঙ্কে গাড্ডু পেয়েছিস! অঙ্ক ন
জানলে আর লেখা পড়া হয়? সেই রোগা কালো মেয়েটা কিন্তু অঙ্কে তখ
একশো পেতো। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে গর্বের সঙ্গে রেণু বলতে
দেখিস, আমি ঠিক বিলেত যাবো, জেঠুর কাছে থাকবো, কত দে
বেড়াবো, ইস্, তখন যা মজা হবে—আমার চেহারাও ভালো হয়ে যাবে··
ফর্সা হবো···

রেণুর সব মিলে গেছে: ফর্সা হয় নি বটে, কিন্তু শরীরে একটা সুস্বাস্থ্যে
উজ্জ্বল আভা এসেছে, রং মেলানো রুচিময় পোশাক, পাঁচ বছর বিলে
থেকে ও এখন ঝানু প্রবাসী। ছুটিতে সত্যিই সেই ছেলেবেলার স্বপ্নের ম
সুইডেন কিংবা ইটালি বেড়াতে যায়।

আর, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতন আমিও দৈবাৎ বিদেশে চ
এলাম, এবং রেণুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মাঝখানে কত বছর দেখ
হয় নি, শৈশবের চেনা ডাক এক মুহূর্তে মনে পড়লো। ভারতীয় দূতাবাসে
পারটিতে ভিড় ঠেলে রেণু আমার সামনে এসে বললো, কি রে নীলু, তুই
সত্যিই তুই···। দুর্ঘটনার মতন এই ছেলেবেলার কথা মিলে যাওয়া
কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না।

রেণু নদীতে একটা ঢিল ছুঁড়ে আবার বললো, কিছুই মেলে না, না রে?

আমি বললুম, কোথায় মেলে নি? তোর ছেলেবেলার সব কথাই তে
মিলে গেল!

রেণু উদাসীনভাবে ঠোঁট উল্টে বললো, দূর! কিছু না!

—তুই ঐ মাদ্রাজীটাকে বিয়ে করলি কেন?

রেণু মুখ ফিরিয়ে খানিকটা রাগী গলায় বললো, কী অসভ্য! 'মাদ্রাজীট
কি? নাম নেই?

—রাগ করছিস কেন? আমি অবহেলা দেখাবার জন্যে বলিনি

খটমটো নাম তো, কি নাম যেন? কানাড় চেনাস্বামী! হঠাৎ ওর সঙ্গে তোর কি করে বিয়ে হলো?

—হঠাৎ আবার কি! ভালো লেগেছে, তাই! তুই কি ভেবেছিলি আমি তোকে বিয়ে করার জন্যে বসে থাকবো? তোর মতন একটা হুঁৎকো কালো-ভাল্লুক!

—আহা, তুই পায়ে ধরে সাধলেও যেন আমি তোকে বিয়ে করতুম!

—তোর পায়ে ধরে সাধবো? কি ভাবিস রে তুই নিজেকে?

—রেণু, তোর কথাবার্তা এখনও কি রকম ছেলে-ছেলে! চেহারাখানা তো বেশ সুন্দর করেছিস, স্বভাবটা একটু মেয়েলি করতে পারলি না।

—মেয়েলি স্বভাব হলে আর এ দেশে টিঁকতে হতে না!

—বাজে কথা বলিস না। আমি কত মেমকে দেখেছি, কি নরম আর ঠাণ্ডা স্বভাব।

—ইস্, খুব মেম দেখা হয়েছে! তোকে কেউ পাত্তা দিয়েছে!

—তোর স্বামীর সঙ্গে তুই কি ভাষায় কথা বলিস্? সব সময় ইংরেজীতে?

—ও কি সুন্দর বাংলা জানে, তুই অবাক হয়ে যাবি। শান্তিনিকেতনে পড়তো।

সন্ধে গাঢ় হয়ে এসেছিল, ইফেল টাওয়ারের সব আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। ল্যাটিন কোয়ার্টার্সের দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল, কিছু লোক ছুটোছুটি করছে, বোধহয় কোনো আলজিরিয়ান চোর ধরা পড়েছে। আমরা উঠে পড়লুম। রেণুর স্বামী খুব সীরিয়াস প্রকৃতির মানুষ, লাইব্রেরীতে পড়াশুনো করতে গেছেন, আমাদের সঙ্গে ন'টার সময় মঁমার্তে'র একটা সিনেমা হলের সামনে দেখা করবেন। নতরদাম গীর্জার বাগানে কি সব খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, আজ ভেতরে ঢোকা যাবে না। আমরা দু'জনে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চাইলুম। কতবার সিনেমায় দেখেছি এসব, গীর্জার দড়ি ধরে ঝুলে কোয়াসিমোদা বিদ্যুৎবেগে এসেছিল এসমারেল্ডার কাছে···হঠাৎ আমার মনে পড়লো, রেণুর জ্যাঠামশাই-এর ছবির পোস্টকার্ডের

কথা! আমি রেণু, তোর মনে আছে? সেই ছবি, তুই বলেছিলি, একদিন এর সামনে দাঁড়াবো···এই তো আমরা দাঁড়িয়ে···সব মিলে গেল।

—কিছুই মেলে না!

—তার মানে?

—তুই বুঝবি না! ভালো লাগছে না! চল এখান থেকে চলে যাই···

—ভালো লাগছে না? কেন?

রেণু উত্তর দিল না। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো। রেণুর চেহারায় ব্যক্তিত্ব এসেছে, পাশ দিয়ে কত হালাকা ফুরফুরে ফরাসী সুন্দরীরা হেঁটে যাচ্ছে—তার মাঝখানেও আজ রেণুকে রূপসী মনে হয়। ছেলেবেলার বান্ধবীর হাতে হাতে ধরে বেড়াবার অপূর্ব মাদকতা ভোগ করছিলুম আমি, রেণুর হাতে সামান্য চাপ দিলুম! রেণু বললো, কি?

আমি বললুম, তোর ভালো লাগছে না কেন রে রেণু? আমার তো বিষম ভালো লাগছে!

রেণু ভ্রূভঙ্গি করে বললো, তুই আছিস বলেই ভালো লাগছে না। কেন যে মরতে তোর সঙ্গে দেখা হলো এখানে?

আমি অপমানিত বা আহত হবো কিনা ঠিক করতে পারলুম না, রেণুর গলার সুরটা ঠাট্টার কিনা বোঝা যায় না। জিজ্ঞেস করলুম, আমি আছি বলে? তোর স্বামীর জন্য মন কেমন করছে নাকি? বাবা রে বাবা, একটু পরেই তো দেখা হবে!

রেণু আমার দিকে রহস্যময়ভাবে তাকালো। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বললো, চল্, কোনো কাফেতে গিয়ে বসি। সাঁজেলিঝেতে যাবি? না থাক্, মঁমার্তেই গিয়ে বসা যাক্, ওখানে তো যেতেই হবে!

আমরা টুপ করে মাটির নিচে নেমে গেলুম। মেট্রোতে চেপে মঁমার্তে এসে ফের মাটির ওপরে উঠলুম। খানিকটা ঢালু রাস্তা ধরে নেমে এসে একটা মজার ধরনের কাফে রেণুই খুঁজে বার করলো—চত্বরের মধ্যে অনেকগুলো রঙীন ছাতার নীচে টেবিল পাতা, মৃদু আলো! স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ। রেণু ফরাসী বলে অনর্গল—হ্যাম স্যাণ্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিয়ে আমার

সঙ্গে এক বোতল ওয়াইনও নিল। একজন দাড়িওয়ালা আর্টিস্ট এসে বললো, মস্যিও-মাদাম, আপনাদের ছবি এঁকে দেবো? এক্ষুনি? মাত্র দশ ফ্রাঁ লাগবে—

আমি রেণুকে বললুম, ছবি আঁকাবি?

রেণু বললো, ভ্যাট! তুই শুধু নিজেরটা আঁকা!

—না দু'জনের একসঙ্গে।

—না! তুই আঁকা! আমি পরে এসে আমার স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে আঁকাবো।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, বিলেতে এলে কি হয়, আসলে একেবারে ভেতো বাঙালী। সংস্কারের ডিপো। কেন, আমার সঙ্গে একসঙ্গে ছবি আঁকালে কি হতো? সতীত্বে কলঙ্ক হতো!

রেণু হাত নেড়ে আর্টিস্টকে বারণ করে দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, নীলু, তোকে একটা সত্যি কথা বলবো? কিছু মনে করবি না?

—এত ভণিতা কেন? বল না!

—তোর সঙ্গে দেখা হয়ে আমার ভালো লাগছে না! কেন যে সেদিন পারটিতে আমি সেধে তোর সঙ্গে কথা বলতে গেলুম!

—আমাকে ভালো লাগছে না?

—না!

আমি থতমত খেয়ে গেলুম। উনত্রিশ বছরের জীবনে কম দুঃখ পাই নি, কিন্তু কোনো মেয়ে এ পর্যন্ত মুখের ওপর বলে নি, আমাকে ভালো লাগছে না। আর রেণু? আমার শৈশবের বান্ধবী, যাকে দেখে আমি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলুম, আকস্মিক বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটে নি, সেই রেণু।

আমি দীর্ঘ চুমুকে গেলাসের পানীয় শেষ করলুম। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট-দেশলাই গুছিয়ে নিয়ে বললুম, আমার রাস্তা চিনতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি আমার হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।

বিল মেটাবার জন্য আমি ফ্র্যাঙ্কোর নোটগুলো বার করছিলুম পকেট

থেকে, রেণু বললো, তোকে টাকা দিতে হবে না। আমি এখানে আর একটু বসবো। ও তো নটার সময় আসবে—

—আচ্ছা রেণু, আমি চলি।

—তোর একা থাকতে খারাপ লাগবে? কি করবো বল, তুই একটা অপয়া, তোর সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার ক্রমশ বেশী মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তুই বরং—

—ঠিক আছে, আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না, আমি একা থাকবো না, উইশ ইউ ভেরী গুড টাইম···

রেণু আর কথা না বলে চেয়ে রইলো, আমি চেয়ারের ওপর থেকে রেন কোটটা তুলে নিয়ে উঠে পড়লাম। আর পিছনে না চেয়ে বেরিয়ে পড়লাম রেস্তোরাঁ থেকে। সবে মাত্র রাস্তায় পা দিয়েছি, অমনি রেণু চেঁচিয়ে উঠলো, এই সুনীল, সুনীল, একটা কথা—

দৃশ্যটা এমনিতেই বিসদৃশ্য। পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে এসে ঢুকলো, তারপর মহিলাকে একা রেখে পুরুষের চলে যাওয়াটা দৃষ্টিকটু, তারপর রেণুর ঐ রকম বাংলা ভাষায় চিৎকার—অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। আমি বাধ্য হয়েই ফিরলাম। রেণু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে অকপট বিস্ময়, বললো, একটা কথা, তুই রাগ করছিস না তো? বুঝতে পেরেছিস তো, আমি কি বলতে চাই?

আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলুম না, অসম্ভব অভিমান আমার বুকে বাষ্প হয়ে জমছিল, তবু অতিকষ্টে স্বাভাবিক গলায় বললুম, না রে, রাগ করবো কেন? সবার তো আর ভালো লাগা একরকম নয়।

—ও মা, তুই সত্যি ভীষণ রেগে গেছিস। একটু বোস প্লীজ, একটুখানি—রাগ করিস না।

রেণুর কণ্ঠস্বর ব্যাকুল। হাত বাড়িয়ে আমার কোটের প্রান্ত ধরে আমাকে জোর করে চেয়ারে বসাতে চাইলো। আমি অগত্যা বসে রুক্ষ গলায় বললুম, কি ছেলেমানুষী করছিস, রেণু? সবাই দেখছে—ভাবছে আমি ঝগড়া করছি তোর সঙ্গে! আমাকে তোর ভালো লাগছে না—আমি চলে যাচ্ছি, সোজা কথা, এর মধ্যে রাগের কি আছে?

—তোকে আমার ভালো লাগছে না? কে বললো?

—তুই-ই তো বললি।

—আমি বললুম? কখন?

—কী ন্যাকামি হচ্ছে, রেণু? প্যারিসের রেস্তোরাঁ না হলে কান ধরে এক চাঁটি মারতুম। তুই চাস নি, আমি এখান থেকে চলে যাই?

টেবিলের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে আচ্ছন্নের মতন বসে আছে রেণু। আঙ্গুল দিয়ে টেবিলের ওপর দাগ কাটতে কাটতে বললো, আমার মনে হচ্ছে, তোর চলে যাওয়াই ভালো—তোর সঙ্গে দেখা হবার পর আমার কিছুই তেমন ভালো লাগছে না, কিন্তু তোকে আমার ভালো লাগবে না কেন?

—থাক, আর বলার দরকার নেই। রেণু, তুই নিশ্চয়ই জানিস, তোর সম্বন্ধে আমার কোনোই দুর্বলতা নেই। পনেরো-ষোল বছর তোকে দেখিই নি, তোর কথাও মনে ছিল না। হঠাৎ দেখা হলো, চিনতে পারলুম, স্বাভাবিকভাবেই সবার ভালো লাগে বিদেশে এরকম হঠাৎ দেখা হলে—এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হয়। এর মধ্যে বিশেষ ভালো লাগা মন্দ লাগা কিছু নেই। তুই যদি অন্য কিছু ভেবে থাকিস—

রেণু যেন আমার কথা শুনলোই না। বললো, তুই এখনও রেগে আছিস। তোকে ভালো লাগছে না, কখন বললাম? তোকে ভালো না লাগার মানে তো নিজের ছেলেবেলাকেই ভালো না লাগা! মুশকিল হয়েছে কি জানিস, ছেলেবেলাটাকেই এখন বেশি ভালো লাগছে। সেই জন্যই তো তোকে চলে যেতে বললাম!

—ধাঁধা সুরু করেছিস এবার। রেণু তুই অনেক বদলেছিস, চালিয়াৎও হয়েছিস খুব। আমার অত চালিয়াতি পোষায় না। আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা দুটোই খুব সরল

—তুই এখনো বুঝতে পারলি না? শোন, প্যারিসে এসেছি বেড়াতে, ঘুরবো, আনন্দ করবো, তাই করছিলুমও, হঠাৎ তোর সঙ্গে দেখা হলো। তুই তো আর কিছু না, তুই আমার ছেলেবেলা। ছেলেবেলার কথা মনে পড়তেই সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন আর এখানে কিছু ভালো লাগছে না। তোর ভালো লাগছে?

—ছেলেবেলাটা কি এমন মধুর ছিল !

—ছেলেবেলায় সেইসব স্বপ্ন ? ছেলেবেলায় ভাবতুম, এখানে এলে কি অসম্ভব ভালো লাগবে ! কই, সে রকম ভালো লাগছে ? সত্যি করে বল !

—আমার তো ভালোই লাগছে !

—তুই কিছু বুঝিস না ! কিংবা তোর ছেলেবেলার কথা মনেই পড়েনি। আমি যখনই ভাবছি ছেলেবেলার কথা, তখন কত বেশি ভালো লাগার কথা কল্পনা করতুম—সেই তুলনায় কি এমন···কিছুই মেলে না, এই তো প্যারিস, এই তো মঁমার্ত, এই তো শা নোয়া রেস্তোরাঁ—কিন্তু কি এমন মনে হচ্ছে এমন কিছুই না। তুই সব মাটি করে দিলি !

—আমি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই। এর আগে, আমার স্বামীর সঙ্গে বেড়াতুম, তুই বোধহয় ভুল ভাবছিস—আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনো ফাটল নেই, আমরা দু'জনে দু'জনকে খুব ভালবাসি, ও এমন চমৎকার লোক যে ভালো না বেসে পারা যায় না—ওর সঙ্গে যখন বেড়াই তখন আর সবার যেমন ভালো লাগে—আমারও সেই রকম, এখানকার যে আমি—তার ভালো লাগা ! কিন্তু তুই এলি আমার ছেলেবেলাটাকে নিয়ে, সেই চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখছি কিছুই মিলছে না ! কোথায় সেই অপূর্ব ভালোলাগার দেশ—ছেলেবেলায় যার কথা ভাবতুম ! এই যে প্যারিস—জগৎবিখ্যাত—এও হেরে গেল।

—রেণু, ছেলেবেলার মতন কি আর বয়স্কদের সত্যিই এত বেশি ভালো লাগে ? আমাদের তিরিশের কাছাকাছি বয়েস—এখন আর কিছু দেখে আচ্ছন্ন হবার মতন—

—সেই কথাই বলছি ! তোর সঙ্গে দেখা না হলে—আমার স্বামীর সঙ্গে বয়স্কদের মতন ভালো লাগতো—কিন্তু তুই কেন ছেলেবেলাটাকে···আর কেন যে পনেরো বছর বাদে ভূতের মতন এসে উদয় হলি—তাই তো মনে হলো, তুই চলে গেলেই আবার এখানকার বয়সে ফিরে আসবো, এখানকার চোখে সব কিছু—

—রেণু, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি চলেই যাচ্ছি ! কিন্তু একবার মনে পড়লে আর কি ভুলতে পারবি ?

ছয়

গ্রীস থেকে যখন কেউ কায়রো আসবেন বিমানে, সকালে আসবেন না। দুপুরেও না। রাত্রে আসার তো কোনই মানে হয় না। বিকেলে আসবেন, যখনও ঠিক সন্ধ্যে হয়নি, অথচ রোদ্দুরের তেজ মরে গেছে। আলো তখনও আছে, কিন্তু তাপ নেই।

আথেনসের বিমান বন্দরটা ছোট! এপাশে সমুদ্র, ওপাশে পাহাড়ের সারি, মাঝখানের সমতল উপত্যকায় ছোট্ট বাড়ি। আকাশে মেঘ নেই, গ্রীসের আকাশে কদাচিৎ মেঘ থাকে।

প্রতীক্ষা গৃহ থেকে হয়তো কিছুটা হেঁটে গিয়ে আপনাকে প্লেনে উঠতে হবে। অথবা প্লেন আসতে যদি দেরী হয়, কিছুটা হয়তো অপেক্ষা করতে হবে এয়ারপোর্টে। আপনার ভালই লাগবে, নাকে আসবে সমুদ্রের লবণ হাওয়া, আপনার বুকের মধ্যে একটু একটু ড্রিম ড্রিম শব্দ হবে।

না, আমি এয়ারপোর্টের বর্ণনা লিখতে বসিনি। একটি আলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করতে চলেছি।

গ্রীস ভ্রমণের চেয়ে, গ্রীস ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তটিও কম আকর্ষণীয় নয়। প্লেন আসার পর আপনি গিয়ে প্লেনে উঠলেন। সীট বেল্ট বাঁধলেন কোমরে, কানে তালা লাগানো শব্দ, হাওয়ার জাহাজ হাওয়ায় উঠলো।

তখনও আপনার বিশেষ কিছু মনে হবে না। প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা আপনার তো নতুন নয়, বরং বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, এখন যে-কোনদিন প্লেনে উঠেই কত তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌছনো যায়, সেই জন্যই আপনার ব্যস্ততা থাকে। এবার প্লেনে যখন শূন্যে উঠে সমান হয়েছে, উড়ে চলেছে সমুদ্রের উপর দিয়ে, আপনি কোমর থেকে সিট বেল্ট খুলে সিগারেট ধরিয়েছেন, ছেড়ে আসা গ্রীসের জন্য সামান্য বুক টনটন করছে। সেই স্বপ্নের গ্রীস, দেখা হয়ে গেল, এখন বিদায়। হয়তো আপনার ইচ্ছে হবে—যদি ভাগ্য-

বশতঃ জানালার ধারের সিট পান—জানলা দিয়ে একবার শেষবার গ্রীসের দিকে তাকাতে। শেষবার অ্যাক্রোপলিসের দিকে দেখে নিতে। আপনি পিছন ফিরে তাকাবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠবেন বিষমভাবে।

ওকি! পিছনের আকাশটা দাউ দাউ করে জ্বলছে শেষ গোধূলিতে। যেন ভয়ংকর আগুন লেগে গেছে গ্রীসে—আপনি আসার ঠিক পরেই কি একরকম অগ্নিকাণ্ড হলো? বিষম বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর একটু একটু করে আপনার মনে পড়বে—ঐ আগুন ইউরোপের আগুন। পিছন দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আপনি সামনের দিকে তাকাবেন। সামনের আকাশ নিকষ কালো। বিষম অন্ধকার ঐ মিশরের দিকে। মিশর নয়, সমস্ত প্রাচ্যে অন্ধকার। সূর্য প্রাচ্যদেশে আগে ওঠে, আগেই অস্ত যায়। তাই সামনের দিকে দেখবেন সন্ধ্যা নেমে গেছে, পিছনের দিকে তবুও শেষ সূর্যের আগুন।

তৎক্ষণাৎ আপনার মনে পড়বে আপনি পাশ্চাত্য দেশ ছেড়ে এসেছেন, এই মাত্র, আপনি প্রাচ্যে প্রবেশ করছেন। আমি ধরেই নিয়েছি, আপনি প্রাচ্যদেশের লোক, ভারতবর্ষের হয়তো কোন বাঙালী যুবা। আপনি নিজের দেশে ফিরছেন। আপনি এখন ভূমধ্যসাগরের উপরে আছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সন্ধিস্থলে, আপনার গা ছমছম করবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের একটি চরিত্র নদীয়া আর যশোর জেলার সীমান্তে একটি গাছতলায় দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল! এখানে দুটো জেলা এসে মিলেছে, দুই চরিত্র! আর আপনি এখন আছেন দুই পৃথিবীর মাঝখানে—প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে আপনি ত্রিশঙ্কু। সামনে অন্ধকার পিছনে আগুন। একদিন সভ্যতা জেগে উঠেছিল প্রাচ্যে, এখন অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। আর পিছনে, পাশ্চাত্ত্যে সভ্যতা এখন জ্বলছে দাউ দাউ করে, হয়তো শিগ্‌গিরই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এই উপলব্ধি মাত্রই এক ধরণের অলৌকিক অনুভব হবে আপনার; হঠাৎ আপনার গলা থেকে টাই খুলে ফেলতে ইচ্ছে হবে। মুখ ও নাক দিয়ে যুগপৎ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলা মাত্র আপনার মুখের চেহারা বদলে যাবে। ইউরোপ বা আমেরিকা—পশ্চিমের যে কোন দেশে থাকার সময় আপনার

মুখটা অন্যরকম হয়ে যায়—হাসি অন্যরকম, গলার স্বর অন্যরকম, হাঁটা অন্যরকম, চাহনি অন্যরকম। চেষ্টা করে ভুরু টান করে রাখতে হয়—নচেৎ অনিচ্ছায় বার বার ভুরু কুঁচকে আসে। জুতোর ডগায় ধুলো লাগলে অস্বস্তি হয়, প্যাণ্টের ক্রিজ ঠিক না থাকলে বিরক্তি আসে, বার বার নিজের গলার কাছে হাত চলে যায়—টাইয়ের গিঁট ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য। হাঁচি পেলে হাঁচা যায় না, সর্দি লুকোতে হয় রুমালে, খাবার পর ঢেকুর তোলা তো রীতিমত পাপ। চা খাবার সময় ভয় হয়—পাছে সপ্‌সপ্‌ শব্দ না হয়ে যায়। আর তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই—আসলে আপনি পুবের লোক—পশ্চিমে গিয়ে অন্যরকম। পশ্চিমে সাহেব-সুবোর পাশে দাঁড়ানো আপনার ছবি দেখে আপনার বাড়িতে সকলে বলেছে, ওম, কত বদলে গেছে! আসলে আপনি বদলান নি, যা বদলেছে তা আপনার অভিব্যক্তি, সাময়িকভাবে বদলেছে মুখের রেখা।

যেই মাত্র আপনি অনুভব করলেন, আপনি পশ্চিম ছেড়ে এসেছেন, অমনি—(না, আপনার কাঁধ থেকে ভূত নেমে গেল—একথা বলবো না, অনেকের শেষ পর্যন্ত নামে না—) আপনার সেই কৃত্রিম মুখের রেখা মিলিয়ে যাবে, আপনার উদ্ভাসিত মুখ সেই আপনার পুরোনো নিজস্ব মুখ। আপনার বোধ হবে আপনি নিজভূমিতে ফিরে এলেন—মিশর আপনার দেশ নয়, কিন্তু সেই একই মাটি—যে মাটির সঙ্গে আপনার দেশ যুক্ত। একা একা বসেও আপনার মুখের নিঃশব্দ হাসিটি মনে হবে বাংলা ভাষায় হাসি। আপনার মনে হবে হঠাৎ আপনার শরীর খুব হাল্কা হয়ে গেছে।

আমার মনে হয়েছিল।

সাত

কমনওয়েলথ রিলেসানস অফিসের তত্ত্বাবধানে ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হয়ে ছিলাম লণ্ডনে। একজন অমায়িক প্রদর্শক এবং সরকারী মোটরগাড়ি করে খুব ঘোরাঘুরি করছি। ব্রিটিশের অধীনে কলকাতা শহরে যখন ছিলাম তখন কম ভাড়ার জন্য ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে চড়েছি, কখনও পুরো ভাড়া বাঁচাবার জন্য হাওড়ার বাসে উঠে গেঁয়ো সেজে জিজ্ঞেস করেছি, এ বাস কি কালীঘাট যাবে? আর এখানে, ভূতপূর্ব রাজার গাড়িতে চেপে চলেছি তাঁরই দেশের উপর দিয়ে। কিন্তু অভিভূত হয়ে যাইনি, গাড়ি আসতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে ভুরু কুঁচকেছি, হোটেলের খাবার যথেষ্ট ভাল না হলে খুঁত-খুঁত করেছি। কিন্তু আমার প্রদর্শক-সঙ্গী যখন খুশি মুখে বললেন, কাল আমরা ফেবার এণ্ড ফেবার কোম্পানিতে যাবো—তোমার সঙ্গে টি. এস. এলিয়টের দেখা হবে—তখন আমি আঁৎকে উঠেছি! ত্রাস মিশ্রিত গলায় বলেছি, সে কি?

সঙ্গী বললেন, হ্যাঁ সত্যি, কাল এলিয়টের কাছে যাওয়া হবে!

—কেন?

—বাঃ, আমাদের প্রোগরাম সেইভাবে ঠিক করা। অতিথিদের যাঁর যেদিকে ঝোঁক, তাঁর সঙ্গে সেই ধরণের বিখ্যাত লোকদের দেখা করিয়া দেওয়া হয়। তুমি এলিয়ট, স্পেনডার, টি এল, এস-এর সম্পাদক আরথার কুক—এদের সঙ্গে দেখা করবে!

—এ তো মহা মুশকিল দেখছি!

সঙ্গী এবার বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন, এলিয়টের সঙ্গে দেখা করতে তোমার ইচ্ছে হয় না? এ এক কত বড় সুযোগ! তুমি নিশ্চয়ই এলিয়টের—

—হ্যাঁ পড়েছি। তুমি যদি চাও, আমি গড়গড় করে পাতার পর পাতা আবৃত্তি করে যেতে পারি। কিন্তু, তার সঙ্গে দেখা করার কি সম্পর্ক?

আমি কি ওঁর সামনে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবো, না বলবো, আপনি সত্যিই খুব ভাল লেখেন! ওঁর সামনে আমি সামান্য মানুষ—শুধু শুধু সময় নষ্ট করবো কেন ?

আমার সঙ্গী পিঠ চাপড়াবার ভঙ্গিতে বললেন, নিজেকে অত ছোট ভাবতে নেই। যতবড় প্রতিভাবানই হোন, উনিও একজন মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষ দেখা করতে যাবে—এ তো স্বাভাবিক। খুব বেশী বিনয় আবার হীনতাবোধ এনে দেয়।

আমি এবার একটু দুষ্টুমির হাসি ছাড়লুম। তারপর বললুম, শুধু তোমাকেই গোপনে বলছি, বিনয় মানুষকে অহংকারীও করে! আমি যে যেতে চাইছি না—সেটা আমার অহংকার থেকেই। আমি বীরপূজক নই। আমি ওঁর কাছে যেতে চাই না—কারণ, আমি ওঁর জীবনী, লেখা, আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। কিন্তু উনি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এরকম একতরফা কথাবার্তা আমার ক্লান্তিকর লাগে যাঁর সম্পর্কে আমি পরম শ্রদ্ধাশীল, তাঁর সঙ্গও একটু বাদে আমার বিরক্তিকর লাগে।

ঈষদুষ্ণ সকাল দশটায় ফেবার এণ্ড ফেবার কোম্পানির সামনে নামলুম। আমার অনিচ্ছুক মুখে ভদ্রতার হাসি ফোটাবার চেষ্টা করছি। দোতলায় নিরিবিলি অফিস, পুরোনো ধরণের বাড়ি—মনটিথ নামে একজন দীর্ঘদেহী প্রৌঢ়, যিনি ঐ কোম্পানির অপর অংশীদার, আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, প্রথমেই একটা দুঃখের কথা বলি, মিঃ এলিয়ট আজ আসতে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ওঁর শরীরটা একটু খারাপ!

ওরা কেউ লক্ষ্য করলো না—আমার বুক থেকে একটা বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। যাক্, বাঁচা গেল।

কিছুক্ষণ মামুলি ধরাবাঁধা কথা হলো। ইংলণ্ডের তরুণ কবিদের কবিতা কি-রকম বিক্রি হয়। ফেবার এণ্ড ফেবার থেকে কয়েকজন তরুণের বই লেখা প্রকাশ করা হয়েছে তাদের জনপ্রিয়তা—বাংলা দেশের কবিরা প্রকাশক পায় কিনা—ইত্যাদি। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাংলাদেশে এলিয়টের লেখা কেউ পড়ে কিনা।

আমি বললুম, বিক্রী দেখে বুঝতে পারেন না ? কলকাতায় কত বই বিক্রি হয়, নিশ্চয়ই জানেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার ধারণা, কলকাতায় কিছু ইংরেজী-ভাষী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আছে, তারাই···

—হা ভগবান ! যাক, এ বিষয়ে আর কিছু না বলাই ভালো। তবে একবার সিনেমা হলে আমি একটি সুবেশ, ইংরেজী-ভাষী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দম্পতি দেখেছিলাম, যাঁরা হ্যামলেটের গল্পও জানেন না !

মিঃ মনটিথ এবার বললেন, চলুন, এলিয়ট যে-ঘরে বসে কাজ করেন, সেই ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে আনি।

আমি আমতা আমতা করে বললুম, না দেখলেও চলে অবশ্য !

—না, না কোন অসুবিধে নেই।

একজন বিখ্যাত পুরুষ কোন্ চেয়ারে বসেন, কোন্ কলমে লেখেন, কোথায় থুতু ফেলেন, এসব দেখায় আমার বিন্দু মাত্র উৎসাহ হয় না কখনো। কিন্তু ওঁরা ভাবছেন, আমি বুঝি দেখলে ধন্য হয়ে যাবো।

—ঘরের এই যে দরজাটা দেখছেন, এটা ওঁর ঠাকুরদার বাড়ি থেকে এনে বসিয়েছেন। উনি একটু ঝুঁকে বসে কাজ করতে ভালোবাসেন, তাই দিনের বেলাতেও আলো। ঐ আরাম কেদারায় মাঝে মাঝে বসে বিশ্রাম করেন। ওঁর আজকের ডাকের চিঠিপত্র—উনি নিজের হাতে খাম খুলতে ভালোবাসেন।

এখানে আমি একটা মজার জিনিস দেখতে পেলাম। সেদিনের ডাকের ওপরেই একটা বাংলা বই। একটি চটি কবিতার বই। আমি সেটা তুলে নিয়ে উল্টে দেখলাম ! উদাসী বাঁশী—প্রাণকৃষ্ণ সাঁতরা। এই ধরনেরই লেখকের নাম ও বইয়ের নাম। আমি আগে কখনও শুনিনি সেই নাম। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে একজন শিক্ষক কিছু সরল পদ্য লিখে ছাপিয়েছেন —প্রথম পাতায় ভিক্টোরিয়ান ইংরেজীতে আধপাতা হাতে লেখা এলিয়টের প্রতি উৎসর্গ। সেই উৎসর্গবাণীর মর্মার্থ, আপনি এলিয়ট, আমার গুরু। আমি দূর থেকে একলব্যের মতো আপনার শিষ্য। আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় লিখি, আপনার কাজ থেকে ভাবের উৎস পাই। ইত্যাদি।

আমি মিঃ মনটিথকে বইটার ব্যাপারে বুঝিয়ে দিয়ে বললুম, আপনি লেছিলেন বাংলাদেশে এলিয়ট পড়ে কিনা ? এই দেখুন, এক গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছে।—তারপরই আবার যোগ করলুম, আচ্ছা, এলিয়ট এ বইটা নিয়ে কি করবেন ? নিরুপায় হয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতেই ফেলবেন আশা করি।

পরদিন হোটেলে সকালবেলা টেলিফোন। উৎফুল্ল গলায় মিঃ মনটিথ বলছেন, আপনার জন্য সুখবর আছে। এলিয়ট আজ অফিসে এসেছেন। আপনার কথা বলে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি! আজ তিনটের সময় আসুন!

টেলিফোনের এ পাশে আমার মুখ বিকৃত হয়ে গেল! এ আবার কি নতুন ঝঞ্ঝাট। কাল ভেবেছিলুম, খুব বেঁচে গেছি; আজ আবার—।

কিন্তু প্রত্যাখ্যান করা হবে চরম রূঢ়তা। ঢোক গিলে রাজি হতেই হল।

আমি ওঁর হাত ছুঁয়ে টেবিলের এ পাশে বসেছি। ভিতরে ভিতরে দুর্বল লাগছে। সাধারণ চেহারার শান্ত মানুষটি, কিন্তু ওঁর পিছনের যে বিশাল জ্যোতির কথা আমি জানি—সেজন্যই দুর্বল হয়ে পড়েছি। ঠাণ্ডা লেগেছে বলে একটু শুকনো মুখ ও ধরা গলা। গম্ভীর মুখ নয়, কথা বলার সময় ঈষৎ হাসি-মাখা থাকে, নম্র কণ্ঠস্বর। এক সময় ব্যাংকের কেরানী ছিলেন, বন্ধু-বান্ধবরা ওঁর কবিতার বই ছাপাবার জন্য চাঁদা তুলেছিল—এই সব মনে করে ওঁকে আমারই মত সাধারণ মানুষ ভাবার চেষ্টা করে নিজের দুর্বলতা কাটাবার চেষ্টা করছিলাম। ওঁকে আমার একটি মাত্র প্রশ্নই করার ছিল, ওঁর নতুনতম কাব্য সংগ্রহে কিছু ফরাসী কবিতা ঢুকিয়েছেন কেন? ফরাসীদের মুখে শুনেছি, ওগুলো তেমন ভালো হয়নি। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারিনি (ভয়েই হয়তো)। উনিই যা-কিছু প্রশ্ন করলেন। প্রথমটায় আমি কবে এসেছি, কবে যাবো ইত্যাদি। তারপর মৃদু হেসে, কলকাতার তরুণরা এখনও আমার লেখা পড়ে, না আমি পুরোনো হয়ে গেছি ?

এ প্রশ্নের ঠিক প্রত্যক্ষ উত্তর আমি খুঁজে পেলুম না। বললুম, এখনও আপনার কবিতার নিয়মিত অনুবাদ হয় বাংলায়। কয়েক বছর আগে একটা পুরো অনুবাদ-বই বেরিয়েছে, আপনি জানেন বোধ হয়।

বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। কি যেন অনুবাদকের নাম? আমি বিষ্ণু দে'র কথা বললুম। উনি বললেন, আচ্ছা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—এদের নামে এখনও কি অনেকের নাম রাখা হয়?

—শিবের নানান্ নাম খুব জনপ্রিয়। আমাদের বাবা-কাকাদের আমল পর্যন্ত শিব-বিষ্ণু'র নামে অনেকের নাম রাখা হত। এখন কমে গেছে। আর ব্রহ্মা ঠিক গৃহদেবতা হিসাবে পূজিত হন না বলেই বোধহয়, তাঁর নামে নাম রাখা হয় না। আমি অন্তত বাংলাদেশে ব্রহ্মা নামের কোনো লোক দেখিনি।

তারপর তিনি অনুবাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলেন। এখনকার বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে দু-একটা কথা জানতে চাইলেন। ঘরে বেশ রোদ এসেছে, মাঝে মাঝে ওঁর চশমায় লেগে ঝলসাচ্ছে সেই রোদ। আমার অস্বস্তিবোধ যায় নি। যদিও কথা বলে যাচ্ছেন— কিন্তু আমার ঠিক কখন উঠে পড়া উচিত বুঝতে পারছি না। হাজার হোক, ইংরেজ—কখনও বুঝতে দেবে না আমার ওঠার সময়। ঐ রকমই হয়তো কথা বলে যাবেন। অথচ, হঠাৎ কথার মাঝখানে উঠে পড়াও যায় না।

জানলার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, পৃথিবীর কত দেশে কত নতুন রকমে হয়তো লেখা হচ্ছে। ইংরেজী-ফরাসীর মধ্য দিয়ে না এলে আমরা জানতে পারি না। ভারতীয় সাহিত্য বলতে আমরা এখনও সংস্কৃত বা রবীন্দ্রনাথের কথাই জানি। কিন্তু আধুনিক বাংলায় হয়তো এমন লেখা হচ্ছে—যা আমাদের সচকিত করে দিতে পারে। কিন্তু, অনুবাদ না হলে—। সুইডেনের সাহিত্য সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান কম, কিন্তু দাগ হ্যামার-সোলডের লেখা পড়ে আমি অভিভূত হয়ে গেছি! অডেনকে বলেছি অনুবাদ করতে—শিগ্‌গিরই বোধহয় ছাপা হবে।

আমি এই সময় দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, আচ্ছা, এবার আমি যাই। —আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলুম, এ কথাও বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু মনে মনেই রয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, আমার গলার আওয়াজ ওঁর সামনে বড় কর্কশ শোনাচ্ছে। উনি আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি, আর মাত্র পাঁচ মাস বাদেই এলিয়টের মৃত্যু হবে।

আট

কান্তিময় ব্যানার্জি আমেরিকায় চার বছর আছেন, এখনও তিনি বুধবার রাত্রে দাড়ি কামান। অর্থাৎ, কাজে যাবার জন্য প্রত্যেকদিন তাকে দাড়ি কামিয়ে যেতে হয়, কিন্তু লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার তো ব্রাহ্মণের ছেলের চুল-দাড়ি-নোখ কিছুই কাটতে নেই, তাই বৃহস্পতিবারের জন্য তিনি বুধবারই বেশি রাত্রে দাড়ি কামিয়ে রাখতেন। অতদিন ধরে বিদেশে আছেন, কিন্তু একদিনও কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খাননি, কারণ, কোথায় কে গরু শুয়োরের মাংস মিশিয়ে দেয়, ঠিক কি? আমি অবশ্য বলেছিলাম, সাহেব-সুবোরা ভারতীয়দের নেমন্তন্ন করলে আগে জিজ্ঞেস করেই নেয়, নিরামিষাশী কিনা! আপনি তো নিরামিষ খান বললেই পারেন!

উহু। ওরা অনেক সময় রান্না করে চর্বির তেল দিয়ে, সেটা কিসের চর্বি তা কে জানে? এসব ম্লেচ্ছদের ব্যাপারে বিশ্বাস আছে?

অনেক সময় অফিসের কাজে ওঁকে নানা জায়গায় যেতে হয়—তখন সেই কটা দিন তিনি শুধু ফল খেয়ে থাকেন। সঙ্গে রাখেন নিজের গ্লাস, অপরের মুখে দেওয়া গ্লাসে খাবার বদলে উনি বরং আত্মহত্যা করবেন। একবার একটি আমেরিকান ছেলে ওর ঘরে আড্ডা দিতে আসে, তখন আমিও ছিলাম। আমেরিকান ছেলে-ছোকরারা খুব বেশী ভদ্রতা মানে না, কথায় কথায় হঠাৎ বলে ফেললো, কুড আই হ্যাভ আ কাপ অব টি? ইওর ইণ্ডিয়ান টি?

কান্তিবাবুর ঘরে রান্নার এলাহি বন্দোবস্ত, কারণ রান্নাই তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান, অবসর সময়ের একমাত্র বিলাসিতা। কোন্ দোকানে টাটকা মাছ পাওয়া যাচ্ছে খুঁজে খুঁজে বেড়ান প্রত্যেক সন্ধেবেলা, এবং দৈবাৎ টাট্‌কা কাতলা মাছ পাওয়া গেলে সে খবর আবার দিয়েও আসতেন অন্য বাঙালী বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে।

কান্তিবাবু তৎক্ষণাৎ তিন কাপ চা বানিয়ে ফেললেন। খুব ভালো

চা। কোনো পুরুষের হাতে তৈরী এত ভালো চা আমি আগে কখনো খাইনি।

আড্ডা শেষে আমেরিকান ছেলেটি উঠে যাবার পর কান্তিবাবু ওর খাওয়া কাপটা অবলীলাক্রমে ময়লা-ফেলা ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। আমি হা হা করে উঠে বললুম, ও কি, ও কি?

কান্তিবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, ছ্যাৎ! ওর এঁটো কাপে আর কে খাবে? আমার খাওয়া কাপটাও পরে উনি ফেলে দিয়েছিলেন কিনা জানি না, কিংবা আমি ওঁর স্বজাত বলে দয়া করেছিলেন কে জানে। আমি আর ভয়ে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। তবে, ওর বাড়িতে গিয়ে চা খাওয়া আমি এড়িয়ে গেছি এরপর।

কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট পাবার পর আমেরিকায় রিসার্চ করতে গেছেন, তাঁর এই অবস্থা। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে গলা থেকে টাইটা খুলতেন এমনভাবে, যেন একটা মরা সাপ ছুঁড়ছেন। সেই সঙ্গে সাহেবদের পোষাক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্য গালাগাল। তারপর বাথরুমে ঢুকে আধঘণ্টা ধরে স্নান করে সাবান দিয়ে পৈতে মেজে, সন্ধ্যা আহ্নিক করতে বসতেন। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এত যখন শুচিবায়ু তখন আপনি এলেন কেন এদেশে?

টাকা! শুধু টাকা! দু'লক্ষ টাকা জমুক আমার এদেশে--সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবো!

আমি কান্তিবাবুর এসব স্বভাব মনেপ্রাণে অপছন্দ করতুম। কিন্তু ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে দেখেছি সুবিধে হয়নি। উনি বলতেন, আপনি যা বলছেন সবই আমি জানি। ঠিক, আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু আমার সংস্কার আমি ছাড়তে পারি না।

তখন আমি ওঁকে সবিস্তারে আমার অখাদ্য কুখাদ্য খাবার গল্প করতুম! এসব সত্ত্বেও যে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল তার কারণ পাশের বাড়িতে একজনের সঙ্গে বাংলায় কথা বলার সুযোগ। ঝগড়া করলেও তা বাংলায় করতুম। এবং কান্তিবাবুর একটি বিশেষ গুণ ছিল। উনি খুব ভালো বাংলা পল্লীগীতি জানতেন। অন্ধকার ঘরে বসে উনি যখন

নীচু গলায় পদ্মাপারের ভাটিয়ালি গাইতেন, তখন আমেরিকার এক ক্ষুদ্র শহরে বসে, বাইরে বরফ পড়ছে, বাংলা দেশের জন্য আমার বুকটা হু-হু করে উঠতো।

শুচিবায়ু ছাড়াও কান্তিবাবুর আর একটি প্রধান দোষ ছিল, প্রতি কথায় আমেরিকানদের নিন্দে করা। আমেরিকানদের চরিত্রে নিন্দে করার অনেক জিনিস আছে, কিন্তু কান্তিবাবু যেগুলি বলতেন, আমি তার একটিও মানতে পারিনি। যেমন আমেরিকানরা ভদ্রতা জানে না। এ রকম অভদ্র জাত, দেখলেন দুম করে কি রকম চা খেতে চাইলো? ছেলেমেয়েগুলো তো অসভ্যের একশেষ। আপনি তো কলেজে যান না, গেলে দেখতেন, ছোঁড়াগুলো ক্লাশের মধ্যে বসেই মাস্টারের সামনে সিগারেট টানছে। বেঞ্চির ওপর পা তুলে দিয়ে বসে আছে! একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই! ভদ্রতা শিখতে হয় ভারতবর্ষের কাছে! এই আমেরিকানদের আমরা কান ধরে ভদ্রতা সহবৎ শেখাতে পারি!

এসব কথা বলছেন যে কান্তিবাবু, তিনি বাড়িতে কোন বিদেশী ডাকতে এলে দরজা খুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলেন, ভেতরে আসতে বলেন না পর্যন্ত। পাছে চা খাওয়াতে হয়।

আমি একদিন ওঁকে আমার দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলছিলাম। বলে, জিজ্ঞেস করেছিলাম, এবার আপনি বলুন, এদের কাছ থেকে আমরা, না আমাদের কাজ থেকে এরা—কে কতখানি ভদ্রতা শিখবে।

প্রথম ঘটনাটি খুব সামান্য। পোস্ট অফিসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম একটা প্যাকেট পাঠাবো বলে। তখন ক্রিসমাসের সময় বিষম ভিড়। নারী-পুরুষ সবাই নিঃশব্দে লাইন দিয়ে আছে। লাইন আস্তে আস্তে এগুচ্ছে, কোথাও কোন গোলমাল নেই।

কান্তিবাবু আমায় বাধা দিয়ে বললেন, এ আর এমন কী! আমাদের দেশের লোকেরাও আজকাল লাইন দিতে শিখেছে। না হয়, লাইনে দাঁড়িয়ে লোকেরা একটু গোলমাল করে। কিন্তু কি আর তফাৎ। আপনার সবতাতেই আদিখ্যেতা।

আমি হেসে বললুম, বাকিটা শুনুন। লাইন আস্তে আস্তে এগুচ্ছে।

তখনও জনাপঞ্চাশ মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা লোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঢুকলো। এবং লাইনে না দাঁড়িয়ে সোজা কাউণ্টারে চলে গেল। দু'মিনিটের মধ্যে একটা প্যাকেট রেজিস্ট্রি করে, তৎক্ষণাৎ আবার চলে গেল। লাইন তখনও নিঃশব্দ। আবার এগুতে লাগলো। এ ঘটনাকে আপনি কি বলবেন। একটা লোকও চেঁচিয়ে উঠলো না ও দাদা, লাইনে দাঁড়ান! আমরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি কি মুখ দেখতে। কে হে তুমি খাঞ্জাখাঁ? ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কিছু বলেনি। সবাই নিঃশব্দ। এমন কি কাউণ্টারে লোকটিও আপত্তি করেনি। কেন? কারণ সবাই ধরে নিয়েছে. লোকটির নিশ্চয়ই বিষম দরকার, লাইনে দাঁড়াবার সময় নেই। অথবা তা যদি নাও হয়, লোকটা যদি সত্যি অভদ্র হয়, তবুও অন্যেরা অভদ্র হয়ে গেল না। তারা চুপ করে রইলো। ভদ্রতা একেই বলে। আর ভদ্রতার পরাকাষ্ঠার দেশ ভারতবর্ষে এ ব্যাপার হলে, লাইনের সববটা লোক হা-রে রে-রে করে চেঁচিয়ে উঠতো না?

আর একটি ঘটনা কলেজের। ঠিকই আমি কলেজে যাই না। কিন্তু এ দেশের কলেজে পড়ানোর পদ্ধতিটা কি রকম তা দেখার জন্য আমি দু'একটা ক্লাশে গিয়েছিলাম। একদিন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

খুব বড় ক্লাশ, ছেলেমেয়েতে ভর্তি। সত্যিই অনেক ছেলেমেয়ে বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছে। অনেকের পা বেঞ্চির ওপর তোলা। কেউ কেউ যখন ইচ্ছে আসছে, যখন ইচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে। জামা-কাপড় অনেকের অদ্ভুত। এ সবই আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে। কারণ আমাদের অন্যরকম দেখা অভ্যেস। কিন্তু এগুলো সবই হল চালচলন। এগুলিকে ভদ্রতা-অভদ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা যায় না। 'ভদ্রতা' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরকম।

অধ্যাপক পড়াচ্ছেন। ক্লাস সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। ছেলে-মেয়েগুলো যতই দুর্দান্ত আর বদমাস হোক, ক্লাশে কিন্তু এরা গণ্ডগোল করে না। মাঝে মাঝে দু'একজন প্রশ্ন করছে, যা শুনলেই বোঝা যায়, মনোযোগ দিয়ে পড়ানো না শুনলে এ রকম প্রশ্ন করা যায় না।

বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে, শূন্য ডিগ্রীর অনেক নীচে শীত। ঝড়ের হাওয়া দিচ্ছে! এমন সময় আরেকজন ছাত্রী ঢুকলো। সঙ্গে একটা কুকুর।

আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি - কুকুর নিয়েও ক্লাশে আসা যায় নাকি ? সত্যি আমেরিকা দেখছি আজব দেশ। অধ্যাপক একবার চোখ তুলে তাকালেন কুকুর সমেত নবাগতা ছাত্রীটির দিকে। তারপর আবার পড়াতে লাগলেন। ছাত্রছাত্রীরা কেউ একটি কথা বললো না।

কিন্তু অমন বন্ধ ঘরে অতগুলো মানুষের মধ্যে এসে কুকুরটা চুপ করে বসে থাকবে কেন ? একটু বাদেই কুঁই কুঁই শব্দ আরম্ভ করে দিল ! তারপর বেশ জোরে ডাক, সেই সঙ্গে শিকলের ঝন্ ঝন্। অধ্যাপক পড়ানো বন্ধ করলেন। ছাত্রছাত্রীরা চুপ। সেই ছাত্রীটি মুখ দিয়ে চুঃ-চুঃ শব্দ করে কুকুরটাকে শান্ত করতে লাগলো। আবার পড়ানো শুরু হল। একটু পরেই আবার ঘেউ ঘেউ কুকুরের ডাক। অধ্যাপক আবার পড়ানো বন্ধ করে হাতের আঙুল দেখতে লাগলেন। কুকুরটা একটু চুপ করতে অধ্যাপক আবার আরম্ভ করলেন। এরপর হঠাৎ কুকুরটা মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো ঘরময়, মেয়েটি উঠে পেছন পেছন ছুটতে লাগলো। তারপর শিকলটা ধরে ফেলে—আবার টেনে এনে বসলো, কুকুরটা অবিশ্রান্তভাবে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগলো।

এই প্রথম অধ্যাপক তাঁর দুরূহ বিনয় ছেড়ে ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে অন্য কথা বললেন। একটু হেসে বললেন, ক্যাথরীন, তোমার কুকুরের বোধ হয় আমার পড়ানো পছন্দ হচ্ছে না। ও বোধ হয় বাইরে যেতে চায় !

—কিন্তু বরফ পড়লে কুকুরটা যে তখন আমাকে ছাড়া একদম থাকতে চায় না !

—কিন্তু, তোমার কুকুরকে চুপ করাতে পারি, এমন বিদ্যে যে আমার নেই, ক্যাথরীন ! তুমি না হয় ক্লাশটা আজ নাই করলে। তুমি যদি কুকুরটাকে সঙ্গ দেবার জন্য—

—বাঃ, এমন দামী ক্লাশটা আমি মিস করবো নাকি ?

—ওঃ, আচ্ছা ! তাহলে, আজ বরফ পড়ার সময়, তোমার কুকুরের মেজাজ খারাপ বলে সেই সম্মানে আমাদের ক্লাশ আজ এখানেই শেষ। ধন্যবাদ ক্যাথরীন।

ক্লাশ শেষ হয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু সারাক্ষণ চুপ করে ছিল—

একটি কথাও বলেনি। অথচ ক্লাশটা ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এ অবস্থায়, কান্তিবাবু আমাদের দেশের যে-কোনো কলেজের কথা ভেবে দেখুন। ক্লাশ শুদ্ধু সবাই কি ঐ সময়টা কুকুর ডাকতো না? ঐ ছাত্রীটি হয় অত্যন্ত অভদ্র অথবা কুকুর-প্রীতিতে পাগল। কিন্তু ওর অভদ্রতা দেখেও আপনার ঐ সিগারেট-খাওয়া, টেবিলে-পা-তোলা ছাত্রের দল একটুও অভদ্রতা করেনি। এমন কি অধ্যাপকও তাঁর ক্ষমতা দেখাবার জন্য চোখ-মুখ লাল করেন নি। শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা করেছেন। একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা, যখন অপরের অভদ্রতা দেখলেও একজন নিজের ভদ্রতা হারায় না। এর তুলনায় আমাদের ভারতীয়, বা প্রাচ্য ভদ্রতা এখন প্রবাদ মাত্র। তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই!

নয়

বাড়িতে চিঠি লিখেছিলাম, 'এই এতবড় একটা চিংড়ি খেলাম সেদিন!' উত্তরে মা লিখলেন, 'এত বড়' মানে বুঝবো কি করে কত বড়? সত্যিই তো। আমি লজ্জায় পড়ে গেলুম। আসলে চিঠিটা লেখার সময় আমি টেবিলের ওপর কলমটা রেখে দুটো হাত ফাঁক করে মনে মনে বলেছিলাম, অ্যা—ত—ব—ড়। আয়তনটা লিখে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখনও লিখতে গিয়ে আমার দু-হাত ফাঁক হয়ে যায়, আমি বলি, হুঁ, অ্যা—ত—ব—ড়-ই হবে! আমি যে টেবিলটায় বসে আছি, তার অর্ধেক হবে। অন্তত ঠ্যাংগুলো ছাড়াই আমার হাতের দেড় হাত লম্বা সেই বিরাট চিংড়ি।

মারশাল টাউন নামের একটা ছোট্ট শহরে নিয়ে গেছে আমার বন্ধু। শহরটা ছবির মতো সাজানো সুন্দর এবং সেই শহরের রাজার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন। না, আমেরিকায় রাজা নেই। কিন্তু সেই লোকটিকে রাজাই বলা যায়, তিনি সেখানকার একটি বিরাট ইস্পাত কারখানার মালিক, তিনটি সিনেমা হল ওঁরই, সবচেয়ে বড় দোকানটাও ওঁর ছেলের নামে,

শহরের কতগুলো বাড়ি যে ওঁর, তার আর সীমা সংখ্যা নেই, শহরের একমাত্র মিউজিয়ামটিও ওঁরই টাকায় তৈরী। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের পক্ষে, ঐ শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেলটিরও তিনিই মালিক। সেখানে আমাদের নেমন্তন্ন, ়ই সন্ধেবেলা।

নিরহঙ্কার, সাধারণ চেহারার মানুষটি। তবে খুব বেশী লম্বা, এবং এমনই ়াগা যে ঐ লিকলিকে চেহারা দেখলে ভয় বা সম্ভ্রম জাগার বদলে হাসি ়ায়। আমেরিকার ধনীদের তুলনায় তিনি যদিও একটি কুচো চিংড়ি, কিন্তু ়দিন সন্ধেবেলা আমাদের এত বিরাট একটা গলদা চিংড়ি খাইয়েছিলেন, ় রকম বড় চিংড়ি মাছ আমি আর কখনো দেখিনি।

স্বয়ং হোটেলের মালিক তাঁর অতিথিদের খাওয়াচ্ছেন—সুতরাং সারা ়াটেলে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। সার বেঁধে ওয়েটার ওয়েট্রেসরা পিছনে ়াড়িয়ে। আমাদের প্রতিটি অনুরোধ বা হুকুমের উত্তরে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে ়লছে, ইয়েস স্যার!

অন্য আর কিছু খাবার পদ নেই। সুপের পরই ঐ বিরাট চিংড়ি। চিংড়িটা রান্না হয়েছে আস্ত অবস্থাতেই। আস্ত চিংড়িটা প্রথমে গরম জলের ভাপে ়নেকক্ষণ সেদ্ধ করা, তারপর বেশ কিছুক্ষণ হাল্কা মদে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। ়্ধু জলে সেদ্ধ করে খেলে নাকি একটা বুনো বা জলো গন্ধ থেকে যায়।

সুপ খাবার পরই আমাদের প্রত্যেককে অ্যাপ্রন পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেবিলে রাখা হয়েছে একগাদা রুপোর ছুরি-কাঁটা, সাঁড়াশী-হাতুড়ি ইত্যাদি একগাদা যন্ত্রপাতি। তারপর আলাদা রুপোর ট্রেতে করে প্রত্যেকের সামনে একটি করে ঐ বিশাল মাছ রেখে গেল, তখন আমি ভয়ংকর চমকে গেছি! লবস্টার! লবস্টার!—বলে টেবিলে একটা কলরব পড়ে গেল। আমার পাশে এক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, এই এতবড় মাছ কেউ একা খেতে পারে নাকি!

—কি বলছো? এ রকম বড় মাছ কদাচিৎ পাওয়া যায়! মারশাল টাউনের জরজ ছাড়া এ রকম মাছ কেউ খাওয়াতে পারবে না।

—কিন্তু কখন হাতুড়ি-সাঁড়াশী ব্যবহার করতে হবে, তার কোন নিয়ম আছে?

ভদ্রমহিলা খিলখিল করে হেসে বললেন, আমাকে দেখে দেখে করে যাও!—একথাতেও আমি খুব নিশ্চিন্ত হলুম না। কারণ কিছুকাল আগের এক ফরমাল পারটিতে আমি এক মহিলাকে দেখে দেখে ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করছিলুম, কিন্তু টেবিলের সব লোক আমাকে দেখে ফিক্-ফিক্ করে হাসছিল। পরে জেনে ছিলুম সেই ভদ্রমহিলা ল্যাটা! মেয়েরাও যে এত ল্যাটা হয়, আমেরিকায় না এলে জানতে পারতুম না!

যাই হোক, কলকাতার বাজারে মাছ নেই, থাকলেও আকাশ ছোঁয়া দাম, ভালো গলদা চিংড়ি তো আর বঙ্গোপসাগরেই আসে না বোধহয়, সুতরাং এত বিরাট একটা সুস্বাদু চিংড়ি মাছ খাওয়ার বেশী বর্ণনা দিলে পাঠকদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে। তাছাড়া, সেই ভোজপর্ব আমার পক্ষেও খুব সুখের হয় নি। দুটি মাত্র হাতে অত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সহজ নয়। সাঁড়াশী চেপে খোলা ভেঙে হয়তো চিমটে দিয়ে ভেতরের মাছ তুলতে গেছি অমনি ধাক্কা লেগে ছুরিটা পড়ে গেল কার্পেটে। আমি ঐ ছুরিটাই তুলে কাজ চালাতে পারি, বড় জোর প্যাণ্টালুনে একবার ঘষে নেবো, কিন্তু সড়াত করে একজন ওয়েটার ছুটে এসে—সেটা তুলে নিয়ে নিয়ে এলো আর একটা। ইতিমধ্যে আমি আবার চামচেটা ফেলে দিয়েছি। সেটা আনতে না আনতে সাঁড়াশীটা। সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

বরং আমি প্রথম দিনের ব্যাঙ খাওয়ার ঘটনাটা বলি। শামুক-ঝিনুক প্রজাপতি হাঙর ইত্যাদিও আমি খেয়েছি, কিন্তু সে গল্প বলার দরকার নেই, কিন্তু ব্যাঙ খাওয়ার ব্যাপারটা না বললে চলে না। সুপার মার্কেটের মাছ-মাংস বিভাগে রোজই দেখি, ব্যাঙের ঠ্যাং বিক্রী হচ্ছে। ব্যাঙের সারা শরীরটা খায় না, শুধু পা-দুটিই খাদ্য। ছাত্রবয়সে বায়োলজি পড়ার সময় অনেক ব্যাঙ কেটেছি, সুতরাং ভেককুলের প্রতি আমার কোন ঘৃণা ছিলো না আর ছাল ছাড়ানো ব্যাঙের পা—অবিকল সুন্দরী রমণীয় পদদ্বয়ের মতোই দেখায়, দেখে দেখে ক্রমশ আমার খাবার ইচ্ছে হল! অথচ রাঁধতে জানি না। একটি ফরাসী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাকে বললুম, মার্গারিট একদিন ব্যাঙ রেঁধে খাওয়াও না।

সে হেসে বললো, আমি তো রাঁধতে জানি না! আমি কি করে াওয়াবো!

—সে কি! তুমি মিথ্যে কথা বলছো! তুমি নিজে কোনোদিন াওনি?

—কোনোদিন না।

—যাঃ! আমরা কতকাল থেকে শুনছি ফরাসীরা ব্যাঙ খেকো! ালাকি!

—আমি তো খাইনি বটেই, আমাদের বাড়ির কেউ কোনোদিন ব্যাঙ খেয়েছে বলেও শুনিনি। প্যারিসেও কয়েকটা বড় বড় হোটেলেই শুধু পাওয়া ায়—খুব দামী, সৌখিন খাবার!

—কিন্তু, এখানে তো খুব বেশী দাম নয়?

—তাহলে এসো একদিন দুজনেই একসঙ্গে খাই।

কিনে আনলুম। কিন্তু কি করে রাঁধবো সে এক সমস্যা। একে তো াদ কি রকম জানি না—তারপরে যদি রান্নার দোষে গা গুলিয়ে ওঠে কিংবা মি আসে তাহলে? হয়তো, ব্যাঙের মাংসে কোন বিটকেল গন্ধ আছে— া কোন বিশেষ মসলা দিয়ে দূর করা যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বের করলুম। ঘরে অনেক মাখন ছিল। আর মাখন দিয়ে ভাজলে দুনিয়ার সব জিনিসই সুখাদ্য হতে বাধ্য—এই ভেবে বেশ কড়া করে ভাজলুম াখনে। তারপর টেবিল সাজিয়ে দুজনে দুদিকে বসেছি। দুজনেরই সামনের প্লেটে ভাজা ব্যাঙের ঠ্যাং, হাতে ছুরি-কাঁটা, কিন্তু চুপ করে বসে আছি। কে আগে শুরু করবে? যে প্রথমে মুখে দেবে—তারই যদি বমি আসে—তবে, অন্য জন ফেলে দিতে পারে। কিন্তু কে আগে?

আমরা দুজনেই দুজনের দিকে চোখাচোখি করে হো-হো করে হেসে উঠলুম।

তখন আমরা ঠিক করলুম, দুজনেই এক-দুই তিন গুনে একসঙ্গে মুখে দেবো। ছুরি দিয়ে এক স্লাইস কেটে কাঁটায় গেঁথে নিলাম। রেডি? এক! দুই! তিন! মুখে!

তারপর? মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, এরকম সুখাদ্য আমি জীবনে খুব কমই

খেয়েছি। ঐটুকু ছুটো ব্যাঙের ঠ্যাঙের বাকিটা খেতে আমাদের আর এক মিনিটও লাগলো না।

তখন, মনে হল, আমাদের দেশ থেকে ব্যাঙগুলোকে কেন যে আমরা শুধু শুধু সাপের মুখে ঠেলে দিচ্ছি! কিংবা না দিয়েই বা উপায় কি? আমাদের দেশের কোটি কোটি সাপই বা তাহলে খাবে কি? আমরা ব্যাঙ খাবো, আর সাপেরা আমাদের খাবে, তা তো আর হতে পারে না!

দশ

—কি করছো এখন?

—কিছু না।

—যে অবস্থায় আছো, সোজা আমার ঘরে চলে এসো।

—কেন, কেন?

—এসোই না। মজা দেখতে পাবে, এসো—

রজার আমারই বাড়ির তিনতলায় থাকে। হঠাৎ টেলিফোন। কৌতুহলী হয়ে ছুটে গেলাম। বাইরে থেকেই শুনতে পেলাম, ঘর গমগম করছে। বহু লোক। দরজা ঠুকঠুক করেছি. রজার হাস্যমুখে উঁকি দিয়ে বললো, এসো. পারটি হচ্ছে। টেড আর জুলির জন্য পারটি।

টেড আর জুলি? শুনে আমার মূর্তি হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। অতি কষ্টে ঘরে ঢুকে দেখি সারা ঘর জুড়ে নাচ চলছে, টেড আর জুলিও উপস্থিত। টেড আর জুলি ছিল সমস্ত অলস মুহূর্তের মুখরোচক উপাদান। কোথাও টেড বসে থাকলে, জুলি দূর থেকে আসতে আসতে ওকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। আর কোথাও জুলিকে দেখলেই টেড চলে যাবার আগে যা বিড়বিড় করবে, সেটা নিশ্চিত কোন গালাগালি। কোন বন্ধুর বাড়িতে টেড আসবার আগে টেলিফোন করে জেনে নেবে, সেখানে জুলি আছে কিনা। আর একবার সিনেমা হলের মধ্যে কোণে টেডকে দেখে জুলি পুরো বই না দেখেই উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল দুজনের মুখ দুজনের

কাছে আগুন লাগা, ওদের নাম পরস্পরের কানের বিষ। টেড আর জুলি স্বামী-স্ত্রী।

ওরকম স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া তো কতই দেখেছি। কিন্তু বাইরে বাইরে সুখ দেখানোই তো পশ্চিমী সভ্যতা। পরস্পর বাহুবন্ধনে প্রকাশ্যে হাঁটা, মোটর গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে 'এসো ডার্লিং' বলা, এবং লোক দেখিয়ে অকারণে টেলিফোন করে স্বামী বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য বা মুড সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা দেখানো—এই সব তো স্বামী-স্ত্রীর সাজানো ধরন, কেউ জানবে না ওদের মনের মধ্যে আছে সুধা না গরল। কিন্তু টেড আর জুলি নিয়ম-না-মানা প্রকাশ্যে সাপ আর নেউল। ওরা বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছে—তার আগে দুজন আলাদা থাকবে চুপচাপ, পরস্পর দেখা হলে ভদ্রতার হাসি হাসবে—এই তো নিয়ম। কিন্তু ওদের দুজনের কি কি দোষ—আমরা ওদের মুখ থেকেই জেনে গেছি। টেডের বিষম নাক ডাকে ঘুমের মধ্যে, জুলির হাতে নাকি রোজ আট-দশটা গেলাস-কাপ ভাঙে, টেড রাত দুপুরে উঠে কফি খেতে চায় এমন পাজি, আর জুলি তার পোষা বেড়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে শোবেই, টেড একবেলাও রান্না করতে চায় না আর জুলিটা এমন বিশ্রী যে, উদয়াস্ত টেলিভিসনের সামনে না বসলে চলবে না! এই সমস্ত মহৎ দোষ যখন ওদের আছে, তখন দীর্ঘকাল স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকা নিশ্চয়ই অসম্ভব।

আড়াই বছর আগে টেড আর জুলি কেউ কারুকে চিনতো না। দুজনে দুদিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছিল ৭৮নং হাইওয়ে দিয়ে। মুখোমুখি ধাক্কা। পুলিশ ইনসিওরেনসের লোক, মোটর সারাবার কোমপানি ইত্যাদি ঝামেলা চুকলে দেখা গেল, টেড্-এর গাড়িটার কিছুই হয়নি, কিন্তু ওর ডান কব্জিটা মচকে গেছে, আর জুলির গাড়িটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে, কিন্তু শরীরে আচড়টি পড়েনি। তখন টেড জুলিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইলো নিজের গাড়িতে—ওর হাত ভাঙা বলে গাড়িটা অবশ্য জুলিই চালালো। সেই প্রথম দেখা। আড়াই দিনের মধ্যে গভীর প্রেম। এক মাসের মধ্যে বিয়ে। শুনেছিলুম, টেড আর জুলির মতো দুরন্ত, উচ্ছল, খুশী দম্পতি বহুদিন কেউ এ শহরে দেখেনি। এক বছর পরেই ঝগড়া, এমন প্রকাশ্যে ঝগড়াও বহুদিন দেখা যায়নি এখানে। আমি আসার পর ঝগড়ার পালাই

দেখছি। শুনেছি, ওদের বিবাহ-বিচ্ছিদের মামলা উঠেছে। কেন এই খামখেয়ালী মিলন, যার ফলে এমন কটু বিচ্ছেদ ?

সপ্তাহ খানেকের জন্য শিকাগো গিয়েছিলাম, মাত্র সেদিনই ফিরেছি, তারপরেই রজারের ডাক। সেদিনের পারটি রজারই ডেকেছে, উপলক্ষ টেড আর জুলির সেদিনই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। দুজনেরই সমান বন্ধু হিসেবে রজার আজ উৎসব করতে চায়।

এই প্রথম আমি এক আসরে টেড আর জুলি দুজনকেই দেখতে পেলাম। কিন্তু এ কোন টেড আর জুলি ? দুজনের মুখে সামান্য গ্লানির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হো-হো করে হাসছে, হাত ধরাধরি করে। টেডের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেট কেড়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করেছে জুলি। নাচের বাজনা থেমে যেতেই টেড চেঁচিয়ে বললো, এই জুলি, রেকরডটা বদলে এবার একটা রে চারলসের দাও। রে চারলসের কোন্‌টা বলো তো ? যেটা আমার সবচেয়ে প্রিয়— বাধা দিয়ে হাসতে জুলি বললো, জানি, জানি।

—না, দেখি মনে আছে কিনা। বলতো কোনটা ?

—বলবো না।

হাসতে হাসতে জুলি রেডিওগ্রামের কাছে গিয়ে রে চারলসের একটা রেকরড দিতেই টেডের মুখে ঈপ্সিত হাসি আর ঘরময় অট্টহাস্য। টেউ বললো, জুলি, এটাও আমি তোমার সঙ্গে নাচবো ! জুলি ঘাড় বেঁকিয়ে সহাস্য মুখে বললো, ইস, মোটেই না। লজ্জা করে না—। টেড ছুটে এসে জুলির হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগলো, আর কৃত্রিম বাধা দেবার চেষ্টায় জুলির মুখে হাসি মেশানো রাগ।

আমি ঘরের এক কোণে চেয়ার নিয়ে বসেছিলুম। নাচতে জানি না কিন্তু দেখতে ভালো লাগে। কি সরব উল্লাসময় আজ এই ঘরের হাওয়া। বর্তমান আইন অনুযায়ী টেড আর জুলি স্বামী-স্ত্রী ছিল, একটি দিনের জন্যও এক সঙ্গে হলে ওদের দুজনের হাসি দেখিনি। আজ ওরা আর স্বামী-স্ত্রী নয় বলেই ওদের ব্যবহার সত্যিকারের সুখী দম্পতির মতো। কোথাও কোনো গ্লানি নেই। টেড কি রকম অম্লান বদনে জুলির হাত ব্যাগ খুলে সিগারেট প্যাকেট বার করে নিচ্ছে ! নিজের বউয়ের হাত-ব্যাগ খুলতেও

গ্রামীদের এদেশে অনুমতি নিতে হয়, আর আজ ওদের এতই ঘনিষ্ঠতা সে এসব নিয়মও গ্রাহ্য করছে না।

অনেকক্ষণ লক্ষ্য করার পর বুঝতে পারলুম, টেডের পাশে আর একট মেয়ে সব সময় ঘনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করছে, তার নাম সেরা। জুলির মতো এক রকমই সুন্দরী। আর জুলির পাশেও আর একটা ছেলে বেশী ঘনিষ্ঠ, ও নাম পীটার। পীটারকে আমি চিনি, বেশ সরল বেপরোয়া ধরনের ছেলে, গ্রীকদের মতো মুখ। টেড আর জুলির মধ্যে যে ঝগড়া—তার জন্য কোনো তৃতীয় নারী বা পুরুষ দায়ী ছিল না—আমরা বেশ ভালোভাবেই জানতুম। বিচ্ছেদ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দুজনের আলাদা বন্ধু জুটে গেছে। টেড একবার পীটাবের কাঁধ চাপড়ে বললো ব্রেভ বয়! গো আহেড! মাইরি বলছি, জুলির মতো এরকম ভালো মেয়ে আর নেই। জুলিও এক ফাঁকে সেরাকে বললো, এই মুখপুড়ি, তুই টেডকে বিয়ে করবি নাকি?

সেরা বললো, ধ্যেৎ!

আহা লজ্জা কিসের। শোন তোকে কয়েকটা ব্যাপার শিখিয়ে দি ওর সম্বন্ধে!—জুলি সেরার কানে কানে কি যেন বলতে লাগলো।

আমি ভাবতে লাগলুম, টেডের সঙ্গে সেরার কিংবা জুলির সঙ্গে পীটারের আলাপ কতদিনের? আবার আড়াই দিন নাকি? আমি সেরাকে ডেকে একবার বললুম, জুলি, তোমার দেশলাইটা একটু দাও তো! সে হি-হি করে হেসে বললো, কী ভুল তোমার! এখনও নাম মনে রাখতে পারো না? আমি জুলি নই, আমি সেরা।

আমি বললুম. ও হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো!

খানিকটা বাদে একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবায় সময় পীটারকে বললুম, চলি টেড। আবার দেখা হবে!

পীটার বললো, এই, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো? আমার নাম টেড নয়, তুমি ভালো করেই জানো আমি পীটার।

আমি হেসে বললুম, ঐ একই হলো। নামে কি এসে যায়?

এগার

আমেরিকায় এসে একজন ভারতীয় প্রথমেই কী দেখে অবাক হবে? একশ' তলা বাড়ি নয়, মাটির নীচ দিয়ে বা মাথার উপর দিয়ে ট্রেন নয়, ম্যাজিক দরজা—যার সামনে দাঁড়ালে আপনিই দরজা খুলে যায়, তা দেখেও নয়। ওসব তো সে আগেই শুনে গিয়েছিল, বরং যতখানি দেখবে বলে কল্পনা করেছিল, তার চেয়ে অনেক কম দেখবে—বাড়িকে মনে হবে না আকাশ ছোঁয়া, বিদ্যুতের ভৃত্যপনাকে মনে হবে না অস্বাভাবিক। কিছুতেই তার চমক লাগবে না, জাগবে না সত্যিকারের বিস্ময়। অত কথা শুনে এসেছে আমেরিকা সম্পর্কে, ভেবেছিল স্বর্গের সমান কোনো একটা দেশ দেখবে, কিন্তু প্রথম দিন, প্রথম দৃষ্টিপাতে সে হয়তো একটু নিরাশই হবে। নিউ ইয়র্ক শহরের হাডসন নদীর পারে দাঁড়িয়ে সে হয়তো মনে মনে গুনগুন করে বলবেঃ ইজ দিস ইয়ারো? দিস দা ষ্ট্রীম অব হুইচ মাই ফ্যানসি চেরিস্‌ড' প্রতিমুহূর্তে সে হয়তো অভাবনীয় কিছু দেখার প্রত্যাশা করবে।

প্রথম যেখানে গিয়ে তার ভারতীয় রক্ত ছলকে উঠবে—সে জায়গাটি যে-কোনো ব্যাঙ্ক। যে-কোন মার্কিন বন্ধুকে না নিয়ে একাই এসেছে তার প্রথম চেক্‌টি ভাঙাতে। বিশাল ভবনের মধ্যে ঝলমল করছে আলো, গোল করে ঘেরা কাউন্টারের অধিকাংশ জানালায় বসে আছে সুন্দরী মেয়েরা কোনো জানালাতেই ভিড় নেই। খানিকটা অস্বস্তিতে ভারতীয়টির বুকের ভিতরে একটু একটু ঘর্মক্ষরণ হবে। তার আইডেনটিটি চাওয়া হলে—অর্থাৎ চেকের ওপর লেখা নামটি যে তারই পিতামাতা-প্রদত্ত, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার স্বীকৃত—এ কথা সে ঠিক কিভাবে প্রমাণ করবে—মনে মনে তারই একটু মহড়া দিয়ে নেবে। পকেটে হাত বুলিয়ে একবার দেখে নেবে পাসপোর্টটি ঠিক মনে করে এনেছে কিনা। তারপর ভরসা করে সে হয়তো সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির জানালায় গিয়ে দাঁড়াবে চেকটি হাতে নিয়ে।

তারপরই সে পাবে প্রথম বিস্ময়। মেয়েটি চোখ নাচিয়ে এক ঝলক হেসে

শুধু দেখে নেবে টাকার অঙ্ক, তারপরই ফর্‌ফর্‌ করে গুনে ছেলেটার হাতে তুলে দেবে এক গোছা নীল রঙের নোট। যন্ত্রের মতো ছেলেটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা 'ধন্যবাদে'র উত্তরে মেয়েটি আবার হেসে বলবে, 'তুমি স্বাগতম!' কোনো প্রশ্ন নেই, সন্দেহ নেই, সই মেলানো নেই, অ্যাকেউন্টে টাকা আছে কিনা দেখার নেই, চেকটা হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা। যেন ছেলেটি ব্যাঙ্কের খাস বড়বাবুর বড় ছেলে, তাকে কোনো প্রশ্ন করবে, এমন সাহস কার—চেক দিতেই মিষ্টি হাসি ও টাকার গোছার বিনিময় হল। আমাদের ভারতীয়টি হয়তো প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠে গোপন আত্মশ্লাঘায় জামার কলার ও টাইয়ের গিঁট নেড়েচেড়ে ঠিক করবে। ভাববে, তার নিজের মুখে সততা ও মহত্ত্ব মাখানো, তা দেখেই অমন বিনা দ্বিধায় তাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হল।

পরে ক্রমশ তার ভুল ভাঙবে। সুন্দর বা কুৎসিৎ মুখ যাই হোক—সকলেই বিনা সন্দেহে টাকা তুলতে পারবে ব্যাঙ্ক থেকে—একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত। আমেরিকাতে ঐ রকমই রীতি। চেক কেটে টাকা তোলা অত সহজ বলে আমেরিকাতে চেক-জালিয়াতির সংখ্যা অত্যন্ত কম। নরহত্যা, গুণ্ডামি এবং ডাকাতি ওদেশে লেগেই আছে। কিন্তু ছিচকে চুরি নেই! দু'পাঁচ হাজার টাকার চেক জাল করার মতো নোংরা কাজও ওরা করে না। যদি এমন দুর্মতি দৈবাৎ কারুর হয়ও, এক লক্ষে একজন, তার জন্য বাকি নিরানব্বই হাজার ন শ' নিরাব্বইজন সৎমানুষকে বিব্রত করা, সন্দেহ করা, দেরী করিয়ে দেওয়া ওরা অন্যায় মনে করে। একমাত্র কিছুটা সন্দেহ করে তের-চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের, নির্বোধের মতো জাল-জোচ্চুরি করার ইচ্ছে ওদেরই হতে পারে, তা ছাড়া আমেরিকার টীন-এজার'রা এমনিতেই কিছুটা ভয়ের বস্তু। জালিয়াতি নিরাপত্তার জন্য অনেক ব্যাঙ্ক ইনসিওর করা থাকে কোনো কোনো গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে। জাল চেক ধরা পড়লে সেই গোয়েন্দাদের দায়িত্ব অপরাধীকে খুঁজে বার করা, এবং খুব কম ক্ষেত্রেই জালিয়াত জেলের বাইরে থাকে।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর পরিসীমা দেখে ভারতীয়টির বিস্ময় ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে যে-দিন সে নিজের নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেল সেদিনও আর এক

অভিজ্ঞতা। ফর্মে নাম-ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার লিখে টাকাগুলো দিল কাউন্টারের জানালার যে-কোনো একটি মেয়ের হাতে। এখানেও আধ-মিনিটে কাজ শেষ। পাশেরই একটা মেশিনে ঝকাং ঝক শব্দ করে রসিদ ছাপিয়ে ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো, পরশু এসে তোমার চেকবই নিয়ে যেও, কেমন ?

পরশুদিন আবার যেতেই দেখলো, কোনো গণ্ডগোল নেই, ওকে দেওয়া হল একটি লাল রঙের (যে-কেউ যে কোনো রং বেছে নিতে পারে) রেক্সিনে বাঁধানো অতি সুদৃশ্য মানিব্যাগের মতো, তারমধ্যে কয়েকখানা চেক বই প্রত্যেকটি চেকের পাতায় ওর নাম ঠিকানা ছাপানো। হ্যাঁ, ছাপানো দুশো ডলারের বেশী টাকার অ্যাকাউন্ট খুললে প্রত্যেকের চেকে আলাদা করে নাম ঠিকানা ছাপিয়ে দেবে ব্যাঙ্ক। আর কোনো পাশ বই, অ্যাকাউন্ট নাম্বার কিচ্ছুর দরকার নেই। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে গেল ছেলেটি—চুল এলো করা, মুখে সব সময় মিচকি হাসি, চুইংগাম চিবুচ্ছে সব সময়, মনে হয় যেন কাজে মন নেই—ফাঁকি দিয়ে কখন বাড়ি পালাবে—সেইজন্য ব্যস্ত। অথচ প্রতিটি কাজ নির্ভুল এবং ঠিক।

ক্রমশ ছেলেটি আমেরিকার ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরনধারণ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। চেক বই পকেটে নিয়ে ঘোরার দরকার নেই, ব্যাঙ্কের কাউন্টারে রাখা আছে চেক বই—তাতে সই করেও টাকা তোলা যায়। এছাড়া প্রত্যেক বড় দোকানে রাখা আছে যে-কোন বাঙ্কের চেক বই। দোকানে কোন জিনিস পছন্দ হল, অথচ পকেটে টাকা বা চেক বই নেই, কিন্তু তা বলে জিনিস কেনা আটকায় না। দোকানের চেক বইতে সই করে দিলেই হল, শুধু সইটা যদি হিজি বিজি হয়—তবে পুরো নামটা একটু গোটা অক্ষরে ওপরে লিখে দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে চেকবই একেবারে না হলেও চলে—সাদা কাগজে ব্যাঙ্কের নাম লিখে সই করে দিলেও চেক হিসাবে চলে যাবে, শুধু সঙ্গে একটা দু সেন্টের স্ট্যাম্প লাগাতে হবে। এক ব্যাঙ্কের টেবিলে একটা ভাঙা মদের খালি বোতল রোজ রাখা থাকে—লোককে দেখাবার জন্য, একজন লোক --চেক বই পায়নি, সাদা কাগজও পায়নি, ঐ বোতলটার গায় নাম সই করে স্ট্যাম্প আটকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিল সেও টাকা পেয়েছে।

ধরা যাক, আমাদের ভারতীয় ছেলেটি এক শনিবার বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমায় দেখতে যাবে। এদিকে পকেটে পয়সা নেই। কাছে খুচরো টাকাও নেই। আর সিনেমার টিকিটের দাম এত কম যে, ওখানে কেউ চেক কাটে না, কেমন যেন দেখায়। মহামুস্কিল, তখন ড্রাইভ-ইন-ব্যাঙ্কও বন্ধ। (ড্রাইভ-ইন-ব্যাঙ্ক অতিব্যস্ত লোকদের জন্য। সরু সরু গলির মাথায় একটা করে ঘর। লোকেরা মোটর গাড়ি চেপে এসেই সেই ঘরের সামনে দাঁড়ায়, গাড়ি থেকে নামতেও হয় না, জানলা দিয়ে চেক নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেই একজন সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয়)! তখন ছেলেটির মাথায় এক বুদ্ধি এলো। বান্ধবীকে বললো, তুমি একটু অপেক্ষা করবে? আমি চট করে সংসারের বাজারটা করে আনি। গেল বাজার-দোকান অর্থাৎ সুপার মার্কেটে। বারো ডলারের জিনিষ কিনলো, আর লিখে দিল একটা কুড়ি ডলারের চেক। বিনা প্রশ্নে ফিরে পেয়ে গেল আট ডলার।

সহজে কাগজে সই করে টাকা লেনদেন হয় বলেই বোধহয় অধিকাংশ আমেরিকানদের কাছে টাকা পয়সা এমন খোলামকুচি।

ভারতীয় ছেলেটি আমেরিকার ব্যাঙ্কের প্রশংসা করছিল একজন আমেরিকান বন্ধুর কাছে।

—কেন, তোমাদের দেশে কি নিয়ম? তোমার নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা তুলতে অসুবিধা হয়?

—আমার দেশে আমার কোন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট নেই।

—কেন?

—প্রথমত আমার টাকা নেই। দ্বিতীয়ত, আমি ব্যাঙ্ক পছন্দ করি না।

—কেন, অসুবিধে কি?

—আমাদের ব্যাঙ্কে ঢুকলেই নিজেকে আসামী মনে হয়। যেন প্রতিটি লোক আমাকে সন্দেহ করছে। তারপর এক জায়গায় টাকা জমা দিয়ে একটা গোল চাক্তি হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয়। সেটাও এক পরম অস্বস্তি। সব সময় মনে হয় চাক্তিটা বুঝি হারিয়ে গেল। এদিকে বসে থাকতে থাকতে তোমার সবকটা কড়িকাঠ মুখস্থ হয়ে যাবে, কোন্ পাখাটা মিনিটে ক'বার ক্রিক ক্রিক শব্দ করছে জানা হয়ে যাবে, ব্যাঙ্কের দেয়ালে ঝোলানো যাবতীয়

নিয়ম-কানুন, ক্যালেণ্ডারের ছবি মনে গেঁথে যাবে—তখন হয়তো আদালতের পেয়াদার মতো তোমার নামে ডাক পড়তেও পারে। তারপর—

—তারপর ?

—তারপর হয়তো শুনবে, সই মেলেনি। কিংবা অ্যাকাউন্ট নাম্বার ভুল তখন দুটো বেজে গেছে, সেদিন আর হবে না। আমি এক ভদ্রলোককে জানি যিনি নিজের অ্যাকাউন্টের টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। সই মেলেনি, বার বার সই করেছেন—তবু মেলেনি। তবুও তিনি টাকা তোলার জন্য জোর করায় তাকে পুলিসে দেওয়া হয়!

—তোমাদের দেশে এত লোক, সেই তুলনায় ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই অনেক কম সুতরাং অনেক সাবধান হতেই হয়!

—তা ঠিক। সেইজন্যই হয়তো, আমাদের ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা লোকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন নিজের সিন্দুক থেকে টাকা ওদের দান করে ধন্য করছেন। লোকে ধন্যও হয়।

—তোমাদের সব লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখে ?

—না! অনেকে রাখে মাটিতে পুঁতে। অনেক সোনার বাট করে বিছানার নীচে রেখে শোয়।

—চোর ডাকাতের ভয় নেই ?

—প্রচুর। সেই সঙ্গে অনিদ্রারোগ। টাকা থাকলেই আমাদের দেশে লোকের থাকবে অনিদ্রার অসুখ!—

বারো

'হ্যাঁরে, বিদেশে ভিখিরি ছিল ?' মা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'—কেন, আমিই তো ছিলাম! তবে আমি একা নয়। আরও ছিল শিকাগোর রাস্তায় যে লম্বা মতন লোকটা কানের কাছে ফিসফিস করতো ও কে ?

যে-কোন নতুন লোকেরই শিকাগো শহরে প্রথমে কয়েকটা দিন ভয় ভ

করবে। এমন সব রোমাঞ্চকর গল্প শিকাগো শহরের সম্পর্কে আগে শুনেছি. বিখ্যাত গুণ্ডা আল-কাপনের জায়গা, যেখানে দিনে-দুপুরে ডাকাতি হতো। এখন অতটা হয় না ঠিকই, কিন্তু একেবারেই নিরুপদ্রব পৃথিবীর কোন বড় শহরই নয়, প্রায়ই মারাত্মক দুঃসাহসী হত্যাকাণ্ডের খবর শিকাগো থেকে আসে। সুতরাং বাক্‌সর্বস্ব এই বঙ্গ-সন্তান প্রথম কয়েকদিন ভয়ে সরু হয়ে পথ হাঁটতুম।

প্রায়ই একটা দশাসই নিগ্রো বিনয়ে নিচু হয়ে কানের কাছে গুনগুন করে কি বলতো। সে পাশে পাশে আসতো সাউথ ওয়াবাস্ এভিনিউর মোড় পর্যন্ত, তারপর আর দু'জন তার জায়গা নিতো। সেই একই রকম পাশে পাশে গুনগুন। একটি অক্ষরও বুঝতে পারতুম না, নমস্কারের ভঙ্গিতে বার বার 'থ্যাঙ্ক য়ু', 'থ্যাঙ্ক য়ু', বলে সুট্ করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তুম।

কি চায় ওরা বুঝতে না পেরেই অমন অস্বস্তিতে ছিলুম। বিলেত দেশটা মাটির হলেও আমেরিকা-দেশটা তো সোনার। তবে, আমার মতো কাদা-মাটির দেশের মানুষের কাছে কি গূঢ় দাবি থাকতে পারে ওদের। গলির মোড়ে মোড়ে বা কফিখানায় একদল সুসজ্জিত ছোকরাকে দুপুরে জটল্লা করতে দেখতুম, দেখে মনে হয় বেকার। একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে আমার পঞ্চাশ গজের মধ্যে মাত্র পাঁচ মিনিটে বিয়রের বোতল ছোঁড়াছুড়ি করে দুই দলে রোমহর্ষক মারামারি হয়ে গেল।

একা রাস্তায় ঘুরলেই সেই ফিস্‌ফিসানিদের পাল্লায় পড়তাম। ক্ষীণ সন্দেহ হতো, পৃথিবীর সব শহরেই বিদেশীদের নিষিদ্ধ প্রমোদ ভবনে নিয়ে যাবার জন্য এক ধরনের লোক থাকে, ওরাও কি তাই? কিন্তু. বলা বাহুল্য, ওসব জায়গায় যাবার ঝুঁকি নিতে আমার মোটেই শখ্ ছিল না। যাই হোক ক্রমে সব বকম উচ্চারণ যখন কানে সড়গড় হয়ে গেল, তখন আমি একটু ভরসা করে দাঁড়িয়ে সেই লম্বা লোকটার কথা শুনলুম. অত্যন্ত বিনীত স্বরে সে বলছেঃ আ ডাইম প্লিজ!

ওঃ, মোটে একটা ডাইম! (অর্থাৎ ওখানকার দশ নয়া পয়সা, আমাদের বারো আনা) ভিক্ষে চাই! তা হলে তো তুমি আমার চেনা লোক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। পকেট থেকে একটা ডাইম খসিয়ে ওরকম আনন্দ কখনও পাই নি।

সানফ্রান্সিস্কোর মতন অমন রূপসী নগরী দুনিয়ায় ক'টা আছে জানি না। অল্প শীতের দুপুরবেলা উপসাগরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলুম। পথে একটি দর্শনীয় চেহারার মানুষ চোখে পড়ল। অতিশয় লম্বা, বৃষস্কন্ধ শালভুজ। বয়েস সত্তরের কম না, কিন্তু কি সবল শরীর। আর প্রায়-সব সাদা ঝোপ দাড়ি, লম্বা চুল, পোশাক দেখলে মনে হয় সে পোশাক পরেই লোকটা রাত্তিরে ঘুমোয়। অনেকটা মবি ডিক উপন্যাসের ক্যাপটেন এহাবের মতন চেহারা। কিন্তু এহাবের মতো অহঙ্কারী সে মোটেই নয়, বরং কোল্‌রিজের সেই বুড়ো নাবিকের মতোই সে হঠাৎ আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ভারতীয়?

ততদিনে আমি আমেরিকার কথাবার্তার ধরন ঢের জেনে গেছি।

বললুম, হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের 'ভারতীয়' নয়, খাঁটি ভারতবর্ষের ভারতীয়।

লোকটি বললো, আমি ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম। চমৎকার দেশ। গান্ধী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তুমি কোথায় যাবে, চলো, আমিও একটু তোমার সঙ্গে হাঁটি।

হাঁটতে হাঁটতে লোকটা বললো, গান্ধীর মতন লোক হয় না, সত্যি। আমি ওর অনেক লেখা পড়েছি। গ্রেট ম্যান—তারপরই লোকটি আমার কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বললো, তোমার কাছে একটা সিকি (কোয়ার্টার) হবে?

আমি স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো লোকটির হাতে একটা সিকি তুলে দিলুম। লোকটি দরাজ গলায় আমাকে বললো, গড্ ব্লেস ইউ, মাই সান্ তার পরই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো, লণ্ডনে ভারতীয়দের মধ্যে একটা রসিকতা চালু আছে যে, রাস্তায় কোনো অপরিচিত লোক যদি হঠাৎ এসে বলে যে, নেহরু খুব ভালো লোক বা 'গান্ধী একজন সত্যিকারের মহাত্মা', তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে এড়িয়ে চলা উচিত। লোকটা নিশ্চিত কোনো মতলববাজ, ভিখিরি।

ঐ সানফ্রান্সিস্কোতেই আর একজন মজার ভিখারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। কলম্বাস এভিনিউতে লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে এক দোকানে বসে এসপ্রেসো

কফি খাচ্ছিলুম, পাশে আর একটি খোঁচা দাড়ি বুড়ো বসে খুব বক্‌বক্‌ করছিল, সাহিত্য, জীবন, ভগবান ইত্যাদি সম্বন্ধে ; হঠাৎ এক সময় লোকটা হাই তুলে বললো, চারটে বাজলো ! বাবা '—তার পরই আমার দিকে ফিরে ঃ তোমার কাছে খুচরো আছে ?

ভাবলুম লোকটা টাকা ভাঙাতে চায়। কোটের পকেটে হাত দিয়ে বললুম, না পুরো হবে না, আমার কাছেও ডলারের নোট।

লোকটা উদার হেসে বললো, না, না, আমি আস্ত এক ডলার কারুর কাছ থেকে নিই না। ও খুচরো যা আছে, তাই দাও।

ফেলিংগেটি বললো, ও কি হচ্ছে ডন্‌, ছি ছি, ও এসেছে গরীব ভারতীয়, তাও কবি, ওর কাছ থেকে তোমার নেশার পয়সা না নিলে চলে না।

লোকটা বললো, তুমি ভারতীয় ? আচ্ছা, তোমার পয়সা আমি শোধ দিয়ে দেবো। ঠিক দেবো, কোনো না কোনো দিন। আমি কথা দিয়ে কথা রাখি।

ওকে বলা হয়নি, আমি সেদিনই ওখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মেয়ে ভিখারীর দেখা পেলাম নিউ ইয়র্কে। গ্রীনিচ ভিলেজ থেকে ইস্ট সাইডে যেতে প্রায়ই একটি মাঝ বয়েসী মেয়ে নিঃশব্দে হাত পেতে থাকতো। পর পর তিন দিন তাকে আমি একটি করে নিকেল (পাঁচ পয়সা) দিলাম। তাই দেখে অ্যালেন গীনস্‌বার্গ হেসে বললো, কি, খুব মজা লাগছে বুঝি ভিক্ষে দিতে ! একটা প্রতিশোধ। এত বড় লোকের দেশেও ভিখিরি

আমি বললুম, না, এরা তো আমার চেনা লোক। একেবারে ভিখিরি না থাকলেই বরং দেশটা একেবারে কাঠকাঠ লাগতো।

—এরা কিন্তু বেশির ভাগই নেশাখোর। না খেতে পাওয়া ভিখিরি প্র্যাকটিক্যালি এ দেশে নেই।

—সে যাই হোক, ভিক্ষে কেন করছে এটা বড় কথা নয়। ভিক্ষে চাইছে এইটাই আনন্দের খবর। সবাই পরিশ্রম করবে, তার কি মানে আছে। যে হিসেবে সাধু-সন্ন্যাসীরা ভিখিরি, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। অবশ্য, আমাদের দেশে বেশির ভাগই বাধ্য হওয়া, খেতে না পাওয়া ভিখিরি।

—ঠিকই এদেশে আরও বেশি ভিখিরি থাকা উচিত ছিল। বেঁচে থাকা এখানে এত সহজ

লণ্ডনের হাইড পার্ক কর্ণারে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা বক্তৃতা হয়। নানান জটলায় যে-ইচ্ছে বক্তৃতা দেয়. পৃথিবীর হেন বিষয় নেই যা নিয়ে ফাটাফাটি হয় না রোজ। একজন লোক ছিল ভারী মজার, সারা হাতে মুখে উল্কি, ফ্যাস-ফেসে গলা—চুরি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এই বিষয়ের ভিত্তিতে সে তার জীবনের নানান চৌর্যকর্মের বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা দেয়। একদিন মাঝপথে বক্তৃতা থামিয়ে হঠাৎ দুঃখিত গলায় বললো, আজকাল চুরির বাজার বড় মন্দা, যাই হোক আশেপাশে পুলিশ নেই—আপনারা ঝটপট দু'চার পেনি করে ভিক্ষে দিন তো!

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, আমাদের দেশে খুব দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি পেলেও ভিক্ষের রেট খুব বাড়েনি। এখনও বুলি সেই পুরোনো, মা, দুটো পয়সা ভিক্ষে দিন।' বড়জোর আধুনিক ছেলে-ছোকরা ভিখিরিরা পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা চায়। বিদেশের ভিখিরিরা কিন্তু চার-আনা আট-আনার কম কথাই বলে না। এক সময় শ্যামবাজারে একটি সত্যিকারের স্টাইলিস্ট ভিখারী দেখতাম। একটি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ছোকরা, প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা, বোধহয় আধপাগলা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে লোক নির্বাচন করে নিয়ে—সেই লোকের কাঁধে টোকা দিয়ে বলতো, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে। হতচকিত কোন লোক যদি থেমে যেতো তাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে বলতো, আপনার কাছে একটা স্পেয়ারেবল্ সিকি হবে? আমার শর্ট পড়ে গেছে।

কি জানি ছোকরাটা বিলেত ফেরত কিনা! কারণ, বিলেতে অনেক ভিক্ষার্থীর মুখে 'স্পেয়ারেবল্' শব্দটা শুনেছি।

প্যারিসেও দেখেছি মাটির তলায় ট্রেনের রাস্তায় হাত পেতে নিঃশব্দে বসে আছে। কেউ অথর্ব, কেউ হাত-পা কাটা। কেউ ব্যাঞ্জো বাজায়, কেউ চোখে-চোখ ফেলে করুণ মিনতি করে! আর যেখানেই রিফিউজি, সেখানেই ভিখারী। প্যারিসে কিছু আছে আলজিরিয়ার রিফিউজি। একদিন দেখি, একটা ছোট্ট পার্কে ওয়াইনের বোতল সঙ্গে নিয়ে একজন কেক্ খাচ্ছে—আশেপাশে দু-তিনটে রিফিউজি ছোকরা ছুকরি ঘুর ঘুর করতে লাগলো। একজন শেষে বলেই ফেললো, তার নাকি ওয়াইন সর্ট পড়ে গেছে, কেক্ খেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, সুতরাং সে যদি একটু—।

রোমে একটা লোক এসে বললো, তুমি বোতাম কিনবে ?

না, ধন্যবাদ।

ক্যালেণ্ডার কিনবে ?

না, ধন্যবাদ।

দেন, প্লিজ হেল্প্ মী টেন লিরা !

প্রত্যেক জায়গাতেই আমি এ-সব শুনে খুশি হয়েছি। কারণ, ওসব দেশে, এত অসংখ্য লোক আমাকে অকারণে সাহায্য করেছে।

দেশে ফেরার পরের দিন গলির মোড়ে পুরানো বৈরাগীকে দেখতে পেলাম, খঞ্জনি বাজিয়ে আগমনী গান গাইছিল ঃ 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা কত মা-মা বলে কেঁদেছে।' আমাকে দেখে একগাল হেসে বললো, খোকাবাবু, ভালো আছো, কদ্দিন দেখিনি। দাও, গরীবকে দুটো পয়সা দাও।

পকেটে হাত দিলাম। হা-কপাল। একটাও পয়সা নেই। সত্যিই নেই।

তেরো

রাত্রি ন'টা আন্দাজ টেলিফোন বেজে উঠলো।

—তুমি খুব ব্যস্ত। একবার আসতে পারবে ?

পরিচিত অধ্যাপকের স্ত্রীর গলা।

আবহাওয়া ভালো নয়, প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে। সারাদিন সন্ধ্যের পর ঝড়ের হাওয়া উঠেছে। অধ্যাপকের বাড়িতে পৌঁছুলাম। সদর দরজা খোলাই ছিল, আমি না ডেকেই ভেতরে ঢুকে গেছি বহুবার! ওঁদের কুকুরটাও আমাকে চেনে।

বসবার ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু শূন্য ঘর, বাইরের ঝড়ের শব্দ উঠছে শাঁ শোঁ করে। কি রকম যেন অস্বাভাকি লাগলো—সারা বাড়িতে কোন জনপ্রাণীর শব্দ নেই—মেরি আমাকে টেলিফোন করে হঠাৎ এ সময় ডাকলোই

বা কেন? কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো? কিন্তু বিপদ-আপদ হলে আমাকেই বা ডাকতে যাবে কেন? আমি কি করবো, আমার আর কি করার ক্ষমতা আছে? আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম, মেরি। মেরি!—শূন্য বাড়িতে আমার ডাক প্রতিধ্বনিতে হতে লাগলো। কুকুরটা ছুটে এসে শুধু কুঁ-কুঁ করতে লাগলে পায়ের কাছে।

একটু পরে পায়ের শব্দ পেলাম। বেসমেনট অর্থাৎ মাটির তলা থেকে উঠে এলো মেরি! পরনে একটা ঢিলে গাউন, শুকনো মুখ, একমাথা সাদা চুল এলোমেলো! ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললো, ইস্, তুমি অনেকক্ষণ এসেছো বুঝি! তোমাকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ছি, ছি! আমি বেসমেন্টে গিয়ে বসে ছিলাম, জানো, আমি ঝড়ের শব্দ মোটে সহ্য করতে পারি না।

অধ্যাপকের নাম করে জিজ্ঞেস করলুম, আলবার্ট কোথায়? পিতার বয়সী সেই অধ্যাপক এবং মায়ের বয়সী অধ্যাপকের পত্নী, কিন্তু এ দেশের নিয়ম নাম ধরে ডাকা। কথার ভঙ্গি এমন যেন তুমি করে কথা বলছি এমন কোনো ঠাট্টা ইয়ার্কি নেই যা এঁদের সামনে করা যায় না। যদিও আমি ওঁর ছাত্র নই, অন্য সূত্রে পরিচয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ ছাত্ররাও অধ্যাপকের সঙ্গে এই সুরেই কথা বলে।

মেরি বললো, আলবার্ট গেছে নিউ ইয়র্ক, তুমি জানো না? সাতদিন আগে!

—সে কি, এই সাতদিন তুমি একা আছো?

মেরি বিষণ্ণ হেসে বললো, হ্যাঁ, আর কে থাকবে বলো! জানো, আজ অ্যালবার্টের প্লেনে চড়ে বোস্টন যাবার কথা, এই ঝড়ের রাত আমার এমন ভয় করে!

—আমাকে হঠাৎ ডেকেছো? তোমার কোন জিনিসের দরকার আছে আমি এনে দেবো?

—না, না। তোমাকে ডেকেছি একটু গল্প করার জন্য। তোমার যদি কোন কাজ থাকে, তাহলে অবশ্য······না, না, ডোন্ট বি পোলাইট! তুমি সত্যি করে বলো, আমার জন্য শুধু শুধু······

আমি বিষম ব্যস্ত হয়ে বললুম, মোটেই না, আমার কোনই কাজ ছিল না। আমি টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে বসে নভেল পড়ছিলুম। তার বদলে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার অনেক ভালো লাগবে!

—মোটেই না, আমি জানি! বুড়ির সঙ্গে গল্প করতে কার ভালে লাগে। কারুর না! তোমার বয়সী ছেলেদের তো নয়ই, এমন কি বুড়োদেরও নয়! কিন্তু আজ বড় মন খারাপ, খুব একা একা লাগছে, কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারছিলুম না। এসো না হয়, আমরা দুজনে বসে এক সঙ্গে টেলিভিশন দেখি!

—না, থাক! টেলিভিশন আমার অসহ্য লাগে। বরং গল্প করি এসো!

মেরি খানিকটা হাসলো। তারপর বললো, আমিও যে টেলিভিশন খুব ভালোবাসি তা নয়, কিন্তু বুঝলে, একা থাকলে অনেকটা সঙ্গ দেয়। আচ্ছা, তুমি কি ড্রিংকস্ নেবে বলো? আমি নিয়ে আসি, তারপর গল্প করা যাবে।

আমি নাম বললুম।

মেরি রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে পানীয় তৈরী করতে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে দূর থেকে ওঁর দিকে চেয়ে রইলুম। বার্ধক্যে ওঁর শরীর একেবারে ভেঙেনা দিয়ে বরং অন্য ধরনের সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃদ্ধাদের মতো, ওদের পোশাক পরিচ্ছেদে অবহেলা নেই। স্বামী বিখ্যাত অধ্যাপক, প্রায়ই নানান কাজে এখানে ওখানে যেতে হয়। প্রায়ই খবরের কাগজে স্বামী সম্পর্কে প্রশস্তি বেরোয়। সুতরাং ওকে দেখলে মনে হয় সুখী মহিলা। কোনো অতৃপ্তি থাকার কথা নয়।

কিন্তু এই ঝড়ের রাত্রে দেখে বুঝতে পারলুম কত অসহায়। নিজের মুখে প্রায় ভিখারিনীর মতো স্বীকার করলেন, একা থাকতে ওঁর খারাপ লাগছে। একথা সাহেব-মেমরা কেউ মুখে বলে না। কত পরিবারকে দেখেছি, এ-দেশের সর্বত্র, ইওরোপেও, সন্ধ্যেবেলা কি দারুণ বিষণ্ণ। কিছুই করার নেই। খবরের কাগজ মুখে নিয়ে বসে থাকা, অথবা টেলিভিশনের সামনে ঝিমোনো। বিশেষ করে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কিছু করার নেই। ছেলেরা বিয়ে করে আলাদা বাড়িতে থাকে। মেয়েরা চলে যায় পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে। অথবা

এক বাড়িতেও থাকলে ছেলে-মেয়ে বাপ-মার সঙ্গে বসে সন্ধ্যেবেলা গল্প করতে আসে না। রবিবার গীর্জাতে গিয়ে যা একটু গল্প-গুজবের সুযোগ, আর নানা ধরনের ক্লাবের মিটিং-এ কিছুটা পরনিন্দা পরচর্চা। এ-ছাড়া আর সঙ্গ নেই। বুড়ো-বুড়িদের পার্টিতেও ডাক পড়ে খুব কম। বাড়িতে পূজো করারও প্রথা নেই যে, আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমার মতো দিনরাত ঠাকুর-ঘরে পড়ে থাকবে।

মেরির দুই মেয়ে এক ছেলে। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ফিলাডেলফিয়ায় থাকে। ছেলে থাকে জাপানে। আরেক মেয়ের বিয়ে হয় নি, কিন্তু তার বিষম ঘোড়া পোষার সখ। শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটা ফার্মে ওদের দশটা ঘোড়া আছে, মেয়ে সেখানেই থাকে একা। সপ্তাহে একবার হয়তো বাপ-মার সঙ্গে এসে দেখা করে যায়। এদের কারুর কোনো ভয় ডর নেই, মেয়ে থাকে একা সেই নির্জন ফার্মে, দুটো ভয়ংকর কুকুর তাকে পাহারা দেয়। আর মা আছে একা। এই নির্জন বাড়িতে ঝড়ের রাত্রে সম্পূর্ণ একা।

মেরি যে আমাকে ডেকেছে, সে যে শুধু আমাকে স্নেহ করে সেই জন্যই নয়, আমি বিদেশী বলে প্রত্যাখ্যানও করবো না। কিন্তু আমার বয়সী এ দেশের কোনো ছেলে-মেয়েকে ডাকলে মোটেই আসতো না, হয়তো মুখের ওপরই ঠাট্টায় প্রত্যাখ্যান করে উঠতো। দরকার ছাড়া কেউ কারুকে ডাকে নাকি? শুধু এক বুড়ির সঙ্গে গল্প করার জন্য? অসম্ভব! অন্য কোনো বুড়ো-বুড়িকেও ডাকা যায় না। সেও নির্জন, সেও একাকীত্বে অসুখী, কিন্ত কেউ কারুর কাছে স্বীকার করবে না সে কথা। সে যে বিষম লজ্জার। এমন কি আমাকেও যদি মেরি প্রায়ই ডাকে, আমারও হয়তো আসতে ভালো লাগবে না, আমিও হয়তো মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে এড়াবার চেষ্টা করবো আগেও তো করেছি আমার বুড়ো বাড়িওলা যখন আমার ঘরে এসে অনাবশ্যক গল্প করে দেরী করেছে, আমি ব্যস্ততার ভাব করে সরে পড়েছি।

অথচ মেরির সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালোই লাগে। অত্যন্ত বুদ্ধিম এবং রসিকতা জ্ঞান আছে। কোনো রকম কুসংস্কার নেই। বহু জিনি সম্পর্কে ভালো পড়াশুনো আছে। কিন্তু যখনই নির্জনতার প্রসঙ্গ আ তখনই আমার অস্বস্তি হয়। মনে হয়, কোনো মানুষেরই নির্জনতা আ

পর্শ করতে পারবো না। আমার সাধ্য নেই, কারুর একাকীত্ব ঘোচাবার। আমি সে মন্ত্র জানি না। আমি বসে বসে কথা বলতে পারি, কিন্তু যখনই নে হবে, এ-সব কথাই আসলে মূল্যহীন, আসলে একজন মানুষকে কিছুক্ষণ ঙ্গ দেওয়া, তার একাকীত্ব ভুলিয়ে রাখা, তখনই আমার অস্বস্তি লাগে, আমার মনে হয়, আমিও খুব দূরে সরে যাচ্ছি, দূরে সরে গিয়ে কোথায় আমিও বিষম একা হয়ে পড়লাম।

মেরি পানীয় এনে বসলো আমার সামনে। কি যেন দু-একটা কথা বলে সামান্য হাসিহাসি করলুম। একটু বাদেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলুম, অনেকক্ষণ আমরা কথা না বলে চুপচাপ বসে আছি। আমাদের কথা ফুরিয়ে গেছে। তখন মেরি বললো, তুমি শুনবে, আমি পিয়ানো বাজাবো? তোমার খারাপ লাগবে না তো?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

উঠে গিয়ে মেরি পিয়ানোর সামনের টুলে বসলো। একা একা বুঝি পিয়ানোও বাজানো যায় না। তার জন্যও একজন সঙ্গীর দরকার হয়।

বাইরে তখন ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পিয়ানোর টুং টাং শব্দ শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। আমার মনে হল, মেরি তো এমনিতে কাঁদতে পারবে না মন খুলে। তবু, এই পিয়ানোর শব্দের মধ্যে কিছুক্ষণ কেঁদে নিক!

চৌদ্দ

তাহিতির সমুদ্র পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক ভদ্রমহিলা যেন হঠাৎ ভূত দেখে চমকে উঠলেন। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। আধ-ময়লা, ছেড়া পোষাকপরা একজন বুড়ো মতন লোক বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে অবিকল দেখতে পল্ গগ্যাঁর মতন। কিন্তু তাতে কোনো রকমেই সম্ভব হতে পারে না, কারণ পল্ গগ্যাঁ মারা গেছেন অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে, ঐ তাহিতি দ্বীপেই, অনাহারে-অপমানে, রোগে ভুগে, লোকচক্ষুর

আড়ালে। মাসে ১৬ হাজার টাকার চাকরি ছেড়ে প্যারিস থেকে চলে
গিয়েছিলেন পল্ গগ্যাঁ। পানামায় এসে মাটিকাটা কুলিগিরি করেছেন
দীর্ঘকাল, তারপর তাহিতি দ্বীপে এসে নির্জন প্রবাস। সভ্যতার সঙ্গে সমং
সংস্রব ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। তাহিতি দ্বীপে তাঁর শেষ জীবনে আঁক
বিশাল ছবি "আমরা কে? আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা কে
এখানে? আমরা কোথায় চলেছি?" সমস্ত পৃথিবীর চিত্রশিল্পে একটি
মহামূল্যবান সম্পদ।

নিজের স্ত্রী আর পাঁচটি ছেলেমেয়েকে জন্মের মতো ত্যাগ করে
এসেছিলেন। ছেলেদের দেখার জন্য মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো, কিন্তু বউ বিষ
বদমেজাজি, রোজগারহীন স্বামীকে অপদার্থ ছাড়া আর কিছু মনে করতে
না। শেষ পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, গগ্যাঁ
তাহিতি দ্বীপেরই একটি আদিবাসী মেয়েকে—নাম, পাহুরা—স্ত্রী হিসেবে
অবৈধভাবে গ্রহণ করে এক সঙ্গে বসবাস করেন। কিন্তু, সে যা হোক, আ
এতদিন পর আবার গগ্যাঁর দেখা পাওয়া অসম্ভব। গগ্যাঁর মৃত্যু খুব
নিশ্চিত, একবার অসার্থক আত্মহত্যার চেষ্টার অল্প কিছুদিন পরই হার্ট ফে
করে মারা যান, একা ঘরে, একটা পা খাটের বাইরে বেরিয়েছিল—যেন শে
মুহূর্তে আর একবার দাঁড়াতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রমহিলা সেই বুড়ো মতন লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে
'আপনার নাম কি?' বিশাল কর্কশ গলায় উত্তর এলো, 'গগ্যাঁ'। ভদ্রমহি
আরও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

আদিবাসী মেয়েটি গগ্যাঁকে একটি ছেলে দিয়েছিল। নাম রেখেছি
এমিল্ গঁগ্যা। মৃত্যুর আগে গগ্যাঁ তার ঐ পুত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তি
হয়ে এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন। এমিল্ কি প্যারিস গিয়ে লেখাপ
শিখবে? না, গগ্যাঁ নিজেই ঠিক করলেন, 'সভ্যতা' নামক দূষিত হাওয়া
সংস্পর্শে তাঁর প্রাকৃতিক সন্তানের যাবার দরকার নেই। সে খোলা আকাশে
নীচে আপন স্বভাবে গড়ে উঠুক। সুতরাং, গগ্যাঁর মৃত্যুর পর, অন্যা
আদিবাসী অনাথ বালকদের যা হয়, এমিলেরও তাই হলো। সে লেখাপ
শিখলো না, কাজকর্ম কিছুই শিখলো না, ছেলেবেলায় রইলো টুরিস্টদে

ফুটফরমাজ খাটা চাকর, তারপর ক্রমে ক্রমে অশ্লীল ফটোগ্রাফ বিক্রী করা, নিষিদ্ধ প্রমোদের মধ্যম পুরুষ। তারপর এমিলের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে যখন, তখন তাকে আকিষ্কার করলেন ঐ শিল্পরসিকা ফরাসী মহিলা। মহিলার নাম, মাদাম যোষেৎ জীরো।

এমিলকে দেখতে যে হুবহু তার বাবার মতো, তা ঠিক নয়। তবে, তার মুখ দেখলেই গগ্যাঁর কথা মনে পড়ে। পিতার চেহারার সঙ্গে যেমন অমন মিল, তেমন পিতার প্রতিভার কিছু কি ও পেয়েছে?—এই ভেবে ভদ্রমহিলা এমিলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের সঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে এলেন। তারপর তার সামনে রাখলেন রং-তুলিক্যানভাস। জীবনে কোনোদিন ওসব ছোঁয়নি এমিল। তিন বছরের মধ্যে এমিল গগ্যাঁ হয়ে উঠলেন একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী।

এমিলের বাবা পল্ গগ্যাঁরও শিল্পী-জীবনের শুরু ঐরকম আকস্মিক-ভাবে। পল্ গগ্যাঁও কোনোদিন ভাবেন নি তিনি শিল্পী হবেন, শেয়ার মার্কেটের অফিসে বড় চাকরি করতেন, তাঁর স্ত্রীও স্বপ্নেও কোনোদিন স্বামীর ঐ দুর্মতির কথা কল্পনা করেন নি। সব ছেড়েছুড়ে শুধু শিল্পী হবার জন্যই আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে টানে, হয়তো তারই নাম 'প্রেরণা'। শিল্পী হিসেবে গগ্যাঁ সমস্ত বিশ্বে তুলনারহিত। তাঁর ছেলে এমিলও কত বড় শিল্পী হবেন তা এখনও বলা যায় না—কারণ এমিল সুরু করেছে বড় দেরীতে, ৬২ বছর বয়সে, ওর বাবার মৃত্যুই হয়েছিল ৫৫ বছরে। কিন্তু এই বয়সে এমিলের চিত্তের সুপ্ত সুকুমার-বৃত্তির উন্মেষ সত্যিই বিস্ময়কর। এমিল গগ্যাঁর ছবির একাধিক প্রদর্শনী হয়ে গেছে লণ্ডনে, শিকাগোতে, ক্যালিফোর্নিয়ায়

শিকাগোতে এক প্রদর্শনীতে, আমার সঙ্গে এমিল গগ্যাঁর দেখা হয়েছিল। হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি, হো-হো করে হাসে, তিন বছরে একটুও ইংরেজি শিখেনি। ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে কথা বলে। শুনলাম, ছবি আঁকা সম্বন্ধে খুবই মনো-সংযোগ হয়ে উঠেছে সে, অত্যন্ত যত্ন করে ড্রয়িং শিখছে, সেই সঙ্গে ভাস্কর্য। কিন্তু রং-এর ব্যবহার তার নিজস্ব, রীতিবিরুদ্ধ এবং টাটকা শিল্প সম্ভাবনাময়। অতিরিক্ত মদ্যপানের স্বভাব ছিল তার, সেটা আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলেছে।

ওর বাবা ছিলেন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, এমিল কিন্তু গোঁড়া ক্যাথলিক। নিয়মিত

যায়। আমেরিকার দুটো জিনিস তার খুব পছন্দ: হট্ ডগ (এক ধরনের সস্তা খাবার) এবং মেয়েরা। কথায় কথায় সে বলে, 'হট্ ডগ এবং মেয়েরা দীর্ঘজীবী হোক্!' ওর সঙ্গে একটা আধটা কথা বলতে আমার খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ভাষায় কুলোচ্ছিল না। অতিকষ্টে আমার যাবতীয় ফরাসীজ্ঞান আহরণ করে ওকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার বাবার কথা আপনার একটুও মনে আছে?' আমার এবং ওর উচ্চারণের এত তফাৎ যে, ও বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারলো না। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আমার কাঁধে ওর বিশাল থাবায় দুই চাপড় দিয়ে বললো, 'চমৎকার! চমৎকার!'

পনের

উঠেছিলুম শহরের ঠিক হৃৎপিণ্ডের কাছে, প্লাজা হোটেলে। নিউ ইয়র্কের সেরা হোটেলগুলির একটা। আমাদের হিসেবে প্রায় আড়াই শো টাক শুধু ঘর ভাড়া—বলা বাহুল্য, আমি একজনের অতিথি। চৌরঙ্গির সামনে ময়দানের মতো, বিশাল সেণ্ট্রাল পার্কের গায়ে এই হোটেল, এলাহি কাণ্ড প্রানপণে পুরোনো বনেদীভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা, ঝাড়লণ্ঠনে, এমন বি সামনে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। আমি ছাড়া আর দ্বিতী কালো বা তামাটে রঙের লোক নেই বলে একটু অস্বস্তি লাগলো– সেই লিফ্‌টম্যান বা ম্যানেজারে 'গুডমর্নিং স্যার' শুনে গম্ভীর ভাবে কাঁধ ঝাঁকাতুম।

প্রথম দিন দেখি একটি চটপটে চেহারার ছেলে, আমি যখন ঢুকতে যাচ্ছি, দ্রুত বেরুচ্ছে, চোখে কালো রোদ-চশমা, ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠলো, দারোয়ান বেহারারা দরজা খুলে তটস্থ। ছেলেটিকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো, বিশেষত ওর দৌড়োবার ভঙ্গী। পরে মনে পড়লো, ওর নাম পল নিউম্যান, অনেক ছবিতে দেখেছি, হলিউডের উত্তমকুমার। আর একদিন

ঐ হোটেলের লবিতেই দেখি একজন কাঁচাপাকা চুলের ভদ্রলোক সপারিষদ দাঁড়িয়ে, চিনতে দেরি হয়নি, স্যার অ্যালেক গিনেস। তার আগের দিনই তাঁকে দেখেছি ব্রডওয়ের স্টেজে 'ডিলান' নাটকে, ক্ষুব্ধ, মত্তপ, তরুণ, আত্মহন্তারক ডিলান টমাসের ভূমিকায়।

কয়েকদিন পর আরেক কাণ্ড। বিকেলের দিকে বেরুতে যাচ্ছি, গেটের সামনে কি ভিড়, চেঁচামেচি, পুলিস—ভয় পেয়ে আমি ভেতরে ফিরে এলুম, আমার পনেরো তলার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারলুম নিচে। হাজার হাজার রিনরিনে গলার টিন্‌এজার মেয়ে রঙ-বেরঙের স্কার্ট দুলিয়ে রইরই করছে। ভিড় সামলাতে পুলিশ হিমসিম। একটু পরে এক লিমুসিন গাড়ি থেকে চারটে রুক্ষু চুলওয়ালা ছোঁড়া নামলো, আর অমনি পুলিসের কর্ডন ভেঙে ছুটে এলো মেয়েরা। ছোকরা চারটের বয়েস কুড়ি বাইশের মধ্যে, হুড়ো কুড়ো মাথা, চুল পড়েছে কপাল পর্যন্ত, নিরীহ বদমাশের মতো তাকাচ্ছে হেসে হেসে। বুঝলুম, এরা বিট্‌লস্, সাম্প্রতিক সামাজিক গুজব, ক্রেজ, এলভিস্ প্রিসলির চতুর্গুণ অবতার, উত্তেজনা। গ্রেট ব্রিটেন থেকে আমদানী, স্টেজের ওপর নেচে-কুঁদে, গান গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার উপায় করছে! কাগজে কাগজে এদের ছবি এখন।

আমি কবি পল এঙ্গেলের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে এসেছি। আয়ওয়া-র লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক কবি পল এঙ্গেল আমাকে এ শহরের বহু প্রখ্যাত লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। বিস্ময়, আনন্দ, উপভোগ—এই কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে ডুবে আছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমি একটা অন্য লোক হয়ে গেছি, অন্য জগতে, এক এক সময় আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। পল এঙ্গেলের ব্যবহার চির সুহৃদের মতন আন্তরিক, তবু কয়েকদিন পর অকৃতজ্ঞের মতন আমি এঙ্গেলকে বললুম, ছাখো এখানে এ হইহুল্লার মধ্যে আমার থাকা হবে না। আমার অসুবিধে হচ্ছে।

'অসুবিধে হচ্ছে ?' ও আমার কথা ঠিক বুঝতে পারলো না।

আমি বললুম, 'আমার ঠাকুর্দা ছিলেন পাঠশালার পণ্ডিত, বাবা ছিলেন ইস্কুল মাস্টার, আমি বেকার—আমার কি এসব আরাম বেশীদিন সহ্য হয় ? আমার রাত্রে ঘুম হচ্ছে না।'

'এটা কোনো যুক্তি হলো না। ঘুম হচ্ছে না কেন?'

'যে বিছানায় দিনে দুবার চাদর পাল্টানো হয়, সে বিছানায় শুয়ে সত্যি আমার ঘুম হয় না।'

'এদিকে এসো জানলার কাছে। ছাখো।' ও আমাকে বললো। জানলা দিয়ে দেখলুম, যতদূর চোখ যায় হর্ম্যের সারি, আতিগন্ত যুঁইফুলের মতো হালকা বরফ পড়ছে, নীচে, সেন্ট্রাল পার্কে রঙিন প্রজাপতির মতো ছেলে-মেয়েরা স্কেটিং করছে অবিরাম. দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু এমন দৃশ্য বহুবার বহু ছবিতে দেখেছি

'এ রকম দৃশ্য তুমি আর কোথায় পাবে?

আমি মনে মনে ভাবলুম, কিন্তু এখানে থাকলে আমার শুধু দৃশ্যই দেখা হবে, নিউ ইয়র্ক দেখা হবে না!

ওঃ, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, সে কথা এখনও বলা হয়নি। প্রথম দিন এসেই সন্ধ্যেবেলা ও কাজ সেরে রেখেছিলুম। কী হতাশ হয়েছিলুম প্রথমটায়। লজ্জার কথা কি বলি, গোড়াতে খুঁজেই পাইনি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। লোককে জিজ্ঞেস করতেও পারিনি, অত বড় বাড়ি যা নাকি তিনশো মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হারিয়ে গেছে বললে সবাই নিশ্চিত হাসবে। অন্তত গোটা দশেক বাড়িকে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং বলে ভুল করেছিলুম, শেষে অতিকষ্টে ম্যাপ দেখে খুঁজে পেলুম। না, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উচ্চতা একেবারে গুজব না, একশো দুই তলা ঠিকই, আমি নিজে চড়ে দেখেছি। কিন্তু আশে পাশে আরও অনেক সত্তর-আশী তলা বাড়ি থাকলে, ওর মহিমা ঠিক বোঝা যায় না। ও বাড়িটা যে সত্যি সত্যি উঁচু তা বুঝতে পারা যায় বহু দূর থেকে কিংবা খুব কাছ থেকে'

তেমনি নিউ ইয়র্কের উঁচু সমাজ। প্রথম দিন-দশেক এঙ্গেল সাহেবের সঙ্গে আমি হোমরা-চোমরাদের বাড়িতে খুব ডিনার খেলুম, রকেফেলার পরিবার, অ্যাডলাই স্টিভেনসানের সহধর্মিণী, 'লাইফ' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর, ওমুক তেল কোম্পানীর মালিক ইত্যাদি—খাস খানদানী ব্যবস্থার ত্রুটি নেই, সাত আট কোর্স ডিনার, নানা রকম ওয়াইন, ইংরেজ বাটলার —আমি অকুতোভয় ছিলুম, বাঁধা ধরা ব্যবহার, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গড়ে পাঁচ

কমের বেশী প্রশ্ন হবে না জানতুম, মেয়েরা কেউ মুখে সিগারেট তুললে আগবাড়িয়ে ফটাস করে দেশলাই কাঠি জ্বালতে ভুল হয়নি। মাঝে মাঝে মুখ লুকিয়ে হাসতুম একা একা। দিনের বেলা আমি কোথায় খাই যদি জানতে পারতো এরা! দিনের বেলায় খাওয়া আমার নিজের খরচে, তখন খুঁজে খুঁজে যত রাজ্যের শস্তা জায়গায় যেখানে টিপ্‌স দিতে হয় না, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে স্যাণ্ডউইচ কিংবা হ্যামবার্গার গেলা যায়।

তবে সব পার্টির সেরা অ্যাস্টর হোটেলের পার্টি। কবিতার ওপর ধনী আমেরিকানদের আজকাল বড় দরদ। সব জায়গাতেই খাওয়ার পর এ নিয়ে কিছু না কিছু আলাপ করা দস্তুর। 'পোয়েট্রি সোসাইটি অব অ্যামেরিকা' নামের প্রতিষ্ঠান দেখে কে বলবে পৃথিবীতে কবিতার দুর্দিন। প্রচুর ধনী বুড়ো বুড়ি, কলেজের মাস্টার, রিটায়ার্ড কবি আছেন এ প্রতিষ্ঠানে। এদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অ্যাস্টর হোটেলে ডিনার, এবারের উৎসব বেশী জমজমাট, বেশী খুশী—কারণ, সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান এক মিলিয়ান ডলার চাঁদা পেয়েছে। বিশাল হলঘরে সবাই খেতে বসেছে, টেবিলে সবাইকার নাম লেখা কার্ড আছে আগে থেকে, নিজের নাম খুঁজে নিয়ে আমিও বসলুম. প্রায় হাজারখানেক নারী পুরুষ। সমিতির সভ্যদের জন্যও এ উৎসবে আলাদা পঁচাত্তর টাকা টিকিট, কিন্তু এঙ্গেল সাহেব আমার জন্য নেমন্তন্ন জোগাড় করে দিয়েছিলেন বলে, আমার ফ্রি। প্রধান অতিথি স্টিফেন স্পেণ্ডার—আমার নামও সভাপতি মশাই ভারতবর্ষের কবিতা পত্রিকার সম্পাদক বলে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঘোষণা করে দিলেন! সেই ঘোষণা শুনে আমার আশেপাশের দু চারজন চোখ গোল গোল করে আমার দিকে তাকাতেই আমি ফিসফিস করে বললুম, ওটা অনেকটা ফাঁকা আওয়াজ, বুঝলেন! কবিতার পত্রিকা মানে শ'পাঁচেক কপি ছাপা হয়, যত লোক কেনে তার বেশী বিলি হয়। ভারতবর্ষ তো দূরে থাক্ কলকাতাতেও আমাকে খুব কম লোক চেনে, মহাশয় মহাশয়াগণ!—এখানে আজ একরাত্রে কবিতার নামে যত টাকা খরচ হচ্ছে, তা দিয়ে কলকাতার তাবৎ কবিদের সংবৎসরের খোরাক জুটে যায়!' শুনলুম কোথাকার এক ডাচেস্, নিঃসন্তানা, মরার সময় সেই সোসাইটিকে এক মিলিয়ান ডলার চাঁদা দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁর সমস্ত টাকার কিছুটা

তাঁর পোষা বেড়ালের নামে, কিছুটা কবিদের জন্য। এক মিলিয়ন ডলার
অর্থাৎ পঁচাত্তর লাখ টাকা। বুঝলুম, নোবেল প্রাইজে আজকাল এদেশে
বিশেষ কোনো খবর হয় না কেন! নোবেল প্রাইজ, কি আর, লাখ পাঁচেক
টাকা মাত্র! আমাদের রবীন্দ্রনাথের নাম তো অনেকে শোনেই নি, অনেকে
নোবেল প্রাইজেরই নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ।

মাথায় সমস্ত চুল সাদা, স্টিফেন স্পেণ্ডার ভিড় ঠেলে আমার কাছে এসে
হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, 'আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি, কলকাতায়
আলাপ হয়েছিল।'—একেবারে ডাহা গুল, স্পেণ্ডার সাহেব বার-দুয়েক
কলকাতায় এসেছিলেন বটে, কিন্তু আমি নগন্য ব্যক্তি আমার সঙ্গে কখনো
দেখা হয়নি। যাই হোক, ওটা হজম করে, আমিও এক প্রস্থ দিলুম, বললুম,
'হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনার সেই অসুখটা এখন কেমন আছে?'

থতমত খেয়ে স্পেণ্ডার সাহেব বললেন, 'ভাল, ভাল খুব ভালো, একেবারে
সেরে গেছে, থ্যাঙ্কিয়ু, যামিনী রায়ের কি খবর?'

আমি এমনভাবে যামিনী রায়ের বৃত্তান্ত শোনালুম যেন কলকাতায়
থাকতে ওঁর সঙ্গে আমার দু'বেলা দেখা হতো। সলোমন নামে এক পুরানো
কবি বললেন, 'আমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে খুব ভালো জানি, টেগোর আর
তরু দত্তর সব লেখা পড়েছি।' বললুম, 'ক্ষমা করবেন, টেগোরের সব লেখা
আপনার পক্ষে পড়া অসম্ভব, আমার পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। আর তরু দত্ত
বাঙালী সাহিত্যিক নয়--ঐ মেয়েটি বাংলা দেশে জন্মে ইংরেজী ও ফরাসীতে
কিছু লেখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা বাংলা সাহিত্য নয়। আপনি
জীবনানন্দ দাশ পড়ার চেষ্টা করুন। না, না, জীবনাস্তো নয়, জীবনানন্দ।
অবশ্য, ওঁর বেশী লেখা অনুবাদ হয়নি।'

আর একজন কবি, নাম ভুলে গেছি, বললেন, 'বাংলা সাহিত্য মানে কি?
তোমাদের রাষ্ট্রভাষা তো হিন্দী, বাংলা তো একটা ডায়ালেক্ট।'

আমি বললুম, 'আপনার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু পরে আপনার
সঙ্গে আলাদা দেখা করে এ সম্বন্ধে বলতে পারি। এখানে এতবড় জায়গায়
ঠিক সুবিধে হবে না, আমি বক্তৃতা করতে পারি না বিশেষত বেশীক্ষণ
ইংরেজিতে বড় বড় বাক্য আমি একেবারেই ম্যানেজ করতে পারি না

খানিকটা ইংরেজী বলার পরই আমার জল তেষ্টা পায়, কান কট্‌কট করে, বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস আওয়াজ হয়!' (কান কটকটের ইংরেজী জানিনা বলে ওটা আমি ভঙ্গী দিয়ে বুঝিয়েছিলুম!)

ঐ পোয়েট্রি সোসাইটি পার্টিতে যাই হোক, নানা রকম উত্তম উত্তম খাবার ছিল, পানীয়, বক্তৃতা, গান ও আবৃত্তি হলো, অনেক কবি অনেক উপহার পেল, কিন্তু কবিতার কোনো ব্যাপার ছিল না। ঐ পার্টিতে আমি এক কাণ্ড করেছিলুন। খাবার টেবিলে সাধারণতঃ আমি আদবকায়দার ধার ধারি না, যা স্বাভাবিক মনে হয়, তাই করি। কিন্তু সেদিন ও রকম কেতাদুরস্ত আবহাওয়ায় আমি কি রকম ট্যালা হয়ে গেলুম, ভাবলুম সব ঠিক ঠিক করতে হবে। আমার পাশের চেয়ারে বসেছিলেন এক রূপসী ভদ্রমহিলা, সবুজ সান্ধ্য পোশাক পরা, নামও মিসেস গ্রীন, আমার সঙ্গে হেসে হেসে দার্জিলিং-এর আবহাওয়া বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, আমি আদব-কায়দায় ওকে হুবহু নকল করতে লাগলুম। কখন ন্যাপকিন কোলে রাখতে হবে, কোন হাতে ছুরি কাঁটা, বিনা শব্দে স্যুপে চুমুক, আইসক্রিমের চামচ ও কফির চামচে পার্থক্য, কোন হাত দিয়ে স্যালাড খেতে হবে—আমি আড়চোখে দেখে দেখে কপি করে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি, টেবিলের বাকি সবাই আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারি না, আমি আড়ষ্ট হয়ে কলার ঠিক করি, বো সোজা করি, জামা প্যাণ্টের বোতাম ঠিক আছে কিনা দেখি, তবু ফিক ফিক হাসি থামে না। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলুম, আমার পাশের ভদ্রমহিলা ন্যাটা, ওঁর দেখাদেখি এতক্ষণ আমিও বাঁ হাতে ছুরি ধরে ছিলুম!

এমনি ভাবে হাওয়ায় শিমূল ফুলের মতো আমি ভাসতে লাগলুম নিউ ইয়র্কের উঁচু সমাজে। কিছুই ছুঁতে পারিনি। পার্টি থেকে পার্টি, ট্রাম লাইনের মতো বাঁধা কথাবার্তা, আকাশ ছোঁয়া হোটেল। মাঝে মাঝে দিনের বেলা একা পথে পথে ঘুরতুম। কোনো দিন পথ ভুল করে হারিয়ে যাইনি। হঠাৎ কোথাও পথের মধ্যে থেমে তাকিয়ে থাকতুম ঐ বিশাল শহরটার দিকে। সত্যিই বিশাল। ভারতবর্ষে একমাত্র কলকাতার সঙ্গে মিল আছে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা ইংরেজদের কাছে কলকাতা সমেত তিনটি গ্রাম বেচে দিয়েছিল

মাত্র তেরেশো টাকায়, এই ম্যানহাটান দ্বীপও রেড ইণ্ডিয়ানরা ইওরোপীয়দের কাছে বিক্রি করেছিল মাত্র ছাব্বিশ ডলারে। আজ এই শহর শুধু বাণিজ্য নয়, শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্র। পৃথিবীর নানান দেশের লেখক শিল্পী জমা হচ্ছে এখানে। অসংখ্য আর্ট গ্যালারিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ছবি। পৃথিবীর সব দেশেই বাছাই করা সিনেমা দেখা যাবে এখানে, থিয়েটার, যে-কোনো বই। যে-কোনো খাবার, যে-কোনো পোশাক, যে-কোনো জাতের মানুষ। কলকাতার মতই জীবন্ত এই শহর—মাটির তলায় ট্রেন ও আকাশ ঝাঁড় দেওয়া বাড়ির সারি সত্ত্বেও। তবু, আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ঠিক এ শহরের প্রাণ ছুঁতে পারছি না।

একদিন হোটেলে ফিরে এঙ্গেল সাহেবকে বললুম, 'আমি চল্লুম এখান থেকে, গ্রীনইচ ভিলেজে শস্তা থাকার জায়গা পেয়েছি।'

তারপর আর বাক্যব্যয় না করে বিদায়।

নাম ভিলেজ, আসলে গ্রীনইচ ভিলেজ নিউ ইয়র্কের একটি পাড়া, আমাদের কলেজ স্ট্রীট পাড়ার মতো। নিউ ইয়র্ক কলেজ ও আশেপাশে বই-এর দোকান, ছোটো ছোটো বাড়ি ও রেস্তোরাঁ, যত রাজ্যের লেখক শিল্পী অভিনেতা গাইয়েদের আড্ডা। একটা ছোট্ট হোটেলের এক চিলতে ঘরে উঠলুম, নিজের ইচ্ছে মতো পাঞ্জাবীর দোকানে কষা-মাংস কিংবা চীনে হোটেলে ভাত মাছের ঝোল খাই। মাঝে মাঝে টেলিফোন করে এক অ্যামেরিকান কবি বন্ধুকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়, সে এখানে বিষম বিখ্যাত, যে-কোন পার্টিতে তার নাম করেছি সবাই চিনেছে ও কিছুটা আঁতকে উঠেছে। কিন্তু যেখানেই ফোন করি, শুনি, সে কাল এখানে ছিল, আজ কোথায় জানি না। দু-তিনদিন ঘুরলুম একা ওয়াল স্ট্রীট পেরিয়ে, স্ট্যাচু অব লিবার্টির চক্ষু-সীমায়।

আমার হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে একটা বড় বই-এর দোকান, সেখানে ঘুরঘুর করি, একদিন সাহস করে কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলুম, অ্যালেন গীনস্‌বার্গ কোথায় থাকে বলতে পারেন? লোকটা আমার দিকে মুখ তুলে বললো, আপনার নাম সুনীল সামথিং? ইণ্ডিয়া থেকে? এই যে একটা

চিঠি আপনার নামে। দোকানের ভেতর দিয়ে সোজা চলে যান, ডান দিকে সিঁড়ি, দোতলায় অ্যালেন গীনস্‌বার্গকে পাবেন।

বুক পর্যন্ত দাড়ি, অবিন্যস্ত চুল, ঠিক কলকাতায় যেমন দেখেছিলাম। তখন দুপুর একটা, সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে অ্যালেন। বললো, 'আমিও তোমাকে খুঁজছিলাম, আমার থাকার জায়গার ঠিক নেই, এক একদিন এক এক জায়গায় থাকি। এই বই-এর দোকানের মালিক এখানে কয়েকদিন থাকতে দিয়েছে। চলো ওপরে যাই রান্নাঘরে। বিলায়েত খান আর ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের রেকর্ড আছে, শুনবে?'

এতদিন পর ভারতীয় রাগসঙ্গীত শুনতে পেয়ে, যাকে বলে বুক জুড়িয়ে গেল। রাগসঙ্গীত যে আমি এত ভালোবাসি আগে কখনও বুঝতে পারিনি। অনেক কনফারেন্সে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি, এখানে রেকর্ডগুলো বার বার শুনতে লাগলুম। অ্যালেন ভাত আর মুর্গীর মাংস রেঁধেছিল আগের দিন, সেইগুলো গরম করে দুজনে খেলুম। সেই সঙ্গে চমৎকার জমানো দই। অ্যালেনের গায়ে পুরোনো রং-জ্বলা খাঁকি কর্ডের কোট ও প্যাণ্ট, জিজ্ঞেস করলুম, 'ওগুলো কোথায় পেলে, কলকাতায় তো ছিল না?' শুনলুম, ওর এক বন্ধু শিগ্‌গির মারা গেছে, তার বিধবা পুরোনো জামা-কাপড়গুলো দিয়ে দিয়েছে অ্যালেনকে। আমি কোথায় উঠেছি, আমাকে জিজ্ঞেস করল। প্লাজা হোটেল শুনে আঁতকে উঠল, বললো, 'আমি জন্মেছি এখানে, তিরিশ বছরের বেশী আছি নিউ ইয়র্কে, আজ পর্যন্ত ওসব জায়গায় ঢোকার সুযোগ পাইনি। আর তুমি! নিউ ইয়র্কে আর কি কি দেখলে বল!'

আমি আরম্ভ করলুম, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম, ইনষ্টি-টিউট অব মডার্ন আর্ট, ওয়াল ষ্ট্রীটের স্টক এক্সচেঞ্জ নামক চিড়িয়াখানা, নদীর তলায় লিঙ্কন টানেল, নিগ্রোপাড়া হার্লেম, ইউ এন বিল্ডিং। স্টাচু অব লিবার্টি? হ্যাঁ। রকেফেলার সেণ্টার? হ্যাঁ। কোন্ কোন্ লোকের সঙ্গে দেখা হলো? লিষ্টি দিলাম। যে সব লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছি, তাদের নাম শুনে ওর চোখ গোল হয়ে যাবার উপক্রম। ছেলেমানুষের মত বলল, 'ওখানে কি সব কথাবার্তা হয় বল তো শুনি, কখনও জানতে পারি না, কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে হয়।' নানা রকম গল্পের পর

অ্যালেন বলল, 'টুরিস্টরা যা দেখে তুমি সবই দেখেছ, এমন কি তার চেয়ে অনেক বেশী, ও সব জায়গায় সবাই ঢোকার সুযোগ পায় না। তুমি দেখেছ উঁচু সমাজের নিউ ইয়র্ক। চলো, তোমাকে আর একরকম নিউ ইয়র্ক দেখাই। কলকাতায় আমি টুরিস্টের মত ঘুরিনি, আমি দেখেছি চিৎপুর, চীনেবাজার, পোস্তা ঐ সবও। চলো, তোমাকে নিউ ইয়র্কের ওসব জায়গা দেখাই!'

খানিকটা বাদে ওর বন্ধু পীটার এল। তিনজনে রাস্তায় বেরুলুম। সারাদিন ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে। গ্রীনইচ ভিলেজের রাস্তায় নানা রকম লোক, এখানকার পোশাক তেমন ধোপদুরস্ত নয়, অনেক মেয়েদের মাথায় লম্বা চুল আবেণীবদ্ধ, ছেলেদের পোষাক রং-বেরং, গলায় টাই নেই—এরা শিল্পী, তাই বেশবাসে এদের ভিন্ন হবার দাবি আছে। বরফে ঢাকা নির্জন ওয়াশিংটন স্কোয়ার পেরিয়ে আসছিলুম। অ্যালেন বলল, 'এই পার্ক দেখে কার কবিতা মনে পড়ে বল তো?' বললুম, 'পল ভের্লেনের কলোক্ সাঁন্তিমঁতাল।' 'শীতের নির্জন পার্ক চতুর্দিকে ছড়ানো তুষার। দুটি ছায়া মূর্তি এইমাত্র পার হল।—'আমার দিকে হতচকিত হয়ে তাকাতেই আমি বললুম, 'না না, ভয় পাবার দরকার নেই, ভের্লেনের এই একটি মাত্র কবিতাই আমি জানি।'

পীটার সারা আমেরিকায় একমাত্র লোক যে বরফের ওপর দিয়ে মোজা ছাড়া শুধু হাওয়াই চটি (কলকাতায় কেনা) পরে হাঁটতে পারে। লোকে বলে, ওটা একটা বেড়াল, শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'সত্যি তোমার শীত করে না পীটার?' ও বলল, সুনীল, তোমার মনে আছে, কলকাতায় যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, জুন মাসের গরমে পীচের রাস্তায় রিক্‌শাওয়ালারা খালি পায়ে হাঁটে কি করে? তুমি বলেছিলে, অভ্যেস হয়ে গেছে।'

অমন বিচিত্র পোশাক গ্রীনইচ ভিলেজের, তবু ওদের দুজনের অতবড় দাড়ি ও এলোমেলো বেমানান জামা-কাপড় দেখে এখানেও লোকে হাসে, যেমন কলকাতায় হাসত। পাড়ার মোড়ে মোড়ে বসা ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওরে পাগলারা, ভোর হয়ে গেছে, এখনও দাড়ি কামাবার কথা মনে নেই তোদের?' অথবা 'ওরে, তোদের গালে ও কিসের জঙ্গল রে?' অ্যালেন

কোনো উত্তর দেয় না, কিন্তু পীটার মাঝে মাঝে হেসে জবাব দেয়, 'পয়সা নেই ভাই, তাই কামাতে পারিনি।' অথবা 'আমি ইণ্ডিয়ান সাধু!' এরপর যে কটা বাংলা-হিন্দী শব্দ জানে এক নিশ্বাসে বলে দেয়, 'নমস্কার, সব ঠিক হ্যায়, দাম কিৎনা, আচ্ছা, আমি বালো আছি, সারেগামা পাধানিসা!'

যত হাঁটতে লাগলুম ততই জাঁকজমক বিরল হয়ে এল। অথচ সেটাও নিউইয়র্ক। ম্যানহাটান দ্বীপ। ও দিকটাকে বলে লোয়ার ইস্ট সাইড। রাস্তাগুলো ভাঙাচোরা, এখানে সেখানে জল-কাদা জমেছে। ছেঁড়া জামাপরা লোক, পোর্টরিকান, নিগ্রো, ইহুদী অঞ্চল। এই প্রথম দেখলুম দোকানে কাটা মাংস ঝুলছে। মোড়ে মোড়ে জটলা করছে বেকার ছেলের দল। এবং অবিশ্বাস্য হলেও, মাঝে মাঝে সাদা চামড়ার ভিখিরী, মেয়ে ও পুরুষ। যতবার ভিখিরিদের পয়সা দিচ্ছি, অ্যালেন ও পীটার হাসছে। বলছে, 'তুমি ইণ্ডিয়ান হয়েও আমেরিকানদের ভিক্ষে দিয়ে একটা নিষ্ঠুর আনন্দ পাচ্ছো, না?' ঠেলাগাড়িতে শস্তা মালপত্র সাজিয়ে ফিরিওয়ালা হাকছে লে-লে বাবু ছ-আনা। কোথায় গেল সব সুপার মার্কেট।

আমরা যাচ্ছিলুম অ্যালেন ও পীটারের ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে। ভাড়া নিয়ে নিজেরাই ঘর রং করছে, দরজা জানলা সারাচ্ছে। একটা অন্ধকার গলি দিয়ে ঢুকলুম, ছ'তলা বাড়ি কিন্তু লিফ্ট নেই, নড়বড়ে রেলিং, নোংরা সিঁড়ি, দেওয়ালে অসভ্য কথা লেখা, আমাদের উত্তর কলকাতার যাচ্ছেতাই ভাড়া-বাড়িগুলোর তুলনায় কোনো অংশে ভালো নয়। শেষ পর্যন্ত ওদের ঘর দেখে আমি হতাশ হয়ে প্রায় মাটিতে বসে পড়লুম। অ্যালেন বলল, 'তুমি ছমাস আমেরিকায় থেকে সত্যি আমেরিকান হয়ে গেছ! কলকাতায় অনেকের বাড়ি কি আমি দেখিনি? এর চেয়ে ভালো নয়!'

'যদিও এ কথা ঠিক, অ্যালেন বলল, 'আমেরিকায় ঠিক না খেয়ে লোকে মরে না। বেকার ভাতা ইত্যাদি আছে। অপর্যাপ্ত সম্পদের দেশে একটু চেষ্টা করলেই যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়! কিন্তু গরীব আর বড়লোকদের মাঝখানের তফাত ভয়ংকর বেশী। তা ছাড়া স্লামে থাকা যাদের স্বভাব, তারা চিরকাল স্লামেই থাকবে—স্লাম বা অট্টালিকা কোথায় বেশী সুখ, কে জানে? আমার মত যারা, তারা চাকরি বাকরি করে সময় নষ্ট করতে চায়

না, সমস্ত জীবনটাই শিল্পের জন্য ব্যয় করতে চায়, তাই তাদের দারিদ্র। কিন্তু শুধু কবিতা লিখে বেঁচে থাকাই তোমাদের অসম্ভব! এখানে সেটা অসম্ভব না। লেখা থেকে যদি আমার বেশী টাকা আয় হয়, আমিও ভালো বাড়িতে উঠে যাব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িতে থাকতে আমারও ইচ্ছে হয়!'

সন্ধ্যে হয়ে আসার পর আমরা বেরুলুম। তুমি সাবওয়ে চেপেছ একবারো? আমি জিজ্ঞাসিত হলুম। (সাবওয়ে অর্থাৎ মাটির তলায় ট্রেন, প্যারিসে যার নাম মেট্রো, লণ্ডনে টিউব), সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলুম পাতালে —দুপাশের প্লাটফর্ম ঝকঝক করছে নিওন আলোয়, কোথাও হাওয়ার কষ্ট নেই, আশ্চর্য 'কলকাতায় এমন ট্রেন নেই কেন?' অ্যালেন জিজ্ঞেস করল, তৎক্ষণাৎ পীটার জুড়ে দিল, 'তা হলে কি চমৎকরে শোবার জায়গা হত ভিখিরি কিংবা রিফিউজিদের।'

ট্রেনের অনেক লোক অবাক হয়ে দেখছিল ওই বিচিত্র যুগল মূর্তিকে, অনেকে হাসা-হাসি করছিল। অ্যালেন গুনগুন করে ভৈরবীর সুর ভাঁজছিল, পীটারের মাথায় কাশীর লাল টুপি। একজন বুড়ো ভদ্রলোক অনেকক্ষণ তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, 'আহা, দেখে মনে হয় যেন বাইবেলের যুগ থেকে উঠে এসেছে।' অ্যালেন বললো, 'সকলেই সেখান থেকে। আমি মজা করার জন্য জিজ্ঞেস করলুম, 'আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, আমি কোথা থেকে এসেছি?' আমাকে অবাক করে ভদ্রলোক বললেন 'মহাভারতের যুগ থেকে!' আলাপ হলো, শুনলুম, গাড়ির এককোণে পুরানো ওভারকোট পরে বসে থাকা ঐ বৃদ্ধটি যুদ্ধের আগে জাপানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন কিছুদিনের জন্য।

পাতাল ফুঁরে আবার উঠলুম মর্ত্যে! বরফপড়া তখনও থামেনি রাত্রের গ্রীনইচ ভিলেজ সত্যিকারের জাগ্রত! এখানে ওখানে জ্যাজ ও নানারকম বিদেশী (এদের ভাষায় এক্সটিক) গান বাজনার আওয়াজ। আমরা গুনগুন করে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গাইছিলুম, খানিকটা পরে অ্যালেন বে গলা ছেড়ে গাইতে লাগলো, নির্ভুল সুর, উচ্চারণ খানিকটা হিন্দী ঘেঁষা।

গ্রীনইচ ভিলেজ এখন টুরিস্টদের ভিড়ে ভরে গেছে। নিউইয়র্কে অবশ্যদ্রষ্টব্য জায়গার গাইডবুকে এখন গ্রীনইচ ভিলেজেরও নাম। দে

বিদেশের লোক এখানে আসে কবি-শিল্পীদের পাগলামি দেখতে। তাই বহু
কল শিল্পীতে এখানকার কাফে রেস্তোরাঁ ভরে গেছে। আসল লোকেরা
ক্রমশ এখান থেকে সরে যাচ্ছে। ঐ বারে ডিলান টমাস তার আত্মহত্যার
শেষ মদ্যপান করেছিল, এই পন শপে এফ স্কট ফিটজেরাল্ড তার জামা কাপড়
বাঁধা দিয়েছিল। কামিংস থাকতো ঐ বাড়িতে, এইখানে হেমিংওয়ে আড্ডা
দিতো—এসব দেখতে দেখতে যাচ্ছি—হঠাৎ এক বিশ্ব-বিখ্যাত লোকের সঙ্গে
দেখা হয়ে গেল পথে, অ্যালেনকে দেখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন
আমাদের সঙ্গে, আলাপ হলো, স্যালভাডোর ডালি। প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছে,
লাল রঙের কোট গায়ে, মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ, পৃথিবীতে আমার
সবচেয়ে দ্বিতীয় প্রিয় শিল্পীকে চাক্ষুষ দেখে খানিকটা হতাশ হলুম, না দেখলেই
ভালো হতো। পৃথিবীতে যারা টাকা তৈরি করে—স্যালভাডোর ডালি এখন
তাদের কাছে কিছুটা আত্মসমর্পণ করেছেন।

'বিনে পয়সার কফি খাবে সুনীল?' পীটার জিজ্ঞেস করলো। এখানে
গোপনে অবাধ গাঁজা মেরুয়ানা, মেস্কালিন, হাসিস ইত্যাদি মাদক নেশার
অবাধ প্রচলন। শিল্পীদের সে সব অভ্যেস ছাড়ানোর জন্য স্যালভেসান আর্মি
ফ্রি কফি এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছে! পীটার বললো, 'চলো, আগে
আমরা ফ্রি কফি খেয়ে আসি, তারপর গাঁজা খাবো।'

কাফে রেস্তোরাঁগুলো ভিড়ে ভরা। জায়গা পাওয়া যায় না। খুঁজে
খুঁজে গেলুম আসল জায়গাগুলোতে, ছোট ছোট দোকান, নড়বড়ে কাঠের
চেয়ার, ছেলেমেয়েরা এক কাপ কফি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছে, মাঝে
মাঝে কেউ কেউ চেঁচিয়ে কবিতা পড়ছে, ছোটোখাটো সাহিত্য পত্রিকা
বিলি হচ্ছে—হাত বদল হচ্ছে, এ ওর মুখ থেকে কাড়াকাড়ি করছে সিগারেট
—অবিকল আমাদের কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের আবহাওয়া। খালি তফাত,
এদের মধ্যে অনেক সুন্দরী বালিকা আছে। আমাদের কলকাতার সুন্দরী
মেয়েদের আর কবিতায় কোনো উৎসাহ নেই, আমি ফিসফিস করে একজনকে
বললুম।

যেখানেই যাই, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন, কৌতূহল, আন্তরিক জিজ্ঞাসা
এখানে—উঁচু সমাজের মতো ধরা বাঁধা নয়। 'আমি আগামী বছর যাচ্ছি

ভারতবর্ষে, তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে', কেউ বললো 'জীবনে যখনই পারি, অন্তত হেঁটেও যাবো ভারতবর্ষে', আরেকজন।

কলকাতায় আমার বীটনিকদের সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম, তাঁর অধিকাংশই ভুল। যারা বীটনিক হিসেবে সেজে আছে তাদের অধিকাংশই বাজে লেখক, শৌখিন, অভিনেতা, প্রচার-কার্তিকেয়। আসল লেখক ও শিল্পীরা লুকিয়ে আছে প্রায় চারদিকে, দারিদ্র্যে ও পীড়নে, প্রাণপণে লড়ছে সামাজিক অসমীচীনতার বিরুদ্ধে, সেন্সরের অপবিচারের বিরুদ্ধে। দেখা হলো, জ্যাক কেরুয়াকের সঙ্গে, নেশায় আচ্ছন্ন ও যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ। গ্রেগরী করসো—শান্তির জন্য উন্মুখ। নিগ্রো কবি লি রয় জোন্স, সাদা কালোর নির্বোধ লড়াই নিয়ে হাসছে। গেলুম আধুনিক শিল্পীদের কাছে, ছোট্ট অন্ধকার ঘরে তিন চার জনে ঠাসাঠাসি করে থাকে, দেয়াল ভর্তি বিশাল বিশাল ক্যানভাস, কবে খ্যাতি আসবে, এমন কি কোনোদিন কোনো একজিবিশানের সুযোগ পাবে কিনা পরোয়া নেই, দুঃসাহসী রং নিয়ে খেলছে, খাদ্য শুধু ভাত, নুন আর সেদ্ধ মাংস।

হলিউডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে একদল। 'আমেরিকার ছবিতে সেক্স আর কস্টিউম ছাড়া আমাদের কিছু নেই ; ছি ছি।' নিজেরা কো-অপারেটিভ করে ফিল্ম তুলছে তারা। নানান রাস্তা, গলি ও সিড়ি পেরিয়ে হঠাৎ কোনো ঘরে ঢুকে, প্রোজেক্টার মেশিন, ছড়ানো ফিল্ম, ফ্ল্যাস লাইট, বাজনা—মনে হয় কোনো অন্য রাজ্যে এলুম। ঐ একই ঘর—স্টুডিও, অফিস, শোবার জায়গা। 'আমরা সাহিত্য, শিল্প এবং ফিল্মকে এক পর্যায়ে আনতে চেষ্টা করছি, কবিরা এখানে কাহিনী শিখছে, শিল্পীরা শিখছে ক্যামেরা, আমরা সবাই চোখ ব্যবহার করছি।'

তুমি যোগ জানো ?—না। তুমি প্রাণায়াম জানো ?- না। তুমি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গেয়ে শোনাবে ?—জানি না। তুমি আমাদের কিছুটা বেদান্ত বোঝাবে ?—না, আমি নিজেই ভালো করে বুঝিনি। অন্য অনেক জায়গায় কিছুটা জোড়াতালি দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমরা খাঁটি লোক, তোমাদের সঙ্গে চালাকি করবো না। আমিও খাঁটি লোক।

কয়েকদিনের মধ্যে আমি সেই সব জ্বলন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক হয়ে

মিশে গেলুম। বাজে, ভ্যাজাল ও চালিয়াৎদের চিনে নিতে দেরি হলো না। 'তুমি কেন হোটেলে আছো, আমাদের সঙ্গে এসে থাকো।' একজন তরুণ কবি বললো আমাকে, তৎক্ষণাৎ হোটেল থেকে স্যুটকেশ নিয়ে গেলুম তার বাড়িতে। ছাদের চিলেকোঠা দুটি, ভাঙা, অন্ধকার, মাথার ওপর অ্যাসবেশ-টাসের ছাউনি। একটা ঘর একটা পত্রিকার অফিস, সে ঘরে দুটি ছেলেমেয়ে শোয়। বাকি ঘরের খাটে দু'জনে শুলো, আমি ও অ্যালেন ও পীটার মাটিতে কম্বল বিছিয়ে। মাঝে মাঝে একটা ভাঙা জানালা দিয়ে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে—তাড়াতাড়ি উঠে সেটায় সোয়েটার কিংবা কম্ফর্টার দিয়ে গর্ত বোজানো হতে লাগলো। 'কি সুনীল, অসুবিধে হবে না তো?' অ্যালেন জিজ্ঞেস করলো।

আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে আমি বললুম, 'কলকাতায় আমার নিজের থাকার বাড়িটাও অবিকল এই রকম।'

ষোলো

ঠিক নটার সময় হাজির হলুম কাফে মেট্রোতে। ওখানে অনেকে কবিতা পড়বে। কাফে মেট্রো অনেকটা আমাদের কলকাতার সুতৃপ্তি বা বসন্ত কবিনেরই মতো, আয়তনে একটু বড়ো। নড়বড়ে চেয়ার টেবিল, মিটমিটে আলো, কফি ছাড়া অন্য কোনো পানীয় পাওয়া যায় না। রাস্তার থেকে সিঁড়ি নেমে নিচু ঘর, যে দিন কবিতা পড়া থাকে সেদিন আগে থেকেই তরুণ কবি বা ভাবী-কবির দল টেবিল দখল করে থাকে। দু'একজন নিরীহ পথচারী—শুধু কফি খাবার জন্যই যে ওখানে ঢুকে পড়ে না তা নয়, কিন্তু সব কবিতা শোনার পর একজনকে আমি দাম না দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখেছি। কাফের মালিক নিশ্চিত খুবই কবিতা অনুরাগী—যেহেতু এসব সহ্য করেন, এবং আর্থিক লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। একটি অল্প বয়সী মেয়ে কফি সার্ভ করে, নিঃশব্দে টেবিলে ঘুরে যায় সে, মুখে কোনো বিকার নেই। একটি কবিতা ঐ মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করেই পড়া হলো বুঝতে

পারলুম—কিন্তু মেয়েটির তবু কোনো হৃদয় দৌর্বল্য ঘটলো বলে মনে হলে
না! একজন চেঁচিয়ে বললো, 'আইরিন, কবিতাটি তোমাকে নিয়েই লেখ
হয়েছে, বুঝতে পারছো ?' মেয়েটি কাপে কফি ঢালতে ঢালতে চোখ না তুলে
বললে, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কবিতাটা ভালো হয় নি।"

আমেরিকায় কাফে রেস্টুরেণ্টে কবিতা পড়ার রেওয়াজ উল্লেখযোগ্যভাবে
শুরু হয় সান্‌ফ্রান্সিসকো শহরে। তারপর অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখ
নিউইয়র্কই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। গ্রীনিচ ভিলেজ—যেটা নিউইয়র্কের কবি
শিল্পিদের পাড়া, অর্থাৎ প্যারিসের যেটা এক কালের মমার্ত, লণ্ডনের কিছুটা
সোহো স্কোয়ার, কলকাতার কলেজ স্ট্রীট—সেখানে অনেক কাফে বা বা
কবিতা পড়া হয় নিয়মিত, জ্যাজ বা মেয়েদের নাচের মতোই—শুধু কবিত
শোনার জন্যই অনেক ভ্রমণার্থী টিকিট কেটে ঢোকে। তবে সে সব জায়গা
কবিতা পড়া হয় অনেকটা ফ্যাসানের সঙ্গে, কিছুটা প্রতিষ্ঠিত বা কিছুটা অ
বাজে কবিরা পড়েন। টাকা পান সে জন্য। একমাত্র কাফে মেট্রোতে
টিকিট কেটে ঢুকতে হয় না, এককাপ কফি নিয়ে চেয়ার দখল করে বসে
পারলেই হলো—ওখানেই সত্যিকারের উৎসাহী তরুণ কবিরা কবিতা পড়েন
একজন মোটামুটি পরিচালনা করে, কোন্ কবি পড়বেন—তার নাম ঘোষ
করে, দু'চার লাইনে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দেয়। একজনের প
শেষ হলে—কিছুটা গুঞ্জন, কথাবার্তা,—তারপরই, কাফের মধ্যে এক
পুরোনো পিয়ানো আছে, তার সবগুলো রীডে চাপ দিলে ঘং করে এক
গম্ভীর শব্দ হয়, সব চুপ, আবার একজনের নাম ঘোষণা হলো। ছেলেদে
সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-কবিদের সংখ্যাও প্রায় সমান সমান। অনাহুত, রবাহু
হয়েও কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি একটা কবিতা পড়বো। সে
সুযোগ পায়। আমাকেও একদিন কবিতা পড়ার জন্য খুব পেড়াপে
করা হয়েছিল। অগত্যা আমি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা পড়েছিলাম
প্রথমে খাঁটি বাংলায়।

কবিতা পড়ার বর্ণনা দিয়ে অবশ্য লাভ নেই। কবিদের ব্যবহার স
দেশেই সমান। কেউ অহংকারী গলায় পড়তে পড়তে 'রাজ্যজয় করছি'-
এই ভঙ্গীতে ঘন ঘন তাকায় মেয়েদের দিকে। কেউ লাজুক গলায় মিনমি

সুরে পড়ে। কেউ ভাব গম্ভীর, উদাত্ত ভঙ্গীতে পড়ে একটা অতি উঁচা· পদ্য। কেউ বা একটা পড়ার নাম করে পাঁচ-ছটা না পড়ে ছাড়ে না। কেউ কেউ 'আমায় কেন আগে পড়তে দেওয়া হলো না'—এই বলে খোনা গলায় খুঁত খুঁত করে। অবিকল বাংলা দেশের মতো। দু'একটা ভালো কবিতা, বাকি অনেক ভ্যাজাল ও ভঙ্গী। কিন্তু এক সন্ধেবেলা—অন্ততঃ একটি ভালো কবিতা শুনতে পাওয়াও কম নয়। এর মধ্যে নিগ্রো কবিরাও আছে। একজন নিগ্রো কবির একটি লাইন মনে আছেঃ আমেরিকা, মাই সুইট মাদার ল্যাণ্ড অব শ্লেভারি।

আসর ভাঙে রাত বারোটা একটায়। গলা ভেজাবার জন্য এক এক দল যায় তখন এক এক বারে, সেখানে হৈ-হুল্লোড়, তর্কাতর্কি, আড্ডা, অশ্লীল গল্পের কম্পিটিশন্—ইত্যাদির পর বাড়ি ফিরতে রাত তিনটে-চারটে। আমার বরাবরই একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছিল। এই সব ছেলে-মেয়েগুলো বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরছে দিনরাত এদের চলে কি করে, এরা টাকা য় কোথায়। ও সব পদ্য-টদ্য লেখার জন্য তো এক পয়সাও পায় না, নি। আমার পাশে একটি মেয়ে বসেছিল, সেদিন সেই মদের দোকানে, মেয়েটি সে সন্ধেবেলা কবিতা পড়েছিল। ভারী সুন্দর দেখতে মেয়েটি, বয়েস ড়ি-চব্বিশ, গায়ের রং কর্কশ লালচে নয়···বরং যেন গৌর, সোনালী চুল। লিণ্ডা। লিণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কোথায় থাকো? আঙ্গুল দিয়ে ওপাশের একটি ছেলেকে দেখিয়ে বললো, আমি পলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকি।

—বিয়ে করেছো?

—না।

এসব প্রশ্ন ইওরোপ-আমেরিকায় করা খুবই অভদ্রতা হয়তো, কিন্তু এসব লেমেয়েরা কোনো রীতিনীতি মানে না। এদের জিজ্ঞেস করা যায়, নি। এদের মধ্যে একজন আমাকে একবার দুম্ করে প্রশ্ন করেছিল, আমি কখনও সুইসাইড করার চেষ্টা করেছি কি না। ছেলেটিকে নিরাশ রে আমি উত্তর দিয়েছিলুম, না।

যাই হোক, আমি লিণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলুম, পল কি কোনো চাকরি-চাকরি করে?

—না, না, ও কবিতা লেখে। চাকরি করলে ওর অস্থবিধে হয়।

—ও, আচ্ছা, তাই নাকি। ঢোঁক গিলে আমাকে বলতে হলো তবুও ওখানে না থেমে মেয়েটিকে আবার জিজ্ঞেস করলুম, কবিতা লেখ সত্ত্বেও, তোমাদের ছ'বেলা কিছু খাবার খেতে হয়, আশা করি। কোথ থেকে পাও। তুমি চাকরি-টাকরি করো?

লিণ্ডা খিল্‌খিল করে হেসে উঠলো। তারপর বললে, না। তবে মাঝে মাঝে কিছু উপার্জন হয়।

—কি করে? আশা করি তুমি কিছু মনে করছো না।

—না, না। খুব শক্ত। আমি মাঝে মাঝে মডেলের কাজ করি। তাতে যা পাই, চলে যায়। আগে আর্টিষ্টদের মডেল হতাম, কিন্তু ওটা ব কষ্টকর, একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকতে খুব বিরক্ত লাগে। তাছাড়া ওর পয়সা কম দেয়। এখন ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে কাজ করি। খুব কম সমত হয়ে যায়, পয়সাও ভালো।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কি সরল মুখ ওর। আর একটা প্রশ্ন বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছে। কিন্তু আর জিজ্ঞেস করতে ভরসা হচ্ছে না। অথচ এদের ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা বা লজ্জা নেই শেষকালে বললুম, তোমার ওসব ফটোগ্রাফ কি কাগজে ছাপা হয়?

—হ্যাঁ, হয়। তবে ফ্যাসান ম্যাগাজিনের ছবি নয়। নতুন পোষাকের ডিজাইন নিয়ে মডেলের ছবি—তা নয় কিন্তু, আমার কোমরটা, এই ছাখ তেমন সরু নয়, সেইজন্য ফ্যাসান ম্যাগাজিনে আমার ছবি তোলে জামা কাপড় সব খুলে—

—তোমার একটুও লজ্জা করে না।

—না! তবে, আমার মা-বাবা যদি দেখতে পান—তবে ওঁদের লজ্জা হবে—তাই আমি মুখের ওপর চুলগুলো ফেলে মুখটা ঢেকে দিই প্রায় অনেক সময় ঐ অবস্থায় আমি কবিতার লাইন ভাবি। কাল একটা লিখেছি···

কবিতার জন্য একি জীবন-মরণ পণ এদের। কিন্তু তবু বড় দুঃখ হ ভেবে, কবিতার জন্য জীবন-মরণ পণ করাও কিছু নয়। আত্মদান করলে

নেকের কবিতা হয় না। অন্ততঃ ঐ পল বলে ছোকরার যে জীবনে এক
ইনও কবিতা হবে না, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

আর একটি ছেলের কাছে জানলুম—সে একটা হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে
াকে। দিনের বেলা সেই হোটেলেই চাকরের কাজ করে! কেউ কেউ
মউজিয়াম বা লাইব্রেরী গুলোয় ক্যাটালগ তৈরীর কাজ করে মাঝে মাঝে।
'একটা আছে বোকা অহংকারী। অশ্লীল নামে একটি পত্রিকা বার করে
একটি ছেলে—সেও কোনো কাজকম্ম করে না। জিজ্ঞেস করলুম, কাগজ
াবার পয়সা পায় কোথা থেকে। ভুরু উল্টে উত্তর দিল, জুটে যায়। সত্যিই
জুটে যায় এদিক সেদিক থেকে। অল্প আয়াসে। তাই কবিতা লেখা বা ছবি
আঁকার নাম করে বাউণ্ডুলে সেজে থাকে কত ছেলেমেয়ে—তাদের মধ্যে ক'জন
সত্যিকারের শিল্পী বাছতে গেলে গ্রীনিচ গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম রাত তিনটেয় আকাশের নিচে। তখনও
দোকানগুলি আলোয় ঝলমল। ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের মিশ্রিত
দুর্বোধ্য শব্দ। শোঁ-শোঁ করে দু'একবার আসে সমুদ্রের বাতাস। পাথরের
মূর্তির মতো এখানে-ওখানে পুলিশ। মনের মধ্যে সামান্য একটা গ্লানির সুতো
যেন টের পাচ্ছি। আজ সন্ধেবেলায় অমন উত্তেজিত কবিতার আসরের পর—
এদের সবার সঙ্গে আমি টাকা পয়সার আলোচনা করতে গেলুম কেন!

একজন কবির সঙ্গে আরেকজন কবি কি নিয়ে কথা বলে? ক্রিয়েটিভ
প্রসেস্ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না, করা যায় না, অসম্ভব। তাও
দু'জনের ভাষা যদি আলাদা হয়। ভাষা ছাড়া কবিতার আর কি আছে?
আর কিছু নেই, নইলে বাংলা ভাষা এমন দাসত্বের শিকল কেন পরিয়েছে
আমার গলায়। তা ছাড়া ওদের কাছ থেকে শেখার কিছুই নেই।
আমারও কিছু নেই ওদের শেখাবার। শুধু কথা আসে জীবন সম্বন্ধে,
জীবনকে টেনে বাঁচিয়ে রাখা শুধু। তোমাদের অনেকেরই কবিতা অতি
অখাদ্য, একেবারেই ভালো লাগেনি আমার—তবু কফির দোকানে ঐ কবিতা
পাঠ উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা, গৌরব ও লাজুকতা, সারা সন্ধে ও রাত্রি কবিতার
কথায় ভরে রইলো, 'শিল্পের জন্য ইহজীবনে' কিছু আত্মত্যাগ' করেছো
তোমরা, সেজন্য, তোমাদের মনে হলো এক পরিবারের লোক।

সতের

মিসেস টেলারের বয়স শুনলুম সাতান্ন, কিন্তু দেখলে মনে হয় অনেক অনেক কম। শান্ত, শীতলশ্রী, মুখের মধ্যে যেন জননীর ছায়া আছে। কথা বলেন খুব আস্তে আস্তে। বিশাল ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী, কিন্তু এক স তিনি কবিতা লিখতেন। বললেন, হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথকে আমার মনে আছে এখনো যেন স্পষ্ট দেখতে পাই তাঁর সেই অসাধারণ রূপবান মূর্তি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনার তখন বয়স নিশ্চয়ই খুব কম ছিল!

—হ্যাঁ, আমি তখন কচি খুকী প্রায়। নিউ ইয়রকের একটা হোটেলে দাসীর কাজ করি—

আমার ভুরু দুটি তখন জিজ্ঞাসায় দ্বিতীয় ব্রাকেট হয়েছে দেখে হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমি তখন একা হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ করতুম, সপ্তাহে দশ ডলার মাইনে। তখনও ডনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

মিসেস টেলারের শিল্পপতি স্বামী পাশে বসেছিলেন, মৃদু হাসলেন, বললেন, জুডি, তখন তোমার চুলের রং কালো কুচকুচে ছিল!

মিসেস টেলার হাসতে হাসতে বললেন, এখন সোনালি! কিন্তু তু তো সোনালি রং-ই পছন্দ করো। হ্যাঁ, তারপর একদিন বিকেল বেলা আমার বন্ধু গটফ্রিড (সে ছিল সত্যিকারের ভালো কবি, আহা বেচারা অল্প বয়সে অ্যাকসিডেনটে মারা যায়)। হটাৎ বিকেলবেলা টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করলো, আমি একজন ইনডিয়ান কবির বক্তৃতা শুনতে যাবো কিনা আমি প্রথমটা খুব অবাক হয়েছিলুম, কারণ জানো তো, ইনডিয়ান শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে, এখানকার আদি অধিবাসী রেড ইনডিয়ানদের কথা! রেড ইনডিয়ানরা আবার কবিতা লেখে, তাও আমি শুনতে পাবো নিউইয়রকে বসে। গটফ্রিডের যত পাগলামি! একটু পরে সব বুঝতে পারলুম। গটফ্রিড যোগ ব্যায়াম করতো, হিন্দু বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কে কৌতূহল ছিল, ও অনেক খবর রাখতো! ওর মুখে আমি প্রথম টেগোরের নাম

শুনলুম তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এবং শুধু কবি নয়, মানুষ হিসাবেও তিনি মহাপুরুষ।

আমার তখন একটিই ভদ্রগোছের গাউন ছিল, সেদিন একটু আগে কেচে দিয়েছি। এখানকার খুকীদের মতো তখন আমরা ট্রাউজারস পরে পথে বেরুতে পারতুম না। তাড়াতাড়ি ইস্ত্রি ঘষে সেই ভিজে পোষাকটাই কোনো রকমে শুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম গটফ্রিডের সঙ্গে। ব্রডওয়ে অঞ্চলের একটা থিয়েটার, আমার নাম ঠিক মনে নেই। অসংখ্য লোক এসেছিল। তার আগে আমি কোনো ভারতীয়কে দেখিনি। পথেঘাটে দেখেছি হয়তো কিন্তু আলাদাভাবে চিনতুন না, সমস্ত এশিয়াবাসীদের আমার মনে হতো এক রকম। দেখলুম মঞ্চের ওপর কবি একটি চেয়ারে বসে আছেন। এমন রূপবান মানুষ আমি আগে আর দেখিনি—ওরকম জ্যোতির্ময় পুরুষ, পুরুষ মানুষ যে এতো সুন্দর হয় (স্বামীর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী)। আমি কল্পনাই করিনি। সাদা চুল, বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি, একটা লম্বা স্লিপিং গাউনের মতো পোশাক পরে ছিলেন, সে রকম একজন মানুষকে দেখা এক জীবনের অভিজ্ঞতা। উনি প্রথমে একটি বক্তৃতা দিলেন, তারপর অনেকগুলি কবিতা পড়লেন, দীর্ঘ সুরেলা গলা, যেন গীর্জায় একক সঙ্গীতের মতো। কথাগুলি আমার মনে নেই, কিন্তু সেই উদাসীন মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর আমার কানে আজও ভাসছে। সত্যি, বড় দুঃখের কথা, উনি কী কবিতা পড়েছিলেন আমার একেবারেই মনে নেই—কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শেষ পর্যন্ত বসে ছিলুম। শেষ হবার পর বেরিয়ে এলুম কী যেন এক অনির্বচনীয় দুঃখ বুকে নিয়ে।

উনি যখন থিয়েটার থেকে বেরুচ্ছেন—হঠাৎ একদল মানুষকে দেখলুম ওঁর দিকে ছুটে যেতে। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—হঠাৎ কী কোনো কারণে লোক ওঁকে আক্রমণ করতে চাইছে? তখুনি জানতে পারলুম, আসলে তা নয়, উপস্থিত ভারতীয়রা ছুটে যাচ্ছেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। কী বিচিত্র প্রথা; সবাই তার সামনে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আমি গটফ্রিডকে জিজ্ঞেস করলুম। গটফ্রিড বললো, ভারতীয়রা কারুকে শ্রদ্ধা

জানাবার জন্য তাঁর পায়ের ধুলো নেয়। এরকম কথা আমি জীবনে কখনো শুনিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হলো, ওরকম মানুষকে শ্রদ্ধা জানাবার এইটাই তো শ্রেষ্ঠ উপায়।

মিসেস টেলার আমার দিকে তাকিয়ে লাজুকভাবে হেসে বললেন, তখন আমিও ওঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালুম।

আঠারো

'কাল সকালে মরুভূমি দেখতে যাবে?' ভাবছিলুম কার সঙ্গে যাবো। আরিজোনায় এসে ক্যাকটাসের মরুভূমি না দেখার কোনো মানে হয় না। অথচ গাড়ি ছাড়া যাবার উপায় নেই। এমন সময়ে কানের কাছে দৈববাণীর মতো ড্রুমণ্ডের প্রশ্ন।

ড্রুমণ্ড হাডলি একজন তরুণ কবি, আমার চেয়ে বছর দু'একের ছোটো হবে হয়তো (আমি এই জুলাই-এ উনত্রিশ)। পাঁচ বছর আগে বিয়ের পর ড্রুমণ্ড হানিমুন করতে গিয়েছিল কম্বোডিয়া ও ভারতবর্ষে। রথের মেলার সময় পুরীতে গিয়েছিল আসল সমুদ্র নয়, জনসমুদ্র দেখতে। 'তবে এমন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলুম যে, ভ্রমণের অর্দ্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে গিয়েছিল'—ও বললো। বললুম, 'ছাখো, আমাদের সরকারী হিসেবে ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষ থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে, ওটা বোধ হয়—'

—কম্বোডিয়া থেকে হয়েছিল, আমারও তাই মনে হয়।

—ভাগ্যিস তুমি বললে, তোমরা বললে দোষ নেই। আমি বললেই অন্য দেশের নিন্দে হয়ে যেতো। একেই তো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব নেই বললেই চলে।

বাড়িতে বাঘ পুষেছে ড্রুমণ্ড। সত্যিকারের বাঘের বাচ্চা, মরুভূমি থেকে ধরা। ওর স্ত্রী, ভারী লক্ষ্মী শ্রীমতী মেয়েটি, পরীক্ষার জন্য খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করছিল, আমি যেতেই শিষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল, পাশ থেকে ঘর্-র্র্-র করে উঠলো বাঘের বাচ্চা। 'ভয় পেয়ো না, আমাদের বেড়ালটা কারুকে

কিছু বলে না।' চারটে কাবুলি বেড়াল সাইজের ঐ আট মাসের বাঘের বাচ্চাটা—দেখেই আমার হাড় হিম। একটা বড়ো ঘরে আলাদা করে রেখেছে ওটাকে—ওরা দু'জনে বেড়ালের মতোই ওটার সঙ্গে খেলা করে। ব্যাপারটা গোপন, পুলিসে জানতে পারলে ধরে নিয়ে যাবে। আমি এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে সেই গল্পটা বললুম, সেই যে কোন্ এক ভদ্রলোক বাঘ পুষেছিলেন, তারপর বাঘ সেই লোকটার হাঁটু চাটতে চাটতে হঠাৎ রক্তের স্বাদ পেয়ে ঘাঁক করে কামড়ে দেয়। ওরা দু'জন হেসে বললো, 'একজন লোক ফেল করেছে বলে আমরা পারবো না, তার কি মানে আছে। মানুষ অ্যাটমকে পোষ মানাচ্ছে—বাঘ তো দূরের কথা। তুমি কাছে এসে ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখো, কিছু বলবে না।'

আমি বললুম, না ভাই থাক, দূর থেকেই দেখছি। এমনিতেই আমার শরীরে আঠেরো ঘা আছে।'

সকাল নটা আন্দাজ ড্রুমণ্ডের ভ্যান নিয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়লুম। অ্যারিজোনার টুসন্ শহরের একেবারে গা থেকেই মরুভূমি আরম্ভ। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো পাহাড়—তা ওপাশে মেক্সিকোর সীমানা।

—মরুভূমি সম্বন্ধে যা ভাবছো তা নয়, ড্রুমণ্ড বললো, অন্যরকম, দেখো, তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু একটা কথা, মরুভূমি দেখে কবিত্ব করা চলবে না। বিশেষত এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড আবৃত্তি করা একেবারেই নিষেধ। আমি অনেক শুনেছি।

—সুন্দর দৃশ্য দেখলে আমরা মনে মোটেই কবিত্ব জাগে না। আমার খিদে পায়।

—কি ?

—মাইরি বলছি, আমার খিদে পায়। অর্থাৎ আমার হৃদয় কাজ করে না, তার একটু নিচে, পেটে প্রতিক্রিয়া হয় আমার।

ও হেসে বললো, 'ভয় নেই, আমার বউ কয়েকটা হ্যামবার্গার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

বিষম জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমি দু'পাশের দৃশ্য দেখার বদলে ড্রুমণ্ডকে দেখছিলুম। একটা ব্লু জিন আর গেঞ্জি পরেছে, মাথার চুল এলোমেলো। সুঠাম স্বাস্থ্য ও সাহস, বাড়িতে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও বাগান, বাঘ পুষেছে—এই একজন আমেরিকার তরুণ কবি। ভারী চমৎকার খোলামেলা ছেলে ড্রুমণ্ড, কিন্তু একটা দোষ : যখন খুব উৎসাহে কথা বলে, তখন খাঁটি ওয়েস্টার্ন অ্যাকসেন্ট বেরিয়ে পড়ে—আমার পক্ষে বোঝা দুষ্কর হয়। ও বললো, 'এখানে খুব জলের অভাব'। তারপরই গড়গড় করে কি শুরু করলো—আমি কিস্যু বুঝতে পারলুম না তবুও সেনটেন্সের মধ্যে কমা, ফুলস্টপ বসাবার মতো মাঝে মাঝে হুঁ হ্যাঁ, 'ত তাই নাকি' করে যেতে লাগলুম। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কি করো?'

আমি একেবারে গভীর জলে পড়লুম। যদিও বুঝতে পারলুম, ব্যাপারট জল সম্বন্ধেই। টস্টিমেশন, ড্রিলিং এই শব্দ শুনেছি বটে। আমতা আমত করে বললুম, 'আমি ঠিক—

—ঠিক কোন্ জায়গা খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে কি করে বুঝতে পারো?

বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিক ও বিষয়ে জানি না। আমি জন্মেছি পূর্ববঙ্গে, সেখানে জল থাকাটাই একটা সমস্যা, না-থাকা নয়। রাজস্থানে দিকে ও সমস্যা আছে বটে—কিন্তু ওরা কি করে আমি 'জানি না।' একটু থেমে আবার বললুম, 'একটা কথা বলব? তোমাদের দেশের অনেক কবি সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—তাঁরা কবিতা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় জানে স্পেসশীপের কোথায় কোথায় শূন্য স্টেশন হওয়া দরকার, হায়ারোগ্লিফিকসে পাঠান্তর, নদীর তলায় সুড়ঙ্গ বানাবার কি কি সমস্যা, বাঁদরের মস্তিষ্ক টেস্ট টিউবে আলাদা বাঁচিয়ে রাখার পর সেই অশরীরী মস্তিষ্কের দুঃখ ও আনন্দ বোধ থাকে কি না, ইন্দোনেশিয়ার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা—এই সব আমাদের দেশের কবিরা একটু ন্যালা ক্ষ্যাপা টাইপ, জেনারেল নলেজে শূন্য ধুতি পাঞ্জাবীতে জেবড়ে থাকে, এক চেয়ারে বসলে ঘণ্টা পাঁচেকের কমে উঠতে চায় না, কবিতা ছাড়া আর কোনো বিষয়েই কিছু জানে না—হয়তো সেই জন্যই তোমাদের চেয়ে ভালো কবিতা লেখে।'

আমার শেষ কথা শুনে ও চমকে আমার দিকে তাকালো। তারপরই

ঝকঝক করে হেসে উঠলো। বললো, 'কি জানি, হয়তো সত্যি। আমি বেশী পড়িনি—বিশেষ করে তোমাদের ঐ হরিবল্ ট্রানস্লেশনে টেগোরের লেখাও আমার মোটেই ভালো লাগেনি। কিন্তু তোমাদের একটা অসুবিধে আছে—যেটা আমাদের নেই। তোমাদের কাঁধের ওপর চেপে আছে তোমাদের ঐতিহ্য, তোমাদের ধর্ম। তোমরা নির্জন হতে পারো না। কিন্তু আমাদের ওসব ঝামেলা নেই—আমরা সবাই গভীর অন্ধকারের মধ্যে হাঁটছি, সুতরাং আমাদের প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে খুঁজতে হচ্ছে—আমরা নির্জন আধুনিক মানুষ—সকলেই।'

—কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি তোমাদেরও লোভ কম নয়। তোমরা—

—ছাখো, ছাখো, ঐদিকে ছাখো।

আকাশে একটা বড়ো সাইজের পাখি দেখতে পেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'ওটা কি?'

—গোল্ডেন ঈগ্ল!

বিশাল ডানাওয়ালা সোনালী ঈগ্ল এই অঞ্চলে এখন দেখতে পাওয়া যায় শুনেছিলুম, আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু 'গোল্ডেন ঈগ্ল' এ নামটা খুব চেনা, কলকাতায় বহু গ্রীষ্মের দুপুরবেলা ও নামে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে।

তাড়াতাড়ি একটা জোরালো দূরবীন বার করে ড্রমণ্ড ছুটলো ঐ পাখিটার পিছনে গাড়ি নিয়ে। এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী রাস্তায় কি দুঃসাহসিক গাড়ি চালানো—এক হাতে স্টিয়ারিং, এক হাতে দূরবীন নিয়ে বাইরে ঝুঁকে—চোখ রাস্তায় নয়, আকাশে। কিন্তু অমন দুঃসাহসীর পাশে বসেছিলাম বলে আমারও ভয় করলো না। কি ভয়ংকর গতি ঐ ঈগ্লের—ঘুরতে ঘুরতে প্রায় মহাশূন্যে বিন্দুর মতো হয়ে গেল হঠাৎ আবার ঝুপ করে নেমে এলো খুব নিচে—শোঁ শোঁ করে আবার পেরিয়ে গেল পাহাড়ের পর পাহাড়, মিলিয়ে গেল দিগন্তে কয়েক মিনিটে। আমরা গাড়ি নিয়েও ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলুম না।'

ড্রমণ্ড বললো, ঐ 'ঈগ্ল আমেরিকার প্রতীক চিহ্ন।'

গাড়ি উঠে এসেছিল একটা ছোটো পাহাড়ের মাথায়। ডানদিকে তাকিয়ে

বিশাল মরুভূমি চোখে পড়লো। সত্যিই, আমাদের কল্পনায় যে মরুভূমির ছবি আছে—অর্থাৎ মাইলের পর মাইল হলুদ বালি, গনগনে হাওয়া—এ মরুভূমি সে রকম নয়। এ মরুভূমি জীবন্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সারা ভূমি জুড়ে অসংখ্য সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো ক্যাকটাস, পশ্চিম অঞ্চলের বিখ্যাত ক্যাকটাস, সরল, দীর্ঘ প্রত্যেকটা অন্তত দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো। প্রথম শাখা বেরোয় পঁচাত্তর বছরে—ঐ শাখা বা ডানা গুনে বয়েস বোঝা যায়। ওগুলোকে বলে সাউয়ারো (স্প্যানিশ নাম: Saguaro জি উচ্চারণ হয় না)—গ্রীষ্মকালে ফুল ফুটতে থাকে—বীভৎসতার বদলে এ মরুভূমিকে মনোরমই দেখায়। মরুভূমি নয় পুরোটাই যেন এক মরুদ্যান। এ ছাড়া আছে অন্য নানা জাতের ক্যাকটাস, প্রিক্‌লি পিয়ার——বুনো শেয়াল, কাঁকড়া বিছে, ছোটো বাঘ, র‍্যাটেল স্নেক (ল্যাজে যে-গুলোর খট্‌খট্ আওয়াজ হয়), হরিণ। জল নেই, ফসল হয় না—কিন্তু মরুভূমির বদলে পোড়ো জমি কথাটাই মনে আসে। কিন্তু ড্রুমণ্ড আগেই এলিয়টের ওয়েস্টল্যাণ্ডের উল্লেখ করতে বারণ করেছে।

এই মরুভূমির দৃশ্য আমাদের অদেখা নয়। আমেরিকার যাবতীয় ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখেছি, ঘোড়া ছুটোচ্ছে কাউবয়রা, কথায় কথায় গোলাগুলি খুনোখুনি—এখানকার রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলে এখন মিউজিয়মে পুরেছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। এখানে রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে, তারপর স্প্যানিশদের সঙ্গে, তারপর সিভিল ওয়ারে। মরুভূমি মাত্রই রক্ত লোভী, আরবের মরুভূমিও কম রক্ত শোষেনি।

ড্রুমণ্ড জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগছে?'

বললুম, 'ভাই ড্রুমণ্ড, যদি সত্যি কথা বলতে হয়—এ সব-দৃশ্যই আমি আগে ছবিতে দেখেছি। এ দেখার চেয়ে, ছবিতে বেশী সুন্দর লেগেছিল।'

—যাঃ, তা হয় নাকি?

—তোমাকে ঠিক যুক্তি দেখাতে পারবো না! এ জায়গাটা বড় বেশী বিশাল আমার পক্ষে, আমি ছোটো করে, ফ্রেমের মধ্যে না দেখতে পেলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।

—দুঃখের বিষয়. আমি ক্যামেরা আনিনি। আরেকদিন পাহাড়ের

ওদিকে গুহা দেখতে যাবো, তখন। (পরে একদিন সেখানে অসিত রায় ও সুবোধ সেনের সঙ্গে গিয়েছিলাম)।

ছেলেমানুষের মতো ড্রুমণ্ড বললো, 'জানো এখানে হরিণ আছে? হয়তো এই মুহূর্তে দশটা হরিণ দশ দিক থেকে আমাদের দেখছে? আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

আমাদের মোটামুটি গন্তব্য ছিল ডেজার্ট মিউজিয়ম—মরুভূমির ঠিক মধ্যে আসল পরিবেশে মরুভূমিতে যা কিছু পাওয়া যায়—তার প্রদর্শনী। ড্রুমণ্ড জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কিছু মনে করবে, যদি আমরা একটু ঘুরে যাই? ঐ ডানদিকের টিলাটা আমার দেখা হয়নি।'

আমি বললুম, 'না-না আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে ওটা দেখা হয়নি মানে? তুমি কি মরুভূমির সব জায়গা জানো নাকি?

—প্রায়, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসি, এবং নানান্ জায়গা দেখি।

—কেন?

প্রথমে ও কারণটা বলতে চাইলো না। লাজুক হেসে আমতা আমতা করতে লাগলো। মুগ্ধ হবার জন্য মরুভূমিতে প্রতি সপ্তাহে আসার মতো এ রকম খেলো কবিত্ব ও করবে বলে আমার বিশ্বাস হলো না। পরে কারণটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে হয়ে গেলুম।

ড্রুমণ্ড মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে আসে।

এই খোঁজা নতুন নয়। সোনার লোভেই সাদা চামড়ার লোকেরা আসে পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, তারপর একদিন দেখতে পায় প্রশান্ত মহাসাগর। সোনার লোভে কত হত্যাকাণ্ড করেছে নিজেদের মধ্যে। ভুলে গেছে মানুষের জীবন সোনার চেয়েও দামী। এতকাল সোনার লোভে এক পাল লোক মরেছে—সাদা হাড় ও কঙ্কালের স্তূপের মধ্যে ঝিক্‌ঝিক্ করেছে দু'একটা সোনার দাঁত। কিন্তু এখনো সোনার লোভে কেউ আসে জানতুম না, শেষে কি একটা পাগলের পাল্লায় পড়লুম! কিন্তু ড্রুমণ্ডের অমন সরল সুন্দর মুখে কোনো স্বর্ণলোভ দেখলুম না। সোনা নয়, সোনা খুঁজছে—এইটাই যেন বড় ব্যাপার। র‍্যাঁবোর কবিতার মতো: যখন আমি ফিরবো, আমি সোনা নিয়ে আসবো।

—তোমার সত্যিই ধারণা এখানে সোনা পাওয়া যায় ?

—নিশ্চয়ই ! কত লোক ছুটির দিনে আসে সোনা তৈরি করতে। কিন্তু তারা সারাদিনে যতটুকু সোনা পায় বালি ছেঁকে—তাতে দিনের মজুরি পোষায় না। আমি খুঁজছি এমন একটা জায়গা—যেখানে অফুরন্ত সোনা। নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি চললো পাহাড়ী পথে। ড্রুমণ্ডের গাড়িটাও ওরই মতো ডাকাবুকো। কড়কড়, মড়মড় শব্দ হতে লাগলো, ডানদিকে বাঁদিকে বিষম হেলে পড়তে লাগলো, তবু চললো ঠিকই। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় থামল। আর রাস্তা নেই। আমরা নেমে হাঁটতে লাগলুম 'সাবধানে হেঁটো সুনীল, র‍্যাটেল স্নেক আছে খুব ! অবশ্য ভয় নেই— কামড়ালে মানুষ চট্ করে মরে না !' খুব একটা ভরসা পেলাম না যদিও ও কথা শুনে।

একটা ছোটো টিলা পেরতেই দূরে একটা বাড়ি চোখে পড়লো।

— এখানে এই বিশ্রী মরুভূমিতে কে বাড়ি করেছে ?

—জানি না, আমি আগে দেখিনি। তবে ভেবো না কোনো সাধু সন্ন্যাসী, তোমাদের ইণ্ডিয়ার মতো—নিশ্চই কেউ সোনার লোভে এসেছে।

বাড়ির সীমানায় বহুদূর থেকে কাঁটা-তারের বেড়া। কোথাও কারুর কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমরা দরজা ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকলুম হলিউডের সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো—আমি প্রতি মুহূর্তে বন্দুকের গুলি আশা করছিলুম। কাছে এসে অবাক হয়ে গেলুম। বাড়িটা নতুন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ! যেন কোনো অতিকায় দানব এসে মহা ক্রোধে ওটাকে ধ্বংস করেছে। কোনো ঘরের ছাদ নেই, দেওয়ালে বড়ো বড়ো ফুটো (বন্দুকের কিনা কে জানে !)—আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরে তছনছ করা প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে কেউ ভেঙ্গেছে। নতুন রেফ্রিজারেটার—কিন্তু হাতুড়ি মেরে ভাঙ্গা হয়েছে বোঝা যায়, গ্যাসস্টোভের শুধু পাইপগুলো ভেঙে বিকল করা হয়েছে--নতুন কাঠের চেয়ার অথচ ভাঙা, সোফা কুশন ছুরি দিয়ে ফাঁসানো।

আমি ড্রুমণ্ডের মুখের দিকে তাকালুম। ও বললো, 'কি জানি, হয়তো

ঝড়ে ভেঙেছে—মাঝে মাঝে এখানে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। এখানে বাড়ি বানানোই বোকামি।'

আমি বললুম, 'না, ঝড় অসম্ভব। মানুষের কাজ।'

—হতে পারে, একদল গ্যাংস্টার এসে লুটপাট করেছে। কেউ হয়তো এখানে ছুটি কাটবার জন্য বাড়ি বানিয়েছিল। হয়তো কেউ থাকত না এখানে।

ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিক কানেক্শন পর্যন্ত ছিল, তারগুলো দেয়াল থেকে ছেঁড়া, মেশিনটা তোবড়ানো। দেয়ালে কুৎসিৎ ছবি—তাই দেখে প্রাক্তন বাসিন্দাদের রুচির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। সবই ন্যাংটো মেয়েমানুষ, কয়েকটা খড়ি দিয়ে আঁকা, একটি স্ত্রীলোকের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্ল্যাং ভাষায় নাম লেখা, যেন কারুকে শেখানো হয়েছে।

—গুণ্ডারা এ সব জিনিসপত্র ভেঙেছে কেন—নিয়ে যেতে তো পারত?

—মরুভূমিতে এসব জিনিসের লোভে কে আসে, সবাই আসে সোনার লোভে। ড্রুমণ্ড বিষম উৎসাহ পেয়ে গেল ব্যাপারটাতে—শখের গোয়েন্দার মতো খুঁটিনাটি দেখতে লাগলো। এক একটা জিনিস পায়—আর আমাকে ডেকে ডেকে দেখায়—আধপোড়া পিয়ানো, এক বাক্স ছেঁড়া জামা কাপড় এই সব। মরুভূমি দেখতে এসে কি এক রহস্যময় বাড়িতে এসে হাজির হলুম। হঠাৎ খানিকটা দূর থেকে ড্রুমণ্ড আমাকে ডাকলো। কাছে গিয়ে দেখলুম, ড্রুমণ্ড মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসেছে। ওর সামনে একটা ছোট্ট কবর। একটা কাঠের ক্রুশে ছোট্ট একটা পতাকা—তাতে লেখা, 'এই ভয়ঙ্কর মরুভূমি আমাদের সাধের খোকনকে খুন করেছে। শ্রীমান ফ্রেডেরিক, (বয়স আট) ঈশ্বর তোমাকে আশ্রয় দেবেন।' তারিখ খুব টাটকা, মাত্র একুশ দিন আগের।

ড্রুমণ্ড গম্ভীরভাবে বললো, 'চলো, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। এখানে কোনো রহস্য আছে—শেষে আমরা পুলিস কেসে জড়িয়ে পড়ব।'

ঐ রহস্যময় বাড়ী পেরিয়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আমরা অন্যদিকে নেমে গেলুম। বিশাল ক্যাক্টাসগুলো একটু আগেও যেন নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল, আমাদের দেখে থেমে গেল। বিষম গরমে কান

ঝাঁঝাঁ করছে। একটা নদী খাতের মতো জায়গা দেখলুম, মাঝে মাঝে বাঁধানো ঘাটের মতো, এক বিন্দু জল নেই। প্রাগৈতিহাসিক কালে হয়তো সেখানে নদী ছিল।

আমিই প্রথম সোনা আবিষ্কার করলুম। আমি আস্তে আস্তে হাঁটছিলুম মাঝে মাঝে বসছিলুম ক্যাকটাসের ছায়ায়, কাঁটা বাঁচিয়ে—ড্রুমণ্ড ছট্‌পুজো মানতকরা মেয়েমানুষদের মতো মাঝে মাঝেই শুয়ে পড়ছিল মাটিতে—কোথাও গন্ধ শুকছে, কোথাও মাটিতে কানপেতে কি শুনছে এবং মাঝে মাঝে ওর সেই ইমোশনাল ইংরেজীতে (দুর্বোধ্য) কি সব বলছে। এমন সময় আমি বেশ একটা গোল, নধর, পাউডার পাফ (ফরাসীরা বলে শ্বাশুড়ীর মাথা) ক্যাকটাসের তলায় দিব্যি একতাল সোনা দেখতে পেলুম রোদের আলো পড়ে ঝলসে দিচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল—ড্রুমণ্ড নিশ্চই আমাকে অর্ধেক শেয়ার দেবে, তা হলে, ওটার দাম কত কে জানে—দেশে ফিরে অন্ততঃ বছর পাঁচেক কোনো চাকরি করতে হবে না! আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ড্রুমণ্ড ঐ দেখো!'

বিষম চমকে ও মুখ ফেরালে তারপর আমার আঙুল সোজা লক্ষ্য করে সোনার তালটা দেখতে পেয়ে ও তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, 'ওঃ তাই বলো! তুমি এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলে—আমি ভাবলুম সাপ না বাঘ! আমি আমার বন্দুকটা আনিনি!

—ও কি তবে?

—সোনা!

কাছে গিয়ে ড্রুমণ্ড ওই জিনিসটাকে এক লাথি মেরে বললো, বাস্টার্ড! এই জিনিসগুলো কম ঝামেলা করে? এর নাম কি জানো—'বোকার সোনা, ফুল্'স গোল্ড। যা কিছু চক্‌চক্ করে তাই সোনা নয়। বছর দশেক আগেও এ জিনিস আবিষ্কার করে কত লোক নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার সেই সরল হাসি হেসে বললো, 'ভাগ্যিস তুমি ওটা দেখতে পাবার পরই পেছন থেকে আমাকে ছুরি মারোনি!'

বস্তুত, ব্যাপারটা এমন মেলোড্রামাটিক হলো যে তারপর থেকে আমার বিষম বিশ্রী লাগতে লাগল। মরুভূমি দেখার সম্পূর্ণ ইচ্ছে চলে গেল আর আমার। ওটা দেখতে পাবার পর মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে যে ছম্‌ছম্‌ শব্দ হওয়া শুরু করেছিল—তা আর থামলো না। বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। ড্রুমণ্ডকে স্বর্ণ-লোভী ভেবে মনে মনে একটু ক্ষীণ অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলুম—কিন্তু তখন, তারপর থেকে কোথা থেকে এক গভীর নিরাশা আমার বুকে ভরে দিলে! যেন কেউ সেই মুহূর্তে কেড়ে নিল আমার পাঁচ বছর চাকরি না করার ছুটি, যেন পাঁচ বছর চাকরি করার পরিশ্রম একসঙ্গে সেই মুহূর্তে আমার কাঁধে চেপে বসলো।

আমরা ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। ড্রুমণ্ডের বউ-এর বানিয়ে দেওয়া হ্যামবার্গার আর স্যাণ্ডউইচ খেলাম। গাড়ির পিছনদিকটা খুলে ড্রুমণ্ড কি যেন খেতে লাগলো চোঁ-চোঁ শব্দে—মনে হলো যেন পেট্রল খাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলুম ওখানে আলাদা একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে। ঘন ঘন মরুভূমিতে আসার জন্য পাকা ব্যবস্থা।

'ডানদিকেও ঐ অঞ্চলটা একটু দেখেই আমরা যাবো মিউজিয়ামে। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

—না, আমি এখানে বসছি। তুমি ঘুরে এসো।

—আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে।

একটু দূরে যাবার পর আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ড্রুমণ্ড, সাবধানে ঘুরো। হারিয়ে যেও না—কিংবা মরে যেও না। কারণ, আমি পথও চিনি না, গাড়িও চালাতে জানি না।'

একটু পরেই ড্রুমণ্ড মিলিয়ে গেল দূরে। আমি একা গাড়ির ছায়ায় বসলুম। চারিদিক এমন নিঃশব্দ যে ভয় করতে লাগলো! হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, একটা শুকনো পাতারও শব্দ নেই। দূরে সেই পোড়ো বাড়িটা! আমি ওটার থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে বসলুম। দু'মানুষ-তিনমানুষ লম্বা ক্যাকটাসের সারি চলে গেছে মাইলের পর মাইল—সান্টা ক্যাটালিনা পাহাড় পর্যন্ত। নিস্তব্ধতা যেন জীবন্ত হয়ে ঘুরছে সেই মরুভূমিতে। আমার হাতঘড়ি নেই, সময় জানি না। একমাত্র শব্দ শুনছি

নিজের হৃৎপিণ্ডের—তখনও প্রবলভাবে দুম্‌দুম্‌ করছে। ক্রমশঃ দুর্বলতা বোধ এনে দিচ্ছে। মরুভূমিতে এতকাল যে অসংখ্য মানুষ মরেছে—তাদের সবার জন্য অসম্ভব দুঃখ বোধ করতে লাগলুম। ওপরের দিকে তাকান যায় না, আকাশ এত গরম। অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত মনে হতে লাগলো অসম্ভব লম্বা। এর থেকে ঘুমিয়ে পড়া ভালো আমার মনে হলো। গাড়ির মধ্যে ঢুকে লম্বা সীটে শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে আমি একটা জলে ডোবা মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলাম সেদিন।

উনিশ

নিউইয়র্কের হার্লেম পাড়ায় এক বাড়ির রকে বসে তিনটি নিগ্রো ছোকর আড্ডা দিচ্ছিল। বাড়ির মালিক একজন সাদা লোক। সে বললো ছোড় তিনটেকে উঠে যেতে—ঝাঁটফাঁট দেবে, ফুলগাছে জল দেবে—এই অজুহাতে কিন্তু রকবাজ ছেলেরা কবে আর সুবোধ বালকের মতো উঠে যেতে শিখেছে সুতরাং তারা ঠাট্টা মস্করা করতে লাগলো বাড়িওলার সঙ্গে। রেগেমেগে বাড়িওলা ষ্টিরাপ পাম্পে জল ছিটিয়ে দিলে ওদের গায়ে। ছেলেরাও ছাড়বে কেন—উল্টে পাল্টে ইট পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো। পাশের এব রেডিওর দোকান থেকে বেরিয়ে এলো এক পুলিশ সার্জেন্ট, সাদা। সার্জেন সাহেবের তখন অফডিউটি, তবু উৎপাত দেখে কর্তব্যপরায়ণতা জেগে উঠলো কোমর থেকে রিভলবার খুলে পরপর তিনটে গুলিতে পাওয়েল নামের একটি ছোকরাকে খুন করে ফেললো। শুরু হয়ে গেল নিউইয়র্কের দাঙ্গা।

পুলিশ পক্ষ বলছে, ছেলেটা ছুরি নিয়ে সার্জেন্টকে তেড়ে এসেছিল প্রাণ বাঁচাবার জন্য সার্জেন্ট গুলি করেছে। নিগ্রোরা বলছে, মিথ্যে কথ ছেলেটির হাতে ছুরি ছিল না, উপরন্তু, পুলিশটি নাকি গুলি করার পর ছেলেটার গায় লাথি মেরে বলেছে, ডার্টি নিগার। সাদা পুলিশ মাত্র বন্দুক-খুসি, সুযোগ পেলেই নিগ্রোদের ওপর হাতের সুখ করে নেয়।—কোনটি সত্যি কে জানে, তবে এ কথা বোঝা যাচ্ছে না—চোদ্দ বছরের একটা ছেলে

ছুরি নিয়ে তেড়ে এলেও—তার হাতে বা পায়ে গুলি করেও তো তাকে থামানো যেত—তিন তিনটে গুলি খরচ করা ঐ সামান্য কারণে !

আমি সেদিন ওয়ার্লড ফেয়ার দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে বসে এর কিছুই টের পাই নি। সেখানে রং ও রূপের সমভিব্যাহার, যেন মায়াপুরী, মল রং-এর পোশাক পরে ছেলে মেয়ে, বিশেষত মেয়েরা ঘুরছে। মনে পৃথিবীতে কোথাও কোনো দাঙ্গা নেই, যুদ্ধ নেই, বিভেদ নেই! বিরাট ন্তর জুড়ে সারা বিশ্বের মেলা বসেছে। ভারী চমৎকার জায়গা—স্বর্গ বোধহয় এই ধরনেরই অনেকটা! এক একটা প্যাভেলিয়ন-এ যাচ্ছি, ন সেই দেশ ঘুরে আসছি। পাকিস্থানের প্যাভেলিয়নে মোরগ মোশল্লাম য়েই চলে গেলুম মেক্সিকোর নাচ দেখতে, সেখান থেকে সুইডেনের ছবি, গাণ্ডিনাভিয়ার গান, জাপানের রহস্য, ভারতের ঘরে এসে বাঁকুড়ার পোড়া টির ঘোড়া মূর্তিকে বললুম, কেমন আছ? জেনারেল মোটর্সের বিশাল নাকা, তার সামনে তার চেয়ে বড়ো লাইন পড়েছে। ওরা নাকি সবাইকে য়ে যাবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে! আমি অ্যালেনকে জিজ্ঞেস করলুম, বে নাকি?

দু'জনে আধ ঘণ্টাটাক লাইনে দাঁড়ালুম! তারপর বসতে পেলুম লকট্রিকের বেঞ্চিতে—সেটা আপন মনে চলতে লাগলো—এক অন্ধকার ড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে, খানিক বাদে আমরা ঘুরতে লাগলুম, সমুদ্রের তলায় াগামী শতাব্দীর শহরে—যেখান দিয়ে ট্রেন ও মোটর গাড়ি চলছে, গেলুম দের গ্র্যাণ্ড হোটেলে, মঙ্গল গ্রহের চৌরঙ্গিতে, মরু প্রদেশের মধুপুর-ওঘরে। অ্যালেনর রং ফর্সা, আমার রং খয়েরি, আমার পাশে একজন নগ্রো মেয়ে বসে—আমরা তিনজনেই একসঙ্গে ঘুরছিলাম ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে।

ওখান থেকে বেরলুম অনেক রাত্রে। মাটির তলার ট্রেনে চেপে বাড়ি ফরলুম—সুতরাং শহর চোখে দেখিনি। ফিরে রেডিওতে শুনি, ভীষণ াঙ্গা চলছে তখন হার্লেমে। আর রেডিও-ওলারা কি বিষম ওস্তাদ ওদেশে, গাপনে ওখানে কোথায় একটা পাওয়ারফুল মাইক্রোফোন রেখে দিয়েছে, যার আমরা রেডিওতে শুনছি দাঙ্গার সমস্ত হৈ হল্লা, গুলির শব্দ, পুলিশের াইরেন, বিয়ারের বোতল ভাঙা।

দিন চারেক চললো বেশ ঘোরতরভাবে সেই দাঙ্গা। দিনের বে
চুপচাপ—সন্ধ্যে হলেই শুরু হয়, হার্লেমপাড়াটা মোটামুটি নিগ্রোদের-
কিছু সাদা লোকও আছে। কিন্তু সাদা লোকেরা ভয়ে দরজা বন্ধ ক
পালালো, হার্লেম হয়ে উঠলো নিগ্রোদের দুর্গ। ও পাড়া দিয়ে আর একটা
গাড়ি চলে না ভয়ে, বাস যায় না। চলন্ত গাড়ি আটকেও সাদা লো
দেখলেই মারধোর চালালো, রাত্তির বেলা পুলিশের গাড়ির উদ্দেশ্যে ই
বোতল, গরম জল ছোঁড়া—তার উত্তরে পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ও গুলি। সে
সঙ্গে লুঠপাট। নিগ্রোদের দোকানও লুঠ করতে লাগলো নিগ্রোরাই। সম
ঘটনাটাই চলে গেল চোর-বদমাস আর লুঠেরাদের হাতে। এমন কি নিগ্রে
নেতাদের (যারা গান্ধীবাদী ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী) আবেদন
কেউ গ্রাহ্য করলো না। তাদের মিটিং-এও চললো ইট-পাটকেল।

খুব একটা অস্বাভাবিক বা ধারণাতীত ছিল যে এই দাঙ্গা, তা নয়
যে-কোনো একটা কারণের অপেক্ষায় ছিল। নিগ্রোদের রাগী সর্দা
ম্যালকম এক্স বহুদিন থেকেই ঘোষণা করেছিল—এই গ্রীষ্ম হবে দী
রক্তাক্ত গ্রীষ্ম—লং ব্লাডি সামার। খুনের বদলে খুন। দক্ষিণ অঞ্চলে
অমানুষিক অত্যাচার চলছে এখনও, যে রকম হাসি ঠাট্টাচ্ছলে নিগ্রো খু
করছে—তার জন্য আর দয়া ভিক্ষা নয়, অনুরোধ-উপরোধ নয়, এবার শু
করতে হবে শ্বেতকায় খুন। এক হিসেবে একটা পাগলের প্রলাপ—কার
দু'কোটি নিগ্রো কি করে দাঁড়াবে সতেরো কোটি শ্বেত আমেরিকানে
বিরুদ্ধে—তা ছাড়া শাসনযন্ত্র শ্বেতকায়দের হাতে। সেইজন্যই বোধহ
ম্যালকম এক্স—আফ্রিকায় চলে এসেছিল—আফ্রিকার নিগ্রোদের সাহা
পাবার আশায়। এও এক ছেলেমানুষি অ্যাডভেঞ্চারের নেশা—আফ্রিকা
নিগ্রোরা আমেরিকায় এসে ওখানকার নিগ্রোদের সাহায্য করবে—এ এ
রূপকথা। যখন আফ্রিকানরা খোদ আফ্রিকাতেই এখনও ভেরউডকে সরা
পারেনি। অবশ্য, এ কথাও ঠিক, ম্যলকম এক্স বা জঙ্গী ব্ল্যাক মুশলিমদে
দল—খুব বেশী সমর্থন পায়নি নিগ্রোদের মধ্যেও—মার্টিন লুথার কিং-এ
নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ অনেক বেশী বিশ্বাস এবং জোর এনে দিয়েছে
সে সঙ্গে বহু সংখ্যক সাদা লোকেরও এই আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা।

সেই দাঙ্গার সময় আমার কি অবস্থা? আমার রং ফর্সাও নয়,
়লোও নয়। খয়েরি বলা যাক্। নিগ্রো-সাদার লড়াই-এ আমাদের
ানো প্রত্যক্ষ অংশ থাকার কথা নয়! আমরা ভারতীয়রা, বা এশিয়ার
়করা একটা আলাদা জাত—জাপানী-চীনেরা কালো না হলেও হোয়াইট
ন নয়, যেমন নয় আরব তুর্কীরা। ইংরেজরা আমাদেরও তো গালাগালের
়য়ে 'নীগার' বলতো। ইংলণ্ডেও যে এখন কালো-সাদার সমস্যা উঠেছে—
খানে নিগ্রো-ভারতীয়—সবাইকেই কালার্ড লোক বলে ধরা হচ্ছে।
মেরিকাতেও যে ভারতীয় বা এশিয় হলেই নিগ্রোদের চেয়ে বেশী খাতির
। তা নয় —অনেক জায়গায় সমান। জাপানীদের বিরুদ্ধেও আমেরিকায়
সময় দাঙ্গা হয়েছিল। ভারতীয় ছাত্ররা সব পাড়ায় বাড়ি ভাড়া পায়
। আমেরিকার দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে যেখানে নিগ্রোদের প্রতি অহরহ
াধোর চলছে—সেখানেও ভারতীয় বললে রেয়াৎ করে না। অনেক
শ্রিত নিগ্রোর গায়ের রং আমাদের মতই—শুধু চুল কোঁচকানো। ওদিকে
গ্রারাও আমাদের যে পরম আত্মীয় মনে করে তা না। তারা সমর্থন
়ছে আফ্রিকার কাছে—এশিয়ার কাছে নয়। আফ্রিকায় স্পষ্টতই ভারতীয়
দ্বেষ খুব ঘোরালো হয়ে উঠছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় বংশোদ্ভুত আর
গ্রোরা নৃশংসভাবে মারামারি করছে। সুতরাং আমরা একটা তৃতীয়
ত—এখনও পর্যন্ত।

সোজা কথা দাঙ্গার সময় আমি আর হার্লেম পাড়ার তল্লাটও মাড়ালুম
। যেমন আমেরিকার নানা জায়গায় বেড়াবার সুযোগ পেয়েও আমি
নও দক্ষিণে যাই নি। কি দরকার বাবা, ওসব ঝঞ্ঝাটে জড়াবার। কারণ
সমস্যাটা আমার সমস্যা নয়। ওটা আমেরিকার ঘরোয়া ব্যাপার।
মেরিকার উচিত অবিলম্বে নিগ্রোদের সব রকম সমান অধিকার দেওয়া-
কথাটা আমরা প্রায়ই বলে থাকি বটে, কিন্তু এটা অতিরিক্ত মানবতার
ব। আমাদের দেশে তো বটেই সব দেশেই দেখি এ ধরণের কিছু না
ছু সমস্যা রয়েছে!

সিভিল রাইটস্ বিল হয়েছে।—কিন্তু কতদিন লাগবে সেটা কার্যকরী
ত কে বলবে। জঙ্গী নিগ্রোরা ভাবছে—সাদারা যেন দয়া করে আমাদের

অধিকার দিচ্ছে—তা কেন, আমরা জোর করে নেবো। দক্ষিণের সাদারা ভাবছে—আইনকে গায়ের জোরে আটকাবো, ভোট দিতে দেবো না নিগ্রোদের। সেই দাঙ্গার আগেই তো তিন-জন সিভিল রাইটস কর্মী নিখোঁজ হয়ে গেল—পুলিশ, শেষ পর্যন্ত সরকারী ফৌজ এসে তন্নতন্ন করে খোঁজার পর চল্লিশ দিন বাদে তাদের বুলেট-ফোঁড়া, পচাগলা দেহ পাওয়া গেল এক নতুন বাঁধের মাটির নীচে। সেই সময়কার একটা ছবি বেরিয়ে ছিল কাগজে···সৈন্যেরা এক নদীর পারে খোঁজাখুঁজি করছে—আর একদ বখা সাদা ছেলে হাসতে হাসতে বলছে, 'ওতো মাছের খাদ্য হিসেবে দু'চারটে নিগ্রোকে মাঝে মাঝেই আমরা নদীতে ছুঁড়ে দিই!' কিন্তু ঐ তিনজ শহীদের মধ্যে দু'জনই সাদা, অসংখ্য সিভিল রাইটস্ কর্মীদের মধ্যে সাদার সংখ্যাই বেশী। চার পাঁচটা প্রদেশ বাদে, বাকি তরুণ আমেরিকা বর্ণ-বিভেদ মুছে ফেলতে চায়।

চার-পাঁচটা প্রদেশের নামে দোষ দিচ্ছি বারবার। সত্যিই ওর আমেরকার কলঙ্ক, কিন্তু বাকি অংশ কি নিষ্কলুষ? বিভেদ সব জায়গা তেই রাছে! কত অসংখ্য উদার মনের মানুষ দেখলুম, যাঁরা বিষম লজ্জিত আমেরিকার এই সমস্যায়। তাঁরা কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক কিন্তু তার বাইরেও বহু লোক থেকে যায়। মুখে চায় নিগ্রো-শ্বেত মিলন কিন্তু মন থেকে সম্পূর্ণ গ্লানি বা ভয় ঘোচেনি। নিগ্রোরা (দু'এক জায়গায় ভারতীয়ও) তাদের কাছে বাড়ি ভাড়া চাইতে এলে—দিতে অস্বীকার করবে না, বা দক্ষিণের মতো বন্দুক উঁচিয়েও ধরবে না, কিন্তু মিষ্টি করে মিথ্যে কথা বললে, 'দুঃখিত, আমার ঘর আগেই ভাড়া হয়েছে।' কিছু কিছু সৎ সাদা লোকদের মনে নিগ্রোদের সম্বন্ধে নতুন ভয় ঢুকেছে। তারজন্য জঙ্গী ব্ল্যাক মুশলিমরা দায়ী। নিগ্রোরা ভোটের অধিকার পেয়েছে। ওদের বংশ বৃদ্ধির রেট অসম্ভব বেশী। একদিন যদি ওরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পায় তবে এখন যেমন প্রতিহিংসার কথা বলছে তখনও যদি সাদাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নিতে শুরু করে! এ ভয় খুব অমূলক নয়। পুরানো দাবি যা প্রতিশোধ ইতিহাসকে বহুবার বিষাক্ত করেছে।

আমি নিউইয়র্কের দাঙ্গা এড়িয়ে এদিক ওদিক ঘরে বেড়াচ্ছিলম। দাঙ্গা

অবশ্য হার্লেম থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য জায়গায়। সন্ধ্যের আগেই সুট করে বাড়ি ঢুকে পড়তুম। একদিন দুপুরে নাপিতের দোকানে চুল ছাঁটতে ঢুকেছি। সামনের আয়নায় পিছন দিকের একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখা যাচ্ছিল। ঘাড়ের ভঙ্গী ও শরীরের ঔদ্ধত্যে এমন বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম যে, নাপিত কি করছে খেয়ালই করিনি! হঠাৎ দেখি সে আমার মাথার এক পাশের ঘাড়-জুলপি ছেঁটে তালুর কাছ পর্যন্ত ফর্সা করে দিয়েছে। হা-হা করে উঠলুম, কিন্তু তখন আর উপায় নেই, 'নাবিক ছাঁট' না কি বলে—মাথার একদিকের চুল আধ ইঞ্চি করে দিয়েছে। বাকি দিকটাও তা না করে উপায় নেই। নইলে ন্যাড়া হতে হয়। হায়, হায়—আমার অমন সুন্দর কালো ঘন-ঢেউ খেলানো চুল মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—হাওয়ায় উড়ে চলে গেল ওপাশের সেই সুন্দরীর পদপ্রান্তে—ভক্তের নিবেদনের মতো। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে এসে ঢুকলুম এক হোটেলে কিছু খাবার খেয়ে রাগ ঠাণ্ডা করতে। একটা হ্যামবার্গার নিয়ে বসেছি। টেবিলের উল্টো দিকে একজন মজুর শ্রেণীর শ্বেত লোক। খুব ক্লান্ত ও বুড়ো লোকটা! সে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি হার্লেমে থাকো, না ব্রুকলিনে?

কিরকম খটকা লাগলো। এ রকম তো কেউ প্রশ্ন করে না। বড়জোর জিজ্ঞেস করতে পারতো, তুমি কোথায় থাকো? কিন্তু আমি যে ঐ দু'জায়গার এক জায়গাতেই থাকবো তার কি মানে আছে।

জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কি বলছো, বুঝতে পারছি না।

আবার প্রশ্ন: তুমি হার্লেমে থাকো না ব্রুকলিনে?

হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। শিউরে উঠলো সারা শরীর। ঐ দুটো পাড়াতেই সাধারণত বহু নিগ্রো থাকে। লোকটা আমাকে ধরে নিয়েছে মিশ্রিত নিগ্রো—মাথার আমার চুল নেই, প্রমাণ নেই।

জিজ্ঞেস করলুম, কেন? কেন জানতে চাইছো?

—তাহলে আলোচনা করতুম, তোমরা দাঙ্গা করছো কেন? দাঙ্গা করে তোমাদের কি লাভ?

প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলাম। তারপর নিজেকে নিগ্রো বলে অস্বীকার করতেও ইচ্ছে হলো না। স্পষ্ট গলায় বললুম, না দাঙ্গা করে কোন লাভ

নেই। দাঙ্গা করে কোথাও কোনো লাভ হয় না। এই কথাটা বলার সময় প্রথম আমার ঢাকার দাঙ্গার কথা ও কলকাতার দাঙ্গার কথা মনে পড়েছিল। তারপর মনে পড়ে নিউইয়র্ক-শিকাগোয় নিগ্রোদের দাঙ্গা, মিসিসিপি-অ্যালেবামায় সাদাদের দাঙ্গা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারতীয় আফ্রিকানদের দাঙ্গা, সাইপ্রাসে গ্রীক-তুর্কিদের দাঙ্গা। আমি আবার বললুম, না, কোনো লাভ হয় না।

কুড়ি

দিল্লি পৌঁছে শুনলাম, সফরসূচি বদলে গেছে। আগে ঠিক ছিল যে মে মাসের তিন তারিখ রওনা হওয়া হবে সদলবলে। বিকেলের দিকে ফেস্টিভ্যাল অফ ইণ্ডিয়া দফ্তরে টেলিফোন করে জানা গেল যে তিন তারিখের বদলে চার তারিখে যাত্রা ঠিক হয়েছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে আমাকে তা জানানো হয়নি। সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়া হবে বলেই আমার দিল্লিতে আসা। দলের সদস্য সংখ্যা ছয় অমৃতা প্রীতম (পাঞ্জাবী ভাষার কবি) গোপালকৃষ্ণ আদিগা (কন্নড় ভাষা), কেদারনাথ সিং (হিন্দী), শামসুর রহমান ফারুকি (উর্দু), অরুণ কোলাটকর (মারাঠী) এবং আমি। এবং দলটির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যাবেন ভূপালের ভারত ভবনের পরিচালক অশোক বাজপেয়ি।

আমার পক্ষে তখন টিকিট বদল করার অনেক ঝামেলা। সুতরাং একাই যেতে হবে। একলা ভ্রমণ আমার ভালো লাগে, অভ্যেসও আছে। কিন্তু পুরো দলটিকে নিউ ইয়র্কে ভারতীয় উপ-দূতাবাসের কর্তৃপক্ষের অভ্যর্থনা করার কথা। আমার একার জন্য নিশ্চয়ই কেউ আসবে না, হোটেল ইত্যাদি কে ঠিক করবে তাই-বা কে জানে। যাই হোক, একটা কিছু হবেই। দিল্লিতে সারা সন্ধে আড্ডা দেবার পর রাত দুপুরে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে গেল মিহির রায়চৌধুরী, সমরেশ দাশগুপ্ত ও ভারতী। আজকাল এমনই সিকিউরিটির কড়াকড়ি যে সঙ্গী সাথীদের গেটের

।ইরে থেকেই বিদায় জানাতে হয়। বিমানে ওঠার আগে পেছন ফিরে প্রিয়জনদের আন্দোলিত করতল আর দেখার উপায় নেই!

ইন্দিরা গান্ধীর নামে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি খুলেছে মাত্র ’দিন আগে। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। ।তুন বলেই মনে মনে সব কিছু ক্ষমা করা যায়, হয়রানি সত্ত্বেও মনকে সেই ।বে শান্ত রাখি। রাত্তিরে ঘুমের কোনো আশা নেই। কারণ এয়ার ।ণ্ডিয়ার বিমানটি বোম্বাই ছুঁয়ে যাবে, সেখানে ঘন্টা দু’একের অপেক্ষা, ।রই মধ্যে আবার নতুন করে সিকিউরিটি চেক, নিজের সুটকেসটি খুঁজে ।ঙ্গুলি নির্দেশের দায়িত্ব। কতিপয় উগ্রপন্থী শিখ যাত্রী ভর্তি বিমান ।াকাশপথে ধ্বংস করার বায়না ধরেছেন, তারই জন্য এত সব ঝকমারি, তবু ।কৌতুকে লক্ষ্য করলুম, যাত্রী সংখ্যা একটুও কমেনি, বিমানটি প্রায় ।ইটম্বুর।

পশ্চিম গোলার্ধে যাত্রায় মজা এই যে তাতে অতিরিক্ত সময় অর্জন করা ।ায়। এই আকাশ পথে দীর্ঘ যাত্রায় সন্ধে এবং রাত্রির পর ভোর হয় না, ।াবার বিকেল ফিরে আসে। আমার ইওরোপে থামার কোনো পরিকল্পনা ।নই, সুতরাং আটলান্টিকের অন্তরীক্ষে মিশমিশে কালো রাত দেখার পর ।নউ ইয়র্কে যখন পৌঁছোলুম, তখন ফটফটে বিকেল।

কেনেডি এয়ারপোর্টের অবস্থা যাচ্ছেতাই। মুহুর্মুহু প্লেন ওঠা-নামা ।রছে, গিসগিস করছে যাত্রী-যাত্রিণী, ইমিগ্রেশন আর কাস্টমসের সামনে ।ম্বা লাইন। আমি যখন প্রথমবার এদেশে আসি তখন এই বিমানবন্দরটির ।াম ছিল আইডেলওয়াইল্ড, তখন প্লেন থেকে বাইরে বেরুতে দশ মিনেটের ।বশি সময় লাগতো না, এখন নাকি দু’আড়াই ঘন্টা লেগে যায়। কোন ।ণ্যবলে জানি না, আমাকে তেমন ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হলো না। আমি ।বিতা পাঠ করতে এসেছি শুনে দুটি জায়গাতেই ঈষৎ হাস্য পরিহাস করে ।ামাকে ছেড়ে দিল। সুটকেস ঠেলতে ঠেলতে আমি চিন্তা করছি কোথায় ।াবো, কোন্ হোটেলে উঠবো, কোন্ বন্ধুকে টেলিফোন করবো, এমন সময় ।দখি অনেকগুলি উজ্জ্বল পরিচিত মুখ। বিদেশের এয়ারপোর্টে যদি কোনো ।না মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়, তাও আবার যদি অচিন্ত্যপূর্ব হয়, তাহলে

তার তুলনা দেওয়া যায় অল্প পড়াশুনো করে পরীক্ষায় ফাস্ট হবার সঙ্গে। আমি ভেবেছিলুম, আমার জন্য কেউই থাকবে না, দেখলুম অপেক্ষা করছেন মোট সাতজন। আমাদের বুধসন্ধ্যার ধ্রুব কুণ্ডু, নিউ ইয়র্কের অনেককালের অধিবাসী যামিনী মুখার্জি এবং তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা মুখার্জি, হোয়াইট প্লেইনসের চন্দন সেনগুপ্ত এবং তার গুজরাটি পত্নী প্রীতি, এবং কমিটি ফর ইণ্টারন্যাশনাল পোয়েট্রির দু'জন প্রতিনিধি মার্ক নেসডর এবং স্যাম শার্প। এঁরা সবাই এসেছেন আলাদা আলাদা ভাবে এবং আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে কেউই আসেননি। মার্কিন যুবক দুটি জানালো যে আমার জন্য হোটেল ঠিক করা আছে।

যে-কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আমি এসেছি, তা ভারত উৎসবেরই অন্তর্গত। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পর, দেড় বছর ধরে খণ্ড খণ্ড ভাবে এই অনুষ্ঠান চলবে। উৎসবের উদ্যোক্তা ভারত সরকার বটে কিন্তু আমেরিকার বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করেছে কমিটি অফ ইণ্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি। নিউ ইয়র্কের একদলকবি এই কমিটি গড়েছেন, সেই কবিদেব প্রধান হচ্ছেন অ্যালেন গীন্‌সবার্গ। এই কমিটি বিভিন্ন দেশের কবিদের আমন্ত্রণ জানান এদেশে কবিতা পাঠের জন্য। এবারে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁরা ভারতীয় কবিদের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করেছেন। এদের সঙ্গে আমেরিকান সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই

হোটেলটির নাম লেক্সিংটন, এটি ম্যানহ্যাটনের লেক্সিংটন অ্যাভিনিউ ও ৪৮ নং রাস্তার মোড়ে। এককালে নাম করা হোটেল ছিল নিশ্চয়ই শুনলুম সম্প্রতি কোনো ভারতীয় এটি কিনেছেন। সামনের দিকে মেরামতের কাজ চলছে অব্যবস্থার একেবারে চূড়ান্ত। রুম সার্ভিস বলে কিছু নেই ঘরে বসে এককাপ চা কিংবা কফিও পাওয়া যায় না। ভারতীয় মালিকানায় গেছে বলেই এই অবস্থা, এরকম মন্তব্য অনেকেই করেছেন বারবার যদিও হোটেলটির কর্মচারিরা ভারতীয় নয়।

হোটেলে পৌঁছে একটি চিরকুট পেলুম, তাতে লেখা আছে গীন্‌সবার্গ এক রেস্তোরাঁয় উইলিয়াম বারোজ-এর সঙ্গে ডিনার খাবেন, সেখানে তিনি আমাকেও নেমন্তন্ন করেছেন। কিন্তু সুদীর্ঘ বিমানযাত্রা এবং ঘুমহীনতা

আমি অবসাদ বোধ করছিলাম, আবার বাইরে বেরুতে বা কিছু খেতে ইচ্ছে করলো না একেবারেই। নিজের ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা দেবার পর আমি টি ভি চালিয়ে দিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলুম। আমেরিকান টি ভি খুব ভালো ঘুমের ওষুধ।

পরদিন সন্ধ্যায় পুরো দলটি এসে পৌঁছোবার পর জানা গেল, শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম আসতে পারেননি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রায় শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিল করেছেন। যাই হোক, ভারতীয় কবির দলটির সংখ্যা-হানি অবশ্য হলো না, কারণ সেইদিনই এসে পেঁাছেছেন নবনীতা দেবসেন। আর একটি ভ্রাম্যমাণ ভারতীয় লেখকদের দল আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা ও আলোচনাচক্রে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্য থেকে দু'জন নবনীতা দেবসেন এবং বোম্বাইয়ের ইংরিজি ভাষার কবি-সম্পাদক নিসিম ইজিকিয়েল নিউ ইয়র্কের কাব্য পাঠের আসরে যোগদান করবেন, এরকম আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। এছাড়া, শিকাগোতে অধ্যাপনা করেন দক্ষিণ ভারতীয় কবি এ কে রামানুজন, ডেকে আনা হয়েছে তাঁকেও।

নিউ ইয়র্কের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে দু'জায়গায়। প্রথম তিনদিন অনুষ্ঠান হবে মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টস-এ, সংক্ষেপে যার নাম মোমা। মিউজিয়াম কথাটি শুনলেই আমাদের প্রাচীন হাড়-পাথরের কথা মনে পড়ে, কিন্তু পশ্চিমের মিউজিয়ামগুলি সব সময়েই সমসাময়িক সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখে। ছবির প্রদর্শনী তো থাকেই তাছাড়া দেশ-বিদেশের শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্যেরও স্বাদ পাওয়া যায় এখানে এসে। মোমা-তে প্রায়ই তো কবিতা পাঠের ব্যবস্থা থাকে।

মে মাসের পাঁচ তারিখ থেকে তিনদিন ধরে যে কবিতা পাঠের আসর, তাতে আমেরিকান ও ভারতীয় দু'দল কবিই পড়বেন। এই সম্মিলিত কাব্য পাঠের ব্যবস্থাটি অভিনবই বলতে হবে।

দ্বিতীয় দিন সকালেই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল অ্যালেন গীন্‌সবার্গ। তার সঙ্গে আমার পনেরো বছর বাদে আবার দেখা। পাঁচ বছর আগে আমি যখন এদেশে এসেছিলাম, তখন অ্যালেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সময়

হঠাৎ একদিন কলকাতায় আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল অ্যালেন। সেসময়ে আমাদের বাড়ির বয়স্ক রাঁধুনী গোপালের মা ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না, অ্যালেন গোপালের মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় সে হেসে-কেঁদে অস্থির !

সেবার অ্যালেন এসেছিল বাংলাদেশ যুদ্ধের শরণার্থীদের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে। তার সঙ্গে জন জিয়োনো নামে আর একজন তরুণ কবি ও ফটোগ্রাফার। আমরা তিনজন যশোর রোড ধরে গিয়েছিলাম বনগাঁ'র সীমান্তের দিকে। দু'পাশের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে ঢুকে ঢুকে লক্ষ লক্ষ শিশু বৃদ্ধ-নারীর মানবেতর জীবনযাপন নিজের চোখে দেখে অ্যালেন চোখের জল ফেলেছিল। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস, কয়েকদিন আগেই প্রবল বর্ষায় এইসব অঞ্চলে বন্যা হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত আমরা গাড়িতে যেতে পারিনি, একটা নৌকো ভাড়া করে এগিয়ে যেতে যেতে দেখেছিলুম অনেক ভাসমান সংসার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অ্যালেন লিখেছেন তার বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা, 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। কিছুদিন পরে পপ্ সঙ্গীতের সম্রাট বব ডিলান যখন বাংলাদেশের দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য এক বিরাট সঙ্গীতানুষ্ঠানে টাকা তোলেন, সেখানে ঐ কবিতাটি সুর করে গাওয়া হয়েছিল।

অ্যালেন গীন্সবার্গের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এরও অনেকদিন আগে, বাষট্টি সালে। সেবারে অ্যালেন ও তার সহচর পিটার অরলভস্কি এসেছিল মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যদিয়ে হিচ হায়কিং করে। তখনও হিপি আন্দোলন শুরুই হয়নি, ছেঁড়া জামা, ধুলো-কাদা মাখা সাহেব দেখা এদেশের মানুষের অভ্যেস হয়নি। কেরুয়াক-করসো-গীন্সবার্গ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকরা নিজেদের বলতো বীট জেনারেশান, ওদের নীতি ছিল যতদূর সম্ভব কম খরচে জীবন যাপন করা, যাতে কোনোক্রমেই প্রতিষ্ঠানের কাছে হাত পাততে না হয়, শিল্পী-সাহিত্যিকরা চব্বিশ ঘন্টার জন্যই স্বনিযুক্ত, কোনো রকম চাকরি-বাকরি করায় ওঁরা বিশ্বাসী নন্।

কবি হিসেবে অ্যালেন গীন্সবার্গকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তার আমেরিকায় আলাপ হয়েছিল, সেই সূত্রে কলকাতায়

এসে সে কৃত্তিবাসের আড্ডায় জুটে পড়ে। তারপর দিনের পর দিন এক সঙ্গে কাটানো, কখনো শ্মশানঘাটে, কখনো মাহেশে রথের মেলায়, কখনো ডায়মণ্ডহারবারে, কখনো আমরা বা উৎপলকুমার বসু বা তারাপদ রায়ের বাড়িতে, আড্ডা তুমুল আড্ডা। তারপর জামসেদপুর, চাইবাসা, কাশীতে ভ্রমণ। শক্তি অ্যালেনদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল তারাপীঠ, সেখানে তান্ত্রিকদের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে কয়েকটা দিন। অ্যালেনের ঝোঁক তখন অতীন্দ্রিয় সাধনার দিকে, ভারতে সে প্রধানত এসেছিল গুরু খুঁজতে। আমাদের ধর্মের দিকে বা যোগ সাধনার দিকে কোনো ঝোঁক ছিল না। আমরা তখন নিমজ্জিত হয়ে আছি কবিতায়, শুধু কবিতায়। অ্যালেন গীন্‌সবার্গের মতন একজন জোবালো কবির সান্নিধ্যে আমরা অনুপ্রাণিত বোধ করতাম। মানুষ হিসেবেও সে চমৎকার, নরম, ভদ্র, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনে, নিজের মতামত জোর করে খাটাবার চেষ্টা করে না। তার কবিতা বর্ণনামূলক হলেও শব্দ ব্যবহারের জাদু আছে, এই পৃথিবীর প্রতি তার নিজস্ব কিছু কথা বলার আছে, এই কবিতা আমাদের নতুন স্বাদ দেয়।

সেই অ্যালেন গীন্‌সবার্গের সঙ্গে কতকাল পরে আবার দেখা। আমার বর্তমান চেহারা সে চিনতে পারবে কি না এ ব্যাপারে কিছু সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র সে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করার পর ফটাফট চুমো খেল দুই গালে। দু'বার বললো, লং টাইম, আফটার আ লং টাইম। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, কত বছর বাদে? পনেরো? কুড়ি; পঁচিশ? সে বহুদেশ ঘুরে বেড়ায়, তার সঠিক মনে থাকার কথা নয়, আমি তাকে সঠিক তারিখগুলি স্মরণ করিয়ে দিলাম।

এতগুলি বছরে, পোশাকে ছাড়া তার শরীরের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তার বয়েস ষাট, কিন্তু বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি, মাথার চুল ঈষৎ পাতলা, দাড়িতে পাক ধরেছে। সে পরে আছে কোট ও টাই, তেমন কিছু ফ্যাসান দুরস্ত বা দামি নয়, তবে ভদ্রস্থ। এর আগে আমি কিছু পত্র-পত্রিকায় পড়েছি যে এককালের সেই বিদ্রোহী কবি অ্যালেন গীন্‌সবার্গ এখন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আঁতাত করেছে, সে এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সে এখন অনেক টাকা রোজগার করে। এমনকি এখন তার প্রাইভেট সেক্রেটারি আছে।

অবশ্য কবি হিসেবে তার খ্যাতিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন আমেরিকার সে প্রধান কবি বললে অত্যুক্তি হয় না।

আমি দেখলুম, এত খ্যাতি সত্ত্বেও অ্যালেন আগের মতনই নিরভিমান, বন্ধুত্বের ব্যাপারে উষ্ণ। আমার কাছে সে কলকাতার অনেক খবরাখবর নিল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত, তারাপদ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথা তার স্পষ্ট মনে আছে, বারবার জিজ্ঞেস করলো তাদের কথা।

পরদিন দুপুরে অ্যালেনের বাড়িতে আমাদের সবার নেমন্তন্ন। সে এখন থাকে ম্যানহাটনের ১২ নম্বর রাস্তায়. ঠিকানা জানাবার সময় সে আমার দিকে চোখ টিপে সকৌতুকে বললো, আমি আপ টাউনে উঠে এসেছি! এ শহরে রাস্তার নম্বর শুনলেই অনেকটা বোঝা যায় সে কেমন অবস্থাপন্ন পাড়ায় থাকে। অ্যালেনরা আগে থাকতো গ্রীনইচ ভিলেজের একটেরেতে লোয়ার ইস্ট সাইডে, প্রায় বস্তির মতন এক লম্বাটে বাড়িতে। গ্রীনইচ ভিলেজ এখন অনেকটাই ভেঙে চুরে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে, বাকিটা টুরিস্টদের ভিড়ে ভরা.

অ্যালেনের বর্তমান অ্যাপার্টমেন্টটিও তেমন কিছু সচ্ছল এলাকায় নয়, রাস্তায় ছেলে মেয়েরা চ্যাঁচামেচি করছে, বাড়িটি পুরোনো, লিফ্‌ট নেই. সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হলো চারতলায়। পিটার ওরলভস্কি এখন তার সঙ্গে থাকে না, সে অসুস্থ অবস্থায় আছে কোনো বৌদ্ধ আশ্রমে। এখানে রয়েছে অ্যালেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি বব্‌ রোসেনথাল, আর একটি মেয়ে অ্যালেনের বই-এর সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি গোছগাছ করার কাজ করে। এসব সত্ত্বেও বাসস্থানটি দেখলে মনে হয় কোনো গৃহী সন্ন্যাসীর। একটি ঘরের কোণে আমাদের দেশের মা-ঠাকুমাদের ঠাকুর ঘরের মতন কয়েকটি ঠাকুর-দেবতার ছবি ও মূর্তি সাজানো, সামনে আসন পাতা, সেখানে অ্যালেন প্রতিদিন ধ্যানে বসে। নবনীতা মহা উৎসাহে ছবি তুলতে লাগলো এই সব কিছুর।

অ্যালেন আমাকে তার সমগ্র কাব্য সংগ্রহ উপহার দেবার সময় ছেলে-মানুষের মতন নানারকম ছবি এঁকে আঁকিবুকি কেটে আমার নাম লিখে

দিল। এছাড়া সেদিন তার কবিতার গানের লং প্লেয়িং রেকর্ড, তার নিজের গলায় গাওয়া 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতার ক্যাসেট। আমাদের বাংলা বই তাকে দিয়ে কোনো লাভ নেই, আমি একটি ছোট্ট প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, আমার স্ত্রী তোমার জন্য একটা পাঞ্জাবি পাঠিয়েছে। অ্যালেন ক্ষুণ্ণ ভাবে বললো, কেন তুমি পাঞ্জাবি এনেছো? কলকাতায় আমি একটা লাল পাঞ্জাবী গায়ে দিতুম তোমার মনে আছে? সেটা আমি সঙ্গে এনেছি, তুলে রেখে দিয়েছি, ওসব আমি আর পরি না। এখন আমি পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় বেরুলে লোকে আমাকে হিপি বলবে। ওসব আমি এখন চাই না। ছাখো, এক সময় আমি অনেক অনিয়ম-অনাচার করেছি, ঢের হয়েছে, এখন বয়েস তো হলো, এখন আমি চুপচাপ শান্তভাবে কবিতা লিখতে চাই।

আমি বললুম, ঠিক আছে, এটা পরে তোমায় রাস্তায় বেরুতে হবে না। ঘুমোবার সময় এটাকে নাইট শার্ট হিসাবে ব্যবহার করতে পারো।

অ্যালেন প্যাকেটটি না খুলে রেখে দিল একপাশে।

অ্যালেনের সেক্রেটারি বব রোজেনথাল বললো, অ্যালেন আজ নিজে রান্না করেছে। চলো, খাবার ঠাণ্ডা করা ঠিক হবে না।

আমরা সবাই চলে এলুম রান্নাঘরে। মোটামুটি সাত্ত্বিক আহার, কমলালেবু-কলা-আম-স্ট্রবেরি ইত্যাদি নানারকম ফল, রুটি-মাখন, চীজ কয়েক-প্রকার, গরম সাদা ভাত, পেঁপের তরকারি, ডাল ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন নিরামিশাষী, তাদের পছন্দ হলো খুব। অবশ্য একটি প্লেটে হ্যাম ও স্যালামির টুকরোও রাখা আছে, তবে সেদিন অশোক বাজপেয়ি, বিনীতা ও আমি ছাড়া কেউ বোধহয় হাত বাড়ায়নি।

সন্ধেবেলা মোমাতে কবিতা পাঠের আসরে দেখি অ্যালেন সেই পাঞ্জাবীটা পরে এসেছে। বব আমাকে বললো, দেখেছো, অ্যালেন আজ কীরকম সেজেছে! অনেকদিন আমি ওকে এরকম এক্সটিক পোশাকে দেখিনি! আমি অ্যালেনকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি শেষ পর্যন্ত হিপি সাজলে যে? অ্যালেন হেসে বললো, তখন খুলে দেখিনি, এই ডিজাইনটা খুব সুন্দর, আর আজকের আবহাওয়ায় এই মেটেরিয়ালটিই যাস্ট রাইট!

ভারতীয় কবিদের মধ্যে কেদারনাথ সিং, অশোক বাজপেয়ি ও আমি প্রা
আসরেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে গেছি, অন্যদের অবশ্য প্যান্টকোটই বেশি
পছন্দ। আর বর্ণময় শাড়িতে ও ঝলমলে ব্যবহারে নবনীতা সব সময়েই দৃ
আকর্ষণীয়া।

প্রতি সন্ধ্যায় তিনজন ভারতীয় কবি ও তিনজন আমেরিকান কবি কবিত
পড়বেন, এই রকম ঠিক ছিল। ভারতীয় কবিরা কবিতাপাঠ করবে
মাতৃভাষায়। সেই কবিতাগুলিরই ইংরেজি কবিতা পড়ে দেবেন কোন
আমেরিকান কবি। এই ব্যবস্থাটি আমার খুব পছন্দ। কোনো রুশ ক
বা কোনো ফরাসী কবি যখন মার্কিন দেশ সফরে আসেন, তখন তাঁ
মাতৃভাষাতেই কবিতা পড়েন। ইংরেজিতে নয়। তাঁদের কবিতা ইংরিজি
বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব অন্যের। তাহলে আমরা ভারতীয়রাই বা আমাদে
নিজস্ব উচ্চারণে ইংরিজি পড়তে যাবো কেন? এর ব্যতিক্রম ঘটলো শু
নিসিম ইজিকিয়েল আর নবনীতা দেবসেন-এর ক্ষেত্রে। নিসিম ইজিকিয়ে
ইংরিজিতেই লেখেন, তিনি নিজের কবিতা নিজেই পড়লেন। আর নবনীত
বিলেত-আমেরিকায় দশ কুড়িবার ঘুরে গেছে, এইসব দেশে সে দীর্ঘদি
থেকেছে, পড়াশুনো করেছে, তার ইংরিজি উচ্চারণ অনেক আমেরিকানে
চেয়েও ভালো, সে কোনো অনুবাদ-পাঠকের সাহায্য নেয়নি, নিজের কবিত
আগে বাংলায় পাঠ করে সে সেই কবিতার অনুষঙ্গ তার নিজস্ব ভাষা
বুঝিয়ে তারপর অনুবাদ পড়ে একেবারে জমিয়ে দিল। নবনীতার কবিত
পাঠের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেন এক অনবদ্য একক অনুষ্ঠান, তা অত্য
সমাদৃত হয়েছে।

কবিতা পাঠের আসরটি বসেছিল মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টসের গার্ডে
হলের কাছাকাছি ঢাকা বারান্দায়। শ্রোতারা সব বসেছেন চতুর্দিকে
ছড়ানো আলাদা আলাদা টেবিলে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ও বিরতি
সময় বিনামূল্যে লাল ও সাদা সুরা ও কোমল পানীয় বিতরিত হচ্ছিল
অনেকটা যেন রেস্তোরাঁয় আড্ডার মেজাজ, কিন্তু কবিতা পাঠের সময় পি
পতন নৈঃশব্দ্য। শ্রোতার সংখ্যা দুশো-আড়াই শো'র বেশি নয়, অল্প কি
সংখ্যক ভারতীয়, তাদের মধ্যেও বাঙালীই বেশি।

আমেরিকান কবিদের মধ্যে যাঁরা নিজস্ব কবিতা পড়লেন, তাঁদের মধ্যে ্যাতিমান ও তরুণ মেলানো মেশানো। খ্যাতিমানদের মধ্যে অবশ্যই ্যালেন গীন্‌সবার্গ শীর্ষে, তাছাড়া ছিলেন জেমস্ লকলীন, বিল্ জাভাট্‌স্কি ও ডভিড র‍্যাটরে। জেইন করটেজ নামে একজন কালো রঙের মহিলা কবি ড়লেন দারুণ রাগী, চ্যাচামেচির কবিতা, এদেশের বহু পাঠকের কাছেই যা বিতা বলে মনে হবে না। একজন বর্ষীয়ান কবি পড়লেন ভারতবর্ষ বিষয়ক বিতা। টম উইগেল নামে এক তরুণ কবি নানারকম কায়দা কানুন রতে লাগলেন, মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকানো, তাচ্ছিল্যের প্রকাশ, উল্টো-াল্টা মন্তব্য, হাত থেকে কাগজ পড়ে যাওয়া, হঠাৎ পড়া থামিয়ে সিগারেট রানো। এসবই আমার চেনা, আমাদের দেশেও এমন অনেকবার দেখেছি। আর কিছুই না, অ্যালেন গীন্‌সবার্গের মতন একজন প্রখ্যাত কবি সামনে সে আছে বলে তার বিরুদ্ধে খানিকটা বিদ্রোহের প্রকাশ। আমি তাকিয়ে খি, অ্যালেন মুচকি মুচকি হাসছে। ছেলেটি অবশ্য তেমন ভালো লেখে , ভালো লিখলে এসব মানিয়ে যেত।

দর্শকদের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে গ্রেগরি করসো। এই প্রখ্যাত বিটি প্রতি সন্ধেবেলাতেই হাজির, কিন্তু তাকে কবিতা পড়ার আমন্ত্রণ ানানো হয়নি। গ্রেগরি ঠিক আগের মতনই রয়ে গেছে, সব সময় মাতাল ংবা গাঁজার ধোঁয়ায় টইটম্বুর, টলমলে পায়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রগরিকে কবিতা পড়তে দেওয়া হয়নি বলে আমি বেশ ক্ষুব্ধ বোধ রেছিলুম। আমেরিকায় প্রকাশ্যে মাতালামি কেউ সহ্য করে না।

এতবড় একজন কবি বিনা আমন্ত্রণে প্রতিদিন আসছে, এটাও খুব াশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু গ্রেগরি নাকি অ্যালেনের সঙ্গ ছাড়তে চায় না, ায়ার মতন ঘোরে। অ্যালেন বললো, গ্রেগরি একটি আট বছরের শিশু, ামি দেখা শুনো না করলে ও নিজেকে সামলাতে পারে না।

গ্রেগরির ভাবভঙ্গি ঠিক একটি দুষ্টু ছেলের মতনই বারবার টেবিল বদলে এর ওর মদের গেলাস কেড়ে নিচ্ছে, জলন্ত সিগারেট তুলে নিচ্ছে অন্যের াঙুল থেকে, ওখানে বসেই গাঁজা টানছে। একটি মেয়ের কবিতা পাঠের সময় চেঁচিয়ে উঠলো, হানি, তুমি আমার লেখা থেকে চারলাইন চুরি করেছো।

চৌষট্টি সালে নিউ ইয়র্কে অ্যালেনের অ্যাপার্টমেণ্টে যখন আমি দিন কতক কাটিয়ে গিয়েছিলাম, তখনও গ্রেগরিকে এইরকমই দেখেছি। তখন তার কোনো রোজগার ছিল না, সে ছিল অ্যালেনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। অ্যালেন অবশ্য খাওয়া-দাওয়া থাকার বিনিময়ে তাকে দিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজার কাজ করাতো। গ্রেগরি একদিন আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে পালিয়েছিল। এবারে তার সঙ্গে অ্যালেন যখন নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিল তখন দেখা গেল তার সেই ঘটনাটি ঠিক মনে আছে। সে বললো, ও তুমিই সেই ভারতীয় ছোকরা কবি যার কাছ থেকে আমি টাকা ধার নিয়েছিলাম? তারপর সে আমার কাঁধ চাপড়ে বললো, দেবো, দেবো, একদিন না একদিন তোমার ধার আমি ঠিক শোধ দেবো! আমি বললুম, না, গ্রেগরি আমি তোমাকে সারা জীবন ঋণী রাখতে চাই!

ভারতীয় কবিদের মধ্যে এ কে রামানুজন-এর অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ইংরিজি ভাষাতে লেখেন। কিন্তু যেহেতু এখানে তামিল কবিতার কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, তাই তিনি নিজের কবিতা পাঠ করার আগে আগে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তামিল কবিতার ধারার নির্বাচিত কিছু কিছু অংশ পাঠ করে তার ইংরিজি অনুবাদ শোনালেন আমি মনে মনে ভাবলুম, আমাদের বাঙালীদের মধ্যে যারা সব ইংরিজিওয়ালা, যারা শুধু ইংরিজিতে লেখে, তাদের কারুর এরকম মাতৃভাষা প্রীতি তো দেখি না! অবশ্য, আমার এই ধারণাটি মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে ক'দিন পরেই আমি এরকম বাঙালী দেখেছি! সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে

আমার কবিতার অনুবাদগুলি অ্যালেন গীন্‌সবার্গ নিজে পাঠ করছে শুনে প্রথমে আমি বেশ বিব্রত বোধ করেছিলাম। সে এখন এত খ্যাতিমান কবি সে কেন অন্যের কবিতা পড়তে যাবে? এ যেন বন্ধুত্বের খাতিরে অতিরিক্ত দাবি। আমি তাকে বললুম, অ্যালেন, তোমার পড়বার দরকার নেই, অন্য যে-কেউ পড়ে দিক না। কিন্তু অ্যালেন তা শুনলো না। সে তার ভরাট সুন্দর কণ্ঠস্বরে আমার দুর্বল কবিতাগুলি সুখশ্রাব্য করে দিল।

অ্যালেন নিজের কবিতা পড়বার আগে হারমোনিয়াম বাজিয়ে জুড়ে দি

গান। এই ছোট হারমোনিয়ামটি সে ভারত থেকে নিয়ে গেছে। ইদানীং গানের দিকে খুব-ঝোঁক গেছে তার, অবশ্য গায়কদের মতন তার গলা যে সুরেলা তা নয়, কিন্তু তালজ্ঞান আছে, বৈদিক মন্ত্র যেমন গাওয়া হয়, সে তার কোনো কোনো কবিতা সেইভাবে উচ্চারণ করতে চায়। প্রথম একটি গানের পর বাকি কবিতাগুলি সে পড়লো স্বাভাবিক কবিতা পাঠের ভঙ্গিতে। সে তার আশু প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে নতুন কবিতা পাঠ করে শোনালো, কবিতাগুলির মধ্যে তার মায়ের কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে। অনেক আগে সে তার কাব্যগ্রন্থ 'কাদিস' মূলত তার মা নাওমি-কে নিয়েই লিখেছিল। এখন তার কবিতার ভাষা অনেক সংহত, আগে সে মাঝে মাঝেই চমকে দেবার জন্য দু'একটি কাঁচা গালাগালির শব্দ ব্যবহার করতো, এখন তা একেবারেই নেই। এখন তার লাইনগুলিতে ফুটে ওঠে ছোট ছোট ছবি এবং সেই সব ছবি ছাপিয়েও যা ফুটে ওঠে, তা হলো একটি বিশ্ব-নাগরিক মন। তার কবিতা একেবারেই দুর্বোধ্য নয়। নিছক শব্দ নিয়ে খেলা, কিংবা বিনি সুতোর মালার মতন কবিতা ওদেশে অচল হয়ে গেছে। গ্যালেনের কবিতায় স্পষ্ট বোঝা যায় এক কবির ক্ষোভ ও বিষাদ চার পাশের বাস্তব জীবন সম্পর্কে কবির অভিমত এবং মাঝে মাঝেই বাস্তবতা থেকে উত্তরণ।

কবিতা পাঠের পর প্রতিদিনই আমরা অনেক রাত পর্যন্ত কোথাও না কোথাও আড্ডা দিতাম। কোনোদিন কোনো ভারতীয় রেস্তোরাঁয়, কোনোদিন চীনা খাবারের দোকানে, কোনোদিন আমার হোটেলের ঘরে। আমার কাছে একটি উপহার-পাওয়া শ্যাম্পেনের বোতল ছিল, প্রথম দিনই সেটা খুলে ফেলা হলো। অ্যালেন মদ ছোঁয় না আর গ্রেগরির বোতল ফুরিয়ে ফেলার জন্য খুবই ব্যস্ততা। ভারতীয় কবির দলের মধ্যে দু'তিনজন কট্টর নিরামিষাশী, কিন্তু মদ্যপানে তাঁদের কারুর অনীহা নেই। কয়েকজন শিল্পীও এসে জুটে গিয়েছিলেন দলে, ছোট ঘরে সকলের বসার জায়গা হয় না. যে-যেখানে পারে একটু স্থান করে নেয়, আড্ডা রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

একদিন আমরা খবর পেলাম যে হিন্দী ভাষায় বিশিষ্ট কবি শ্রীকান্ত ভার্মা

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন নিউ ইয়ার্কেরই এক হাসপাতালে। কবিতা পাঠের পর তাড়াতাড়ি এক পার্টি সেরে আমরা কয়েকজন দেখতে গেলাম তাঁকে। অ্যালেনের সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় নেই, তবু সে-ও যেতে চাইলো ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে আমরা হাঁটতে হাঁটতে গেলুম সাত আট ব্লক; শ্রীকান্ত তখন অচৈতন্য, আমরা দেখা করে এলুম তাঁর স্ত্রী ও আত্মীয়দের সঙ্গে। আমরা যখন কথা বলছিলুম তখন অ্যালেন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে। শ্রীকান্ত জানতেও পারলো না যে আমেরিকার প্রধান কবি এসেছিল তাকে শুভেচ্ছা জানাতে।

মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টসে তিনরাত্রি কবিতা পাঠের আসরের পর তিনদিন বাদ দিয়ে আবার কবিতা পাঠের ব্যবস্থা শনিবার দুপুরে সেণ্ট্রাল পার্কে। দৈত্যাকার নিউ ইয়র্ক শহরের ফুসফুস এই সেণ্ট্রাল পার্ক। আমাদের কলকাতার ময়দানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, তবে অনেকগুণ বড় এবং ভেতরে নানারকম উদ্যান ও জলাশয় রয়েছে। মুক্তাঙ্গনে কবিতাপাঠ এদেশে অভিনব, এই আইডিয়াটিও অ্যালেনের।

শনিবারের দুপুরটি চমৎকার। ঝলমল করছে রোদ, শীত কমে গেছে। এ দেশে সবাই এমন দিনের জন্য মুখিয়ে থাকে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। আজকের কবিতাপাঠ পুরোপুরি ভারতীয় কবিদের। এমন দিনটিতে কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা আশানুরূপ নয়। এসব উপভোগ্য দিনে কার আর কবিতা শোনার দায় পড়েছে। আজ শ্রোতাদের মধ্যে বিদেশীদের সংখ্যাই বেশি, বিদেশী বলতে অবশ্যই ভারতীয়, তাদের মধ্যেও বেশ কিছু সুন্দরী বঙ্গললনাদের দেখতে পাওয়া গেল। আর কিছু আমেরিকান এসেছেন, যাঁদের সঙ্গে ভারতের কিছু না কিছু যোগাযোগ আছে, নানা কাজে ভারতে গেছেন, কেউ কেউ বাংলা বা হিন্দীও জানেন।

প্রথমে পার্ক সমূহের পরিচালক আমাদের প্রতি স্বাগত ভাষণ দিলেন। অ্যালেনের পরিচয় জানাতে গিয়ে তিনি বললেন, অ্যালেন গীন্‌সবার্গ এযুগের ওয়াল্ট হুইটম্যান!

অ্যালেনের আজ নিজস্ব কবিতা পাঠ নেই, সে শুধু আমার অনুবাদগুলি পড়বে। তার আগে সেও আমাদের স্বাগত জানালো চমকপ্রদ উপায়ে।

সঙ্গে রয়েছে সেই ছোট হারমোনিয়ামটি, সেটি বাজাতে বাজাতে সে একটি গান জুড়ে দিল। তার ভাষা অনেকটা এই রকম ঃ

মার্কিন দেশ সারা দুনিয়ায়
পাঠায় অস্ত্র এবং খাদ্য
অস্থই বেশি খাবার দু'মুঠো
যদিও রয়েছে অনেক সাধ্য···
ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন
বন্ধুরা, কিছু শোনাবেন আজ
ক্রোধের কবিতা, প্রেমের কবিতা,
ইতিহাসে মেশা মায়া কারুকাজ···

লম্বা গানটি শেষ করার পর প্রচুর হাততালি পড়লো। আমি অ্যালেনকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কি গানটি আগে থেকে বানিয়েছিলে? অ্যালেন হেসে বললো, না এই মাত্র বানালুম। শুকনো বক্তৃতার থেকে গান ভালো না? কোথাও কিছু বলবার থাকলে আমি আজকাল গান গেয়ে বলি, আগে থেকে কিছু ভাবি না, যা মনে আসে, প্রথম লাইনটি গাইতে গাইতেই দ্বিতীয় লাইনেই মিল ঠিক এসে যায়। আমার বৌদ্ধ গুরু শিখিয়েছেন যে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সেইটাই খাঁটি।

এদিনের কবিতা পাঠ অংশ নিলেন মোট ছ'জন। সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য হলো দু'জনের। নবনীতা আগের দিনের মতনই তার সহাস্য উপস্থিতিতে কবিতাগুলি পড়তে পড়তে শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে মুগ্ধ করে দিলেন সকলকে। আর শেষ কবি ছিলেন গোপালকৃষ্ণ আদিগা, তিনি প্রবীণ মানুষ, তাঁর কবিতাগুলিও দীর্ঘ, অনুষ্ঠান বেশ দেরিতে শুরু হওয়ায় তিনি যখন কবিতা পড়তে এলেন তখন বিকাল গড়িয়ে এসেছে, শোতা-দর্শক কম। কবিতা পাঠের সময় তাঁর তন্ময়তা সত্যি দেখবার মতন! যারা চলে গেল, তারা বঞ্চিত হলো।

নিউ ইয়র্ক ছেড়ে আমাদের দলটি বেরিয়ে পড়লো অন্যান্য শহর সফরে। ' গাড়িতে যাত্রা, সদস্য সংখ্যা মোট ন'জন, শ্রীযুক্ত আদিগা তাঁর স্ত্রীকে

সঙ্গে এনেছেন, এবং কনিটি ফর ইণ্টারন্যাশন্যাল পোয়েট্রির তু'জন প্রতিনিধি মার্ক নেসডর এবং জো সুলেমান নামে একজন প্রাক্তন টার্কিস যুবক, ঐ তু'জনই গাড়ির চালক। ঢাউস গাড়ি, জায়গার কোনো অকুলান নেই আমাদের প্রথম গন্তব্য বলটিমোর, প্রায় চার ঘণ্টার পথ।

এই সব দেশের হাইওয়েগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে। এমনভাবে তৈরি করা যাতে কোনো শহরের বিন্দু বিসর্গও চোখে না পড়ে, শহরগুলির নাম দেখা যায় শুধু ট্রাফিক সাইনে। তু' পাশে শুধু মাঠ বা জঙ্গল, গাড়ির গতি পঞ্চান্ন মাইলে বাঁধা, দৃশ্য বৈচিত্র্য নেই বলে খানিকবাদে ঘুম পেয়ে যায়, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভারেরও যাতে ঘুম না আসে সে চিন্তাও মাথায় থাকে!

বলটিমোরে আমরা উঠলুম একটি নিরিবিলি ছোট হোটেলে, যার লিফ্‌টখানা বোধহয় সিভিল ওয়ারের আমলের। বৃদ্ধ মালিকটির সৌজন্য খুব আন্তরিক মনে হয়। এখানকার তরুণ-তরুণী কবিরা অপেক্ষা করছিলে আমাদের জন্য, এঁরা আমাদের কবিতার অনুবাদগুলি পড়বেন। কবিতার মধ্যে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ কিংবা ভারতীয় নামের উচ্চারণ নিয়ে খানিকট আলোচনা হলো। আমার একটি কবিতার মধ্যে, ময়দান, চৌরঙ্গি, বড়বাজার এই সব শব্দ ছিল, সেগুলির উচ্চারণ বুঝতে আমার অনুবাদ-পাঠকের বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। অ্যালেন গীন্‌সবার্গের সে অসুবিধে হয়নি, কারণ সে কলকাতা এসে অনেকদিন থেকে গেছে। এই যুবকটি দিনের বেলা একটি গাড়ি-কম্পানিতে সেল্‌সম্যানের কাজ করে, রাত্তিরবেলা কবিতা লেখে ও একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্য করে। উর্দু কবিতার অনুবাদ পাঠ করবে একটি কৃষ্ণাঙ্গী তরুণী, সে স্কুল-শিক্ষিকার কাজ করে। অন্যান্যদের সঙ্গেও মৃত্ব আলাপ হলো।

এখানে অনুষ্ঠান হবে তু'দিন, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে এখানকার ভারতীয়দের একটি প্রতিষ্ঠান এর সহ-উদ্যোক্তা। দর্শকদের মধ্যেও ভারতীয়দের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি। চেনাশুনো কিছু বাঙালীর সঙ্গে দেখা হলো, তাদের মধ্যে রয়েছেন রমেন পাইন ও তাঁর স্ত্রী জুলি ওঁরা এসেছেন একশো মাইলের ওপর গাড়ি চালিয়ে। আমার কবিতা পাঠ প্রথম দিনেই, তা শেষ হবার পরই রমেন ও জুলি ধরে নিয়ে গেলেন তাঁদের

বাড়িতে, রাত বারোটার পর সেখানে পৌঁছে প্রায় শেষ রাত্তির পর্যন্ত আড্ডা হলো।

আমেরিকায় ভারত উৎসব হচ্ছে দেড় বছর ধরে, বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন সময়ে। তবে ভারত সরকারের পক্ষে অন্য দেশে, বিশেষ করে মার্কিন দেশের মতন খরচ সাপেক্ষ দেশের নানান শহরে অনুষ্ঠান-উৎসব-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য সেইজন্য আমেরিকার বিভিন্ন সমিতি, মিউজিয়াম ও অন্যান্য বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হয়েছে। কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানগুলির দায়িত্ব নিয়েছে কমিটি ফর ইণ্টারন্যাশন্যাল পোয়েট্রি, কিন্তু তাদের বেশি টাকা নেই, সুতরাং তারাও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছিল নানান শহরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে। কবিতার ব্যাপার সবাই সাড়া দেয় না। বলটিমোরের পাশেই আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি, সেখানে ভারতীয় কবিতা পাঠের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। শিকাগো কিংবা সানফ্রান্সিসকোর মতন বড় শহর থেকেও কোনো ডাক আসে নি। আবার নেমন্তন্ন এসেছে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে। যেমন নিউ মেক্সিকোর সাণ্টা ফে। আমাদের পরবর্তী আসর সেখানে।

আমেরিকার এক প্রান্তবর্তী রাজ্য নিউ মেক্সিকোর রাজধানী আলবুকার্কি, সেখান থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে সাণ্টা ফে শহর। শহরটি ছোট, কিন্তু উচ্চাঙ্গের নিসর্গ চিত্রের মতন সুন্দর। এখানে আমি আগে কখনো আসিনি।

বলটিমোর থেকে আমরা আলবুকার্কি এলাম বিমানে। আমেরিকার মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে বিমান যাত্রা এখন বেশ মজার হয়েছে। অনেকগুলি বেসরকারি বিমান কম্পানি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মত্ত। সেই জন্য তারা পাল্লা দিয়ে ভাড়াও কমাচ্ছে। অনেক শস্তার ফ্লাইটের নাম হয়েছে পিপ্‌লস এক্সপ্রেস। আগে থেকে টিকিট ফিকিট কাটার দরকার নেই। ফ্লাইটের দশ-পনেরো মিনিট আগে বিমান বন্দরে এসে টিকিট কেটে চড়ে বসলেই হয়। এমনকি এক মিনিট আগে এসে, টিকিট না কেটেও দৌড়ে এসে উঠে পড়া যায়। মাঝপথে ভাড়া নিয়ে নেবে। বিমানযাত্রা ব্যাপারটা এরা প্রায় জল-ভাত করে ফেলেছে।

আলবুকার্কি শহরে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বিরাট কোনো দল ছিল

না, ছিল একটিমাত্র রোগা-পাতলা, প্যান্ট-শার্ট পরা নিরীহ চেহারার, লাজুক-লাজুক তরুণী। তার নাম লিণ্ডা। সেই মেয়েটি যে একাই একশো ত বুঝেছিলুম কিছু পরে।

লিণ্ডা আমাদের জন্য একটা পেল্লায় স্টেশান ওয়াগন ভাড়া করে রেখেছে এবং সে সঙ্গে এনেছে তার নিজস্ব একটি ছোট ট্রাক। তার ট্রাকে চাপানো হলো আমাদের মালপত্র, যাত্রীরা চাপলো স্টেশান ওয়াগনটিতে। লিণ্ড আগে আগে তার ট্রাক চালিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

পথে যেতে যেতে দেখা যায় দূরের পাহাড়। আমরা এসে পড়েছি রকি মাউণ্টেনের এলাকায়। এক জায়গায় দেখি লেখা আছে যে পৃথিবীর দীর্ঘতম ট্রাম লাইন এই দিকে। এখানে ট্রাম লাইন? আমাদের সারথিকে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, এই ট্রাম চলে শূন্য পথে, অর্থাৎ আমরা যাকে রোপওয়ে বলি, সেইরকম ঝোলানো ডুলি বসানো রোপওয়ে চলে গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে।

আমরাও যে ক্রমশ উঁচু দিয়ে উঠছি তা বোঝা যায় একটু একটু শীতে সাণ্টা ফে শহরটির উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফিট, অর্থাৎ দার্জিলিং-এর চেয়েও উঁচুতে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তেমন ঠাণ্ডা নেই।

এই শহরে আমাদের থাকার জায়গাটি এতই সুন্দর যে অবিশ্বাস্য মনে হয়। ঠিক যেন সিনেমা-সিনেমা। একটা টিলার ওপরে অনেকগুলি বাড়ির গুচ্ছ, একে হোটেলও বলা যায় হোটেলের মতন নয়ও। এগুলির নাম কনডিমিনিয়াম। প্রত্যেকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আলাদা বাড়ি, একতলায় সুসজ্জিত বসবার ঘর, দোতলায় দু'টি শয়নকক্ষ, সংলগ্ন দু'টি বাথরুম। রান্নাঘরে বৈদ্যুতিক উনুনের পাশে অতি আধুনিক মাইক্রো ওয়েভ যন্ত্রও রয়েছে। ওপরের তাকে সাজানো রয়েছে সাত রকম চা, তিন রকম কফি, দু' রকম চিনি, দু' রকম দুধ, কয়েক রকম বিস্কুট এবং অনেক রকম মশলা। কেউ এখানে সপরিবারে ছুটি কাটাতে এসে সাতদিন, দশদিন, এক মাসও থেকে যেতে পারে। খরচ নিশ্চয়ই সাংঘাতিক। বসবার ঘরের আসবাবগুলি পুরোনো পুরোনো, মস্ত বড় সোফা, নড়বড়ে কাঠের আলমারি, পোর্সিলিনের অ্যাশট্রে, দেখলেই বোঝা যায় এগুলি অ্যান্টিক, অর্থাৎ খুব দামি। আমাদের

প্রত্যেকের জন্য এরকম এক একটি বাড়ি, কোনো লোকজন নেই, দরজায় চাবি নেই, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম, তারপর সব কিছু নিজস্ব।

পরে জেনেছিলুম, ঐ লিণ্ডা নামের রোগা টিংটিং-এ মেয়েটি এই কনডিমিনিয়াদের মালিকের কাছে কবিতার নাম করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এগুলি আমাদের জন্য বিনা পয়সায় আদায় করেছে।

সান্টা ফে'র একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা এই লিণ্ডা থর্প। লোকের কাছে চেয়ে চিন্তে, চাঁদা তুলে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে। অনেকখানি জমির ওপরে বাড়ি, ভেতরে রয়েছে মাঝারি আকারের একটি রঙ্গমঞ্চ ও দোতলা প্রদর্শনী কক্ষ। এখানে নিয়মিত কবিতা পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, পরীক্ষামূলক নাটক, ছবি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী হয় নিয়মিত, লিণ্ডার সহকারী রয়েছে তিন-চারটি ছেলেমেয়ে। তরুণ লেখক-শিল্পী-নাট্যকর্মীরা প্রায়ই আসে এখানে আড্ডা জমাতে। এখানে আমাদের কবিতা পাঠের আসরে ভারতীয় শ্রোতার সংখ্যা নগণ্য। তিন চারজনের বেশি নয়, বাকি সবাই আমেরিকান, তারা প্রায় সকলেই লেখা বা অনুবাদের ব্যাপারে জড়িত। এখানে একজনও বাঙালী দেখিনি। সান্টা ফে-ই একমাত্র আমেরিকান শহর যেখানে কোনো বাঙালীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো না। যদিও আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা থাকতে পারে না, যেখানে বাঙালী নেই।

সান্টা ফে শহরটি দৃশ্যতই অন্যান্য শহরের থেকে আলাদা। অধিকাংশ বাড়ির সামনেই উঁচু মাটির দেয়াল, সেই মাটি গেরুয়া রঙের। কোনো কোনো বাড়ির সামনের বাগানে কঞ্চির বেড়া। এ সবই পুরোনো স্প্যানিশ কায়দা। বাড়িগুলির মধ্যে আধুনিকতম আরামের ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি সবই রয়েছে। এগুলিকে অ্যাডোবি স্টাইলের বাড়ি বলে, বেশ খরচসাধ্য ব্যাপার, যদিও হঠাৎ যেন আমাদের রাঁচি-হাজারীবাগের কিছু কিছু বাড়ির সঙ্গে মিল খুঁজে পাই।

শহরটি ছোট, কেন্দ্রীয় বাজারের ফুটপাথে এখানকার ইণ্ডিয়ানরা পশরা সাজিয়ে বসে থাকে, নানারকম পাথরের মালা, অলঙ্কার, পুতুল ও জামা-কাপড়। দর করতে গিয়ে দেখি আগুন দাম, দার্জিলিং-এ যেরকম ঝুটো

পাথর পাওয়া যায়, সেইরকম একটি মালার দাম হাজার টাকা। এসবই বড়লোক টুরিস্ট-ভোগ্য জিনিস।

কাছাকাছি পঞ্চাশ-একশো মাইলের আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের রিজার্ভ আছে। একদিন সকালে সেদিকে বেরিয়ে পড়া গেল সদলবলে। সুন্দর পাহাড়ী পথ, পাশ দিয়ে দিয়ে একটি নদী চলেছে, সেই নদীটিই ঢুকে গেছে মেক্সিকোতে। এখানেই ব্রিটিশ লেখক ডি এইচ লরেন্সের একটি র‍্যাঞ্চ আছে। লরেন্সের এক আমেরিকান প্রেমিকা তাঁকে এই র‍্যাঞ্চটি উপহার দিয়েছিল। র‍্যাঞ্চটি এখনো লরেন্সের নামেই আছে, যদিও বর্তমানে সেটির মালিকানা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের।

আমরা প্রথমে রওনা দিলুম সেদিকে। পথের দু'পাশে আরও অনেক র‍্যাঞ্চ পড়লো, দৃশ্যগুলি খুব পরিচিত মনে হয়। জন ওয়েন, গ্যারি কুপার অভিনীত অনেক ওয়েস্টার্ন ছবিতে আমরা এইসব দৃশ্য দেখেছি। শোনা গেল সত্যিই অনেক ওয়েস্টার্ন ছবির শুটিং হয়েছে এখানে।

লরেন্সের র‍্যাঞ্চটি আহা মরি কিছু নয়। এখনো সেখানে পশু পালন ও চাষবাস চলছে, কিন্তু বিস্ময়কর লাগলো লরেন্সের সমাধি মন্দির দেখে। লরেন্সের মৃত্যু হয় প্যারিসে, কিন্তু কবর দেওয়ার বদলে তাকে পোড়ানো হয়েছিল, তাঁর ছাই এনে রাখা হয়েছে এখানে, তার ওপরে মন্দিরের মতন একটা ঘর বানানো হয়েছে। লরেন্সের এই স্মৃতি-মন্দিরের অস্তিত্বের কথা আমার জানা ছিল না। ফারুকী এবং অশোক বাজপেয়ী দু'জনেই লরেন্সের খুব ভক্ত, মাঝে মাঝেই লরেন্সের কবিতার লাইন বলতে লাগলো।

সেখান থেকে ফেরার পথে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের রিজার্ভ দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে লিণ্ডা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। সে মৃদু স্বরে কথা বলে, টুরিস্টরা দলে দলে গিয়ে ওদের বিরক্ত করে। এই ব্যাপারটা লিণ্ডার পছন্দ নয়। ওরা কি চিড়িয়াখানার জীবজন্তু? আমি সঙ্গে সঙ্গে লিণ্ডার সঙ্গে একমত হলাম। এইভাবে গাঁক গাঁক করে গাড়ি হাঁকিয়ে আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে উৎপাত করা অত্যন্ত অরুচিকর। সুতরাং সেদিকে না গিয়ে আমরা পথের পাশে একটি ছোট শহরে মধ্যাহ্ন ভোজন করে অলস ভাবে পায়ে হেঁটে ঘুরে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিলাম।

সান্টা ফে-তে পৌঁছেই শুনেছিলাম এখানে একটি ভারতীয় দম্পতি আমাদের অগ্রিম নৈশভোজের নেমন্তন্ন করে রেখেছেন। দুই সন্ধ্যার কবিতা-পাঠের আসরে কিন্তু সেই দম্পতির একজনেরও দেখা পাইনি। এইরকম নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা লাগে। কিন্তু সকলেই যাচ্ছে বলে আমাকেও যেতে হলো। উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা বিচিত্র ভারতীয়। ভদ্রমহিলাটি আফগানিস্তানের মেয়ে, তবে বেশ কয়েক বছর দিল্লীতে থেকে নাচ শিখেছেন, এখানে ভারতীয় নাচের ইস্কুল খুলেছেন। স্বামীটি পুরো দস্তুর আমেরিকান, যদিও সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, পায়ে কোলাপুরি চটি, সে সেতার বাজায়, ভারতে অনেকবার এসেছে, কলকাতায় থেকে গেছে এক বছর, কিছুদিন নিখিল ব্যানার্জির কাছে নাড়া বেঁধেছিল। স্ত্রীর তুলনায় স্বামীটিকে অনেক কমবয়স্ক মনে হয়। এই যুবকটির মতন এমন বুদ্ধিদীপ্ত ও অহংকারী মুখ আমি কমই দেখেছি। আমরা যখন তার বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকছি, আমাদের নাম শুনেই সে বলে দিতে লাগলো আমরা কে কোন্ ভাষায় লিখি। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে পুরো বাক্যটি শেষ করতে দেয় না, মাঝপথেই বুঝে নিয়ে সে টক্ করে উত্তর দিয়ে দেয়। এরকম লোকের সঙ্গে কথা চালানো মুশকিল। অবশ্য সে কীরকম সেতার বাজায় তা জানা গেল না।

এ বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা অভিনব। প্রথমে সুরা পরিবেশন করা হলো আমেরিকান কায়দায়, কিন্তু ডিনারের স্টাইলটি সম্ভবত আফগানী। ডাইনিং রুমের দরজার কাছে ঐ দম্পতির একমাত্র কন্যা, ষোলো-সতেরো বছর বয়েস, তার হাতে একটি জলের ঝারি ও তোয়ালে। সে প্রতিটি অতিথির হাত ধুইয়ে-মুছিয়ে দিচ্ছে। ঘরে কোনো চেয়ার টেবিল নেই। কার্পেটের ওপর বড় বড় পেতলের পরাত, তার কোনোটাতে বিরিয়ানি-গোস্ত, কোনোটাতে রুটি, স্যালাড, আচার ইত্যাদি। প্রত্যেকের হাতে একটি করে প্লেট তুলে দেওয়া হলো, কাঁটা-চামচের কোনো বালাই নেই, ঐসব পরাত থেকে যার যা ইচ্ছে খাবার তুলে খেতে হবে, দ্বিতীয়বার তুলতে হলে এঁটো হাতেই চলবে। এই ব্যবস্থায় আমাদের কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু সাহেব-মেমদের কারুর কারুর হাত দিয়ে খেতে গিয়ে বেশ বে-কায়দায়

াড়তে হলো। আমার পাশেই একজন একজন দীর্ঘকায় প্রবীণ ব্যক্তি সেছিলেন, তিনি একজন খ্যাতনামা অনুবাদক, বললেন, কী আশ্চর্য কথা, মামরা কাঁটা-চামচে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এমনকি চাইনীজদের মতন চপ ষ্টক দিয়েও খেতে পারি, কিন্তু হাত দিয়ে খেতে ভুলে গেছি !

আমি ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে, মনে মনে বললুম, ন্যাকামি ! আমাদের প্র-পূর্বপুরুষ বাঁদরদের অনেক দোষ-গুণ এখনো আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে, এমনকি সাহেবদের মধ্যেও রয়েছে, শুধু হাত দিয়ে খাওয়াটাই ওরা ভুলে গেছে, তা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

সান্টা ফে ছাড়ার সময় মনে হলো, এই শহরটিতে আরও দু' চারদিন থেকে যেতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু উপায় নেই। এর পরেই থেকে যেতে হবে লস এঞ্জেলিসে। আবার প্লেন ধরতে হবে।

রকি পর্বতমালার ওপর দিকে উড়ে আমরা লস এঞ্জেলিসে এসে পৌঁছোলুম বিকেলের দিকে। আমাদের জন্য হিলটন হোটেলে জায়গা ঠিক করা আছে, কাছেই দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়ানো ক্যাম্পাস। সারা সন্ধে কিছুই করার নেই, ঘরে বসে টি. ভি. দেখা ছাড়া।

আমাদের দলের বয়ঃজ্যেষ্ঠ সদস্য শ্রীযুক্ত আদিগা এত ঘোরাঘুরিতে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় খাবার ছাড়া অন্য কিছু তাঁর মুখে রোচে না। তাঁর স্ত্রী হয় ইংরিজি জানেন না অথবা খুবই লাজুক, তাঁর মুখ দিয়ে আমরা একটা-দুটোর বেশি শব্দ শুনিনি। আদিগা এক সময় ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন, একটি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার করেছেন। এমনিতে বেশ রসিক মানুষ, কিন্তু উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে কাতর হয়ে আছেন বলে তাঁকে আড্ডায় পাওয়া যায় না।

অশোক বাজপেয়ীর সঙ্গে ভারত সরকারের কয়েকজন কর্মচারি দেখা করতে এলো, তারপর ওরা একসঙ্গে কোথায় যেন গেল, অরুণ কোলাটকর গেল ওদের সঙ্গে। শামসুর রহমান ফারুকিও পেশায় রাজ কর্মচারি, আই এ এস, ভারত সরকারের কোনো দফতরের যুগ্ম সচিব, তার স্বভাবটি ঠিক আড্ডাবাজ ধরনের নয়, সে গেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে।

বাকি রইলো কেদারনাথ সিং। তার জীবিকা যদিও অধ্যাপনা, দিল্লি

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী পড়ায়, কিন্তু মানুষটি লাজুক প্রকৃতির, এই প্রথম তার বিদেশ সফর। একা একা সে রাস্তায় বেরুতে চায় না, তাছাড়া কে কেন আগে থেকেই তাকে সাবধান করে দিয়েছে যে লস এঞ্জেলিসের পথে ঘাটে গুণ্ডা ঘুরে বেড়ায়, সন্ধের পর মোটেই নিরাপদ নয়।

এই হোটেলের ব্যবস্থাপনা এমনিতে ভালো হলেও, এখানে এখন আংশিক ধর্মঘট চলছে, তাই ঘরে বসে এক কাপ কফি পাওয়ারও উপায় নেই। কেদারনাথ আমাকে এসে বললো, খুব কফি খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও কি হেঁটে যাওয়া যেতে পারে? ভয়ের কিছু আছে? তুমি তো আগে এসেছো, তুমি এখানকার রাস্তা চেনো, একটু যাবে আমার সঙ্গে?

আমি লস এঞ্জেলিসে আগে দু'বার এসেছি বটে কিন্তু এখানকার রাস্তা চিনি না, এই প্রকাণ্ড শহরের দিশে পাওয়া খুব শক্ত। তবে খানিকটা হেঁটে আসা যেতে পারে।

কেদার জিজ্ঞেস করলো, এখানকার রাস্তা দিয়ে হাঁটা নিরাপদ তো?

আমি হেসে বললুম, তা বলে কি সব সময় ছুরি মারামারি হচ্ছে? কলকাতা-দিল্লির রাস্তায় কি গুণ্ডামি হয় না? এখানে তার চেয়ে একটু বেশি হয় হয়তো! রাস্তা যথারীতি পথচারী বর্জিত। চলন্ত গাড়ি ছাড়া মানুষের মুখ দেখা যায় না। শন শন করে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া, বেড়াবার পক্ষে সময়টা তেমন উপযোগী নয়। খানিক দূর গিয়েই ফিরতে হলো। ফেরার পথে এক রাস্তার মোড়ে দুটি লোক হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, লাগবে? লাগবে?

আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাতে তারা খুব অবাক। কোকেন বা গাঁজার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছাড়া দুটি ব্যাটাছেলে শুধু শুধু রাস্তা দিয়ে হাঁটছে কেন?

এর পরে একটা কফির দোকানে বসে সময় কাটানো গেল কিছুক্ষণ। সেই দোকানে ভাত পাওয়া যায় শুনে কেদার খুব খুশি। সে নিরামিষ খায়, ম্লেচ্ছ খাদ্যে তার খুব অসুবিধে।

পরের দিন আবহাওয়া খুব ভালো হয়ে গেল। ঝকঝকে রোদ, শীতের চিহ্নমাত্র নেই। এমন দিনে সাহেব-মেমরা বাইরে বেরিয়ে পড়ে, সমুদ্রের ধারে গিয়ে শুয়ে থাকে, সেইজন্যই বোধহয় সন্ধে বেলা কবিতা পাঠের আসরে আশানুরূপ শ্রোতা হলো না। কিন্তু ছোট আসরে কবিতা পাঠ বেশ জমে গেল।

সে রাত্রে আমার আর হোটেলে ফেরা হলো না, একশো মাইল দূর থেকে এসেছে ডাক্তার মদন মুখোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী ডলি, তাদের সঙ্গে চলে গেলুম বেকারস ফিল্‌ডে। মদন মুখোপাধ্যায় এদেশে আছে অনেকদিন, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, এমন ভদ্র ও সজ্জন খুব কম দেখা যায়। তার স্ত্রী ডলিও যেমন হাসিখুশি, তেমনই কাজের মেয়ে ও অতিথি পরায়ণ, এই চমৎকার দম্পতির বাড়িতে আমি আগেও এসে থেকে গেছি।

লস এঞ্জেলিসে দ্রষ্টব্য জিনিস বহু আছে, কিন্তু আমার সেদিকে মন ছিল না। এখানে দ্বিতীয় দিনটা সারাদিনই ফাঁকা পাওয়া গিয়েছিল, আমাদের দলের অন্য কবিরা বেড়াতে গেলো, আমি রয়ে গেলুম হোটেলে, আমার মাথায় ধারাবাহিক উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিমের' ইনস্টলমেণ্ট লেখার চিন্তা। না পাঠাতে পারলে সম্পাদকের কাছে বকুনি খেতে হবে। বেড়াতে না গিয়ে আমি হোটেলে বসে বসে উপন্যাসের কিস্তি লিখবো শুনে অন্যান্য কবিরা অবাক। ওরা চলে যাবার পর আমি কাগজ কলম নিয়ে বসে, মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলুম দুই বাংলায়।

সুতরাং মদনের বাড়ি গেলুম বেশ হাল্কা মনে, লেখা শেষ হয়ে গেছে মদন নিজেও দেশ পত্রিকায় নিয়মিত লেখে, ওর ওপরেই ভার দিলুম আমার লেখা ডাকে পাঠাবার। তারপর ওর সঙ্গে বেড়াতে গেলাম পাহাড়ে সেখানে তার একটি শৈলাবাস আছে, যেটি সারা বছর প্রায় খালিই পড়ে থাকে।

মদন ও ডলি আমাকে লস এঞ্জেলিসে ফিরিয়ে নিয়ে এলো সরাসরি এক রেস্তোরাঁয়। এটির নাম ইচি ফুট, এখানে মধ্যাহ্ন ভোজের সঙ্গে কবিতা পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রোতারা টিকিট কেটে এসেছে, ভোজন ও কবিতা শ্রবণ এক সঙ্গে। আধুনিক ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে প্রত্যেককে কিছু বলার

ন্যও অনুরোধ ছিল। কিন্তু এখানে, কবিতা পড়তে বা কিছু বলতে আমার
ন লাগলো না। অনেকটা দায়সারাভাবে চুকিয়ে দিলুম, কেন যেন মনে
চ্ছিল, শ্রোতাদের আগ্রহ কম।

বোলডারে আমাদের আলাদা আলাদা থাকার ব্যবস্থা, বব রোজেনথাল
।মাকে আগেই বলে রেখেছিল যে একটি বাঙালি পরিবার আমাকে রাখতে
।গ্রহী। ওখানে পৌঁছোবার খানিকটা আগে শুনলুম, সেই বাঙালিটির
াম শুভেন্দু দত্ত। আমি চমৎকৃত ও খুশী। শুভেন্দু আমার ছাত্র বয়সের
ন্ধু, বহুদিন দেখা নেই তার সঙ্গে, এখন সে এদেশের খ্যাতিমান অধ্যাপক,
াহেবদের ইঞ্জিনিয়ারিং শেখায়! তার সঙ্গে এরকম অকস্মাৎ যোগাযোগ
ত্যি আনন্দের ব্যাপার। শুভেন্দুর স্ত্রীর সঙ্গে আমার আগে ভালো
ারিচয় হয়নি, এখন আবার শুভেন্দুর এক শ্যালিকাও অফ্রিকা থেকে এ
াড়িতে অতিথি হয়ে আছে। বিশাখা ও বিপাশা নাম্নী দুই সুন্দরী তরুণীর
াহচর্যে যেন চোখের নিমেষে কেটে গেল দুটি দিন।

শুভেন্দুদের বাড়িটি পাহাড়ের গায়ে। হিমালয়ে বেড়াতে গেলে আমরা
য-রকম ডাক বাংলোতে থাকি, সেইরকম মনোহর পরিবেশে ওদের বাড়ি।
শুভেন্দু আবার একদিন আমাকে নিয়ে গেল কলোরাডোর বিখ্যাত অরণ্য-
পর্বত নিসর্গ দেখাবার জন্য। সে দৃশ্য বর্ণনা করবার জায়গা এটা নয়।
তবে একটা বিস্ময়ের কথা বলতেই হয়। তুষার-ঢাকা এক একটা পাহাড়
চূড়ার দিকে এগোতে এগোতে ক্রমশ উঠে গেলাম এগারো হাজার ফিট
উচ্চতায়। এত উঁচুতেও হাইওয়ে রয়েছে, দু' পাশে জমাট বরফের দেয়াল।
গাড়ি থেকে নেমে ঘোরাঘুরি করলুম, বরফের গায়ে হাত রাখলুম, আমার
ায়ে শুধু একটা হাফ শার্ট, অথচ শীত করলো না! এটা কী রকম
ভৌগোলিক ধাঁধা কে জানে!

বোলডারে এসে আবার দেখা পেলুম অ্যালেন গীনসবার্গের।

এখানে নরোপা ইনষ্টিটিউট নামে একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে।
ংস্কৃতি কেন্দ্র বলা যায়, যেখানে রয়েছে আধুনিক, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন একটি
বৌদ্ধ গুম্ফা, ধ্যান ও যোগ সাধনার ছোট ছোট কক্ষ, বৌদ্ধ দর্শন এবং
াহিত্য শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা। অ্যালেন এই প্রতিষ্ঠানের শিষ্যও বটে,

গুরুও বটে। এখানে সে সন্ধান পেয়েছে তার গুরুর, এখানে সে যোগ ও দর্শনের পাঠ নিয়েছে আবার অনেক বছর ধরে এখানে সাহিত্য পড়িয়েছে। এই জুনে তার শিক্ষকতা শেষ হলো, এর পরে সে ব্রুকলিন কলেজে সম্মানিত অতিথি অধ্যাপকের পদ পাচ্ছে।

এই নরোপা ইনস্টিটিউট-ই আমাদের কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ জানিয়েছে কলোরাডোতে। দিনের বেলা অ্যালেন নিজেই আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ঘুরিয়ে দেখালো। বৌদ্ধ গুম্ফাটিতে আমি কয়েকটি বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখলাম, এর আগে আর কোন গুম্ফায় আমি তা দেখিনি। প্রত্যেক গুম্ফাতেই অনেক পাণ্ডুলিপি থাকে, আমার ধারণা হলো, কিছুদিন পর পাণ্ডুলিপির জেরক্স কপিও দেখতে পাবো। ধ্যান কক্ষগুলি কোনোটি গোলাপি, কোনটি নীল, কোনটি বাদামি রঙের। এক এক রকম মানসিক অবস্থার জন্য এক এক রঙের কক্ষ নির্দিষ্ট। একটি ক্লাস রুমে দেখলুম, রীতিমতন সংস্কৃত ভাষা শেখানো হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রী সাত-আট জন। ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা অক্ষরগুলি আমি একবর্ণ বুঝতে পারলুম না, কারণ, এই সংস্কৃত দেবনাগরী হরফে নয়, তিব্বতী হরফে।

অ্যালেনের দৃষ্টান্তেই সম্ভবত সারা দেশ থেকে সাহিত্য মনস্ক অনেক তরুণ-তরুণী এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আসে। কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, কারুর কারুর পোশাক ও চুল পাংকদের মতন। আমেরিকার ছেলেমেয়েরা যখন যে-জিনিষটা ধরে, তখন গভীরভাবে ধরে। একটি বাড়ির সবুজ ঘাস ভরা লনে মনোরম রোদ্দুরে মধ্যাহ্নভোজের সময় একটি আন্দাজ বছর তিরিশেক বয়েসের যুবক কবি অ্যালেনের সঙ্গে তিব্বতী দর্শন ও সিদ্ধাচার্যদের বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দিয়েছিল। আমি তিব্বতী দর্শন বিষয়ে কিছুই জানি না, চুপ করে শুনছিলুম, এক সময় নিছক কথার কথা হিসেবে সেই যুবকটিকে বললুম, জানো, এক সময় উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু বৌদ্ধ হিন্দুদের অত্যাচারে লুকিয়ে থেকে সাংকেতিক ভাষায় কিছু দোহা বা বা গান লিখেছিল···। আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে সে বললো, হ্যাঁ জানি চর্যাপদ তো? সান্ধ্য ভাষায় লেখা, লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ···। আমি যাকে বলে স্তম্ভিত!

এখানে কবিতা পাঠের আসর বেশ জমজমাট হলো। শ্রোতাদের
গ্রহ ও অভিনিবেশে একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে, তাতে কবিতার শব্দগুলি
ক সুরে বাজে। তখন মনে হয়, সব মিলিয়ে একজনই শ্রোতা।

ইংরিজি অনুবাদগুলি যিনি পাঠ করলেন তারাও সকলেই কবি। অ্যান
াল্ডমান নামে এক বিদ্যুৎশিখাময়ী নারীর উৎসাহটি সবচেয়ে বেশি, এই
রাপা ইসস্টিটিউট যেন তারই রাজ্য। অ্যালেনের একটি কবিতা আছে
: মেয়েটিকে নিয়ে। সে কবিতা পাঠ করে প্রায় নাচের ভঙ্গিতে।

এখানেও অ্যালেন পড়ে দিল আমার কবিতার অনুবাদগুলি। অনুষ্ঠান
য়ে অ্যালেন হেসে বললো, আমরা দু'জনে বেশ একটা টিম হয়ে গেছি,
ভাবে আমরা শহরে শহরে ঘুরলে পারি!

বোলডার ছেড়ে যেতেও একটু একটু মনোকষ্ট হচ্ছিল। এমন সুন্দর
য়গায় আরও কয়েকটা দিন থাকতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমাদের যেন
রা পার্টির মতন অবস্থা। যেতে হবে, যেতেই হবে। এখান থেকেই
ালেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলাম, এ যাত্রায় আর বোধহয় দেখা
় না।

সাময়িকভাবে আমাদের ফিরে আসতে হলো নিউ ইয়র্কে। আবার
টাদিকে ফিরে আসতে হবে ডেট্রয়েটে। পুরো দলটির নেমন্তন্ন নেই,
হিন্দী, মারাঠী, ও বাংলার তিনজন এবং অশোক বাজপেয়িতো আছেই।

একদিন পরেই আমরা চারজন ডেট্রয়েটে এসে পৌঁছোলুম দুপুরের দিকে।
ারপোর্ট থেকে সোজা আমাদের নিয়ে আসা হলো একটি ভারতীয়
স্তোরাঁয়। এইসব রেস্তোরাঁর মালিক পাকিস্তানী বা বাংলাদেশীও
 পারে। বিদেশে প্রাক্তন ভারতীয় উমমহাদেশের সবাই এখনো
ারতীয় হিসেবেও পরিচিত। এক্ষেত্রে দোকানটির মালিক বাংলাদেশী,
গাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন, দাদা?

এই রেস্তোরাঁতেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিল তনুশ্রী ও প্রভাত দত্ত,
। দু'জনেই কবি। তনুশ্রী তার বিবাহ পূর্ব নাম তনুশ্রী ভট্টাচার্য নামেই
খ, আর প্রভাত বিদেশে থেকেই প্রচুর নিষ্ঠার সঙ্গে 'অতলান্তিক' নামে
টি বাংলা পত্রিকা বার করে আসছে অনেকদিন। ওরা এসেছে ওহায়োর

কলাম্বাস শহর থেকে, চার ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে কবিতা পাঠ শুনতে ত
বটেই, তারপর আমাকে নিয়ে যাবে ওদের বাড়িতে।

ওদের এই প্রস্তাব শুনে অশোক বাজপেয়ী কৃত্রিম কোপের সঙ্গে ব
উঠলো, এ কী ব্যাপার হচ্ছে, সুনীল? যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই এক
সুন্দরী মহিলা ও একজন ঝকঝকে পুরুষ এসে তোমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে
আমাদের কাছ থেকে। আমরা 'দেশ' পত্রিকায় লিখি না বলেই ি
আমাদের কেউ ডাকে না?

প্রভাতের কাছে 'দেশ' দু' একটি টাটকা সংখ্যা ছিল, সবাই আগ্রহে
সঙ্গে দেখতে লাগলো। সকলেই মত প্রকাশ করলো যে 'দেশ'-এর মত
পত্রিকা অন্য কোন ভাষাতে নেই। কেদার নাথ সিং বাংলা পড়তে পারে
সে পাতা উল্টে দেখে রায় দিল যে আমার উপন্যাসের ইনস্টলমেন্ট লেখা
কাহিনীটি আজগুবি নয়।

ডেট্রয়েটের কবিতা পাঠের আসর অন্যান্য কয়েকটি জায়গার তুলনা
বেশ জমজমাট হলো, বলটিমোর বা লস এঞ্জেলিসের তুলনায় তো অনে
সার্থক বটেই। আমেরিকার কোন কবিতা পাঠের আসরেই 'আর একটা
পড়ুন' বলে কেউ চ্যাঁচায় না। সব কিছুই পূর্ব নির্দ্দিষ্ট। তবে, এখানে
কবিদের সংখ্যা কম বলে আমাদের বেশি করে কবিতা পড়তে হয়েছিল, বে
রাত হয়ে যাওয়াতে শ্রোতারা কেউ উঠে গেল না তো!

মাধুরী হাজরা এখানকার অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁর বাড়ি
রাত্রির নেমন্তন্ন এবং সেখানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। প্রভাত-তনুশ্রীর ই
রাত্তিরের নেমন্তন্ন খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি মাঝ রাত্তিরে, তারপর সা
রাতের ড্রাইভ। কিন্তু সেটা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। মাধু
হাজরার স্বামী-পুত্র ছাড়াও তাঁর মা-বাবা, দেওর, ভাই-বোন সবা
কাছাকাছি থাকেন। আরও অনেকে এসেছেন, সব মিলিয়ে বিরাট হইচ
প্রচুর খাওয়া দাওয়া। রাত দুটোর সময় শুতে গিয়ে ভোর হতে না হ
বেরিয়ে পড়া।

পরের রাতে প্রভাত-তনুশ্রীদের বাড়িতেও আবার পার্টি। আ
রাত্রি জাগরণ। এক একটা শহরে বিছানা গরম হতে না হতেই ত

চলে যাচ্ছি অন্য শহরে। একদিন অন্তরই নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। তার মধ্যে এই বাড়িতে এসেই অনেকটা কলকাতার ছোঁওয়া পাওয়া গেল। তনুশ্রীর বাবা, দুই ভাই, এক ভাইয়ের স্ত্রী সদ্য এসেছে কলকাতা থেকে, গায়ে এখনো কলকাতার গন্ধ লেগে আছে, তাঁদের দেখে আমার যেমন ভালো লাগলো, তাঁরাও আমাকে বেশি বেশি যত্ন করতে লাগলেন। ব্যস্ততার জন্য আমাকে অবিলম্বে চলে যেতে হয়, যাবার সময় মনে হয় আবার ফিরে আসবো এমন সুন্দর জায়গায়।

আমাদের শেষ অনুষ্ঠান হার্ভার্ডে। দলের অন্যান্যরা আবার নিউ ইয়র্ক হুঁয়ে আলাদাভাবে সেখানে চলে গেছে। আমাকে যেতে হলো কলাম্বাস থেকেই সোজা। বস্টন এয়ারপোর্টে একটি রোগা পাতলা যুবক এসে বললো, আমার নাম রাহুল রায়। আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন!

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আবার অন্য পরিবেশ, অন্য মানুষ।

চার্লস নদীর একপাশে বস্টন অন্যপাশে কেমব্রিজ। রাহুলরা থাকে কেমব্রিজে। তার স্ত্রী চন্দ্রা ও একটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর শিশুকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। তাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে সুটকেস খোলার আগেই তিনটি যুবক এসে হাজির হলো।

নিউ ইয়র্কে থাকার সময় আমার হোটেলে একদিন তিন গৌতম আড্ডা মারতে এসেছিল, গৌতম রায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম দত্ত। তিনজনই সুদর্শন, বুদ্ধিমান, চৌকোশ ও হাস্য-পরিহাস প্রবণ। এদের মধ্যে গৌতম রায়ের ভালো নাম ডঃ কল্যাণ রায়, সে নিউ ইয়র্কের কোনো কলেজে ইংরিজি পড়ায়, তার লেখা ইংরিজি কবিতা ওদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার প্রবল টান, বাংলা কবিতা যখন তখন কোট করে। কিছু আধুনিক বাংলা কবিতা ইংরিজিতে অনুবাদও করেছে।

ছুটির দিন বলে এই তিন গৌতম নিউ ইয়র্ক থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা বস্টনে উপস্থিত, পাঁচ-ছ' ঘণ্টার ড্রাইভ বোধহয়। আমি কোথায় উঠবো, তা আগেই এখানে টেলিফোন করে জেনে নিয়েছিল। জমে গেল তুমুল আড্ডা।

সন্ধেবেলাতেই কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। হার্ভার্ডের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করেছে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান, কল্যাণ চক্রবর্তী নামে একজন আই এ এস অফিসার হার্ভার্ডে গবেষণারত, তিনিই যোগাযোগটি ঘটিয়েছেন। কিন্তু কবি-সম্মেলনের পক্ষে দিনটি সুবিধেজনক নয়, এখানে এখন লং উইক এণ্ড চলছে, অর্থাৎ শনি-রবির সঙ্গে সোমবারটাও ছুটি, এরকম লম্বা ছুটির সুযোগ পেলে অনেকেই শহর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। বিকেল থেকে আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এসব সত্ত্বেও এত শ্রোতা সমাগম সত্যি বিস্ময়কর, দেখতে দেখতে হল প্রায় অর্ধেক ভরে গেল। এদেশের কবিতা-পাঠের আসরে আড়াইশো তিনশো শ্রোতাই যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয়, এই সন্ধ্যায় শ্রোতার সংখ্যা তারচেয়ে কিছু বেশিই মনে হলো।

বড় গৌতম ওরফে ডঃ কল্যাণ রায় আমার দু'একটি কবিতা অনুবাদ করেছে, তার ইচ্ছে অনুবাদগুলি সে-ই পাঠ করে। এখানকার প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই আমাদের কবিতার অনুবাদের কপি আগে থেকে পাঠানো ছিল, নির্দিষ্ট এক একজন স্থানীয় কবি এক একজনের অনুবাদ পাঠ করার জন্য আগে থেকেই তৈরী হয়ে থাকছেন। হার্ভার্ডে যিনি আমার অনুবাদ পড়বেন বলে ঠিক করা আছে তিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি। তাঁকে যখন বললুম, আমার দু'একটি কবিতা অন্য একজন পড়তে চান, তিনি ঠিক খুশী হলেন না মনে হলো। তিনি ক্ষুণ্ণভাবে বললেন, আমি এগুলো আগে থেকেই অনেকবার পড়ে রেডি হয়ে এসেছি···। আমি তখন বললুম, আপনি এগুলো পড়ুন, আর একটি নতুন কবিতার অনুবাদ পড়বেন আমার বাঙালি বন্ধুটি। তিনি তাতে রাজি হলেন। কল্যাণ অনুবাদ করেছে "কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে", সেটি একটি দীর্ঘ কবিতা, তাই সেটার বাংলাটা আর আমি পড়লুম না সময় বাঁচাবার জন্য।

এই ভারতীয় কবির দলটিতে প্রত্যেকের কবিতার সুরই আলাদা হিন্দী কবি কেদারনাথ সিং-এর লেখাগুলি বর্ণনামূলক নয়, উপমাবহুলও নয় বাস্তব ঘটনার সঙ্গে অ্যাবস্ট্রাকশান মেশানো, এবং গভীর চিন্তার ছায় আছে। মহারাষ্ট্রের অরুণ কোলাটকারের কবিতাগুলি আবার খুবই বর্ণনামূলক। কখনো মজার, কখনো শ্লেষপূর্ণ, শুনলেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

হয়, শ্রোতারা হাসে, তার কবিতার সমসাময়িক ভারতীয় বাস্তবতার বিদ্রূপমাখা ছবি ফুটে ওঠে। উর্দু কবি শামস্থর রহমান ফারুকির কবিতাগুলি ছোট ছোট, সূক্ষ্ম রসের, কোনো কোনোটি গজল, শুনতে ভালো লাগে, তবে এইসব কবিতা অনুবাদে মার খায়। গোপালকৃষ্ণ আদিগার কবিতা-গুলি আবার ঠিক বিপরীত, তাঁর কবিতাগুলি লম্বা লম্বা, সামাজিক অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক, একটু উচ্চকণ্ঠ। তাঁর কবিতা-গুলির মধ্যে তথাকথিত কিছু কিছু অশ্লীল শব্দও আছে, পাকা চুল মাথায় এই প্রবীণ কবির মুখে সেইরকম শব্দ শুনে কেউ কেউ চমকে চমকে ওঠেন। এমার্জেন্সি ও ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে তাঁর একটি চড়া সুরের কবিতা শুনে কলোরাডোর কিছু কিছু ভারতীয় আপত্তি জানিয়েছিল।

অমৃতা প্রীতম না এলেও সফরের সময় কবির সংখ্যা ছ'জনই ছিল। অশোক বাজপেয়ী নিজেও হিন্দী ভাষার একজন উল্লেখযোগ্য কবি, সে-ও কবিতা পাঠে অংশ নিয়েছে, তার ছোট ছোট নিটোল প্রেমের কবিতাগুলি বেশ সুখশ্রাব্য।

হার্ভার্ডের শ্রোতারা অত্যন্ত মনোযোগী। কবিতা পাঠ শেষ হবার পরেও অনেকে থেকে গিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন, খোঁজ নিলেন সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে, কেউ কেউ আমাদের কবিতার অনুবাদের কপি চেয়ে নিলেন। একজন প্রৌঢ়া মেমসাহেব কল্যাণ রায়কে বললেন, তোমার কবিতা পাঠ সুন্দর হয়েছে, কিন্তু তোমার ইংরিজিতে একটু যেন স্কটিশ অ্যাকসেন্ট আছে! শুনে আমরা অবাক। কল্যাণ সলজ্জ-ভাবে জানালো, আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, আমার ওপর প্রভাব থাকতে পারে, আমি বিয়ে করেছি একটি স্কটিশ মেয়েকে!

হার্ভার্ডের শ্রোতারা অন্য একটি দিক থেকেও আলাদা। এর আগে আমরা অন্যান্য যে সব শহরে কবিতা পড়ে এসেছি, সেখানে দেখেছি, এদেশি শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। কেউ কেউ বেদ-উপনিষদের কথা জানে, কারুর কারুর ধারণা ভারতীয় কবিতা সবই ধর্ম-বিষয়ক। আধুনিক ভারতীয় কবিদের কবিতা শুনে তারা অবাক হয়ে গেছে। হার্ভার্ডে অবশ্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কবিতার

বিবর্তন সম্পর্কে কেউ কেউ কিছু জানেন বোঝা গেল। ভারতীয় কবিদের এই আমেরিকা সফরে এখানকার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আধুনিক ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণার সৃষ্টি করা গেছে, এইটুকুই যা লাভ। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের পরই দু'চারজন আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছেন, তোমাদের কবিতার অনুবাদ বই নেই ? কোথায় পাওয়া যায় ? এদেশে পাওয়া যায় না কেন ?

সেই রাতে চন্দ্রা ও রাহুলের আতিথেয়তায় ওদের ফ্ল্যাটে প্রচুর খাদ্য পানীয় সহযোগে আর একটি কবিতা পাঠের আসর বসলো। এখানে শুধু নির্ভেজাল বাংলা কবিতা। তিন গৌতমের মধ্যে দু'জন তাদের কবিতা শোনালো, গৌরী দত্ত নামে একজন মহিলা ডাক্তার তিনিও লাজুক লাজুক গলায় শোনালেন তাঁর নিজের কবিতা, আমাকেও পড়তে হলো কয়েকটি। যেহেতু সন্ধেবেলা আমি 'কবির মৃত্যু' পড়িনি, সেইজন্য ওদের সকলের অনুরোধে পড়তে শুরু করলুম সেটা। পড়তে পড়তে আমার ভালো লেগে গেল, তারপর আমি স্বেচ্ছায় পড়ে যেতে লাগলুম একটার পর একটা। কবিতার প্রায় প্রতিটি শব্দই যাদের বোধগম্য, তাদের সামনে কবিতা পাঠের আনন্দই আলাদা।

মধ্যরাত পেরিয়ে আমাদের আড্ডা গড়িয়ে চললো ভোর রাতের দিকে।

হার্ভার্ডে সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম আমার পূর্ব পরিচিতা চিত্রিতা ব্যানার্জি-আবদুল্লা ও তাঁর বান্ধবী এলিজাবেথ ভোগ্‌লকে, এই মার্কিন তরুণীটি ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী, এর সঙ্গেও একবার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। এরা দু'জন বলেছিল, তুমি কি একদিন এখানে থেকেই পালাবে ? তা চলবে না। আরও কয়েকদিন থেকে যেতে হবে হার্ভার্ডে।

সুতরাং পরদিন আমাদের দলের আর সবাই এখান থেকে প্রস্থান করলেও আমি আরও কয়েকদিন রয়ে গেলুম কেম্‌ব্রিজে।

কিন্তু সে তো অন্য গল্প !

একুশ

ওখরিড নামে যে একটি সুবৃহৎ হ্রদ আছে কোথাও তা আমার জানা ছিল না। আমার বাড়িতে যে অ্যাটলাস আছে, তাতে স্ট্রুগা নামে কোনো শহরের নাম তন্নতন্ন করেও খুঁজে পাওয়া গেল না। ম্যাসিডোনিয়ার কথা আমি পড়েছি ইতিহাসে, ভূগোলে নয়। ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের ছেলে দুঃসাহসী আলেকজাণ্ডার দিকবিজয় করতে করতে ভারতের সিন্ধু নদীর পারে এসে থেমেছিলেন। সেই ম্যাসিডোনিয়া যে এখন আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার একটি রিপাবলিক, সরলভাবে সত্যি কথাটা স্বীকার করছি, তা আমি জানতুম না আগে।

সেই ম্যাসিডোনিয়ার ওখরিড হ্রদের তীরে স্ট্রুগা নামে অতি ছোট্ট একটি শহরের কবি-সম্মেলনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলাম হঠাৎ। সেখানকার বাৎসরিক কবি সম্মেলনের পঁচিশ বছর পূর্তি হচ্ছে, সেই উপলক্ষে পৃথিবীর বহু দেশের কবিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা দেবেন আতিথেয়তা, ভারত সরকারের সংস্কৃতি সম্বন্ধ পরিষদ (আই সি সি আর) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রস্তাব পাঠালেন আমার বিমান ভাড়া দেবার।

এই সময় আমার খুব কাজের চাপ। কয়েকদিন আগেই বিদেশ থেকে ফিরেছি, কয়েক মাস পরেই আবার বিশ্ব বইমেলায় যোগদানের কথা আছে, এর মাঝখানে শারদীয় সংখ্যার লেখা-টেখা শেষ করতে হবে। কিন্তু ভ্রমণের কথা উঠলেই আমার পায়ের তলা সুড়সুড় করে, তা ছাড়া ম্যাসিডোনিয়া নামটির রোমাঞ্চ অনুভব করি শরীরে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়েও যে যুগোশ্লাভিয়া জোট নিরপেক্ষ হয়ে আছে, সেই দেশটি চাক্ষুষ দেখার আগ্রহও ছিল অনেকদিন ধরে। সুতরাং সাগরদা-নীরেনদা-রমাপদ চৌধুরী-সেবাব্রত গুপ্ত প্রমুখ বাঘা বাঘা সম্পাদকদের উষ্মা ও রক্তচক্ষুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেলুম এককথায়।

সুতরাং অগাস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আবার আকাশযাত্রা। যেতে হবে

বেশ কয়েকবার বিমান বদল করে। বারবার নামা-ওঠা, এক একটা বিমা
বন্দরে কয়েক ঘণ্টা করে অপেক্ষা বেশ বিরক্তিকর, কিন্তু নতুন দেশ দেখ
আনন্দে তা সহ্য করা যায়। কলকাতা থেকে বোম্বাই তারপর বিরাট এ
লাফে জ্যুরিখ, সেখান থেকে বেলগ্রেড। আপাতত বেলগ্রেডে রাত্রিযাপন
বিমান কম্পানিই সেখানে হোটেল ঠিক করে রেখেছে।

বেলগ্রেডের আসল নাম বেওগ্রাড। খুবই প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর
এই শহরটিকে বলা যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝখানের দরজা। কত
যুদ্ধ, ধ্বংস ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই। বিকেলবে
পৌঁছে পরেরদিন সকালের মধ্যে, একা একা, এই শহর ভালোভাবে দেখ
সুযোগ পাওয়া যাবে না, কিন্তু একটা জিনিস দেখবোই, তা আগে থেকে
ঠিক করে এসেছি। কোনো নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার নদী
দেখলে আমার মন আনচান করে। বেলগ্রেডের পাশ দিয়ে গেছে এক
নয়, দু দুটো নদী। একটির নাম সাভা, আমাদের কাছে তেমন পরিচি
নয়। কিন্তু অন্যটি হল ইওরোপের প্রধান নদী ড্যানিয়ুব। এই শহরেরই এ
প্রান্তে ঐ দুই নদীর সঙ্গমস্থল।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সমাজতান্ত্রিক দেশে রাত্তিরবেলাও একা
একলা নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায়। রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারি, কিন্তু কে
অন্ধকারে ছুরি দেখাবে না। পকেটে পয়সা-কড়ি কম, ট্যাক্সি চড়
বিলাসিতা মনেও আসে না। তবে এই শহরে ট্রাম চলে। ট্রামে চে
লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে পৌঁছে গেলুম আমার অভীষ্ট স্থলে
দ্যানিয়ুবের তীরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলুম ব্লু ড্যানিয়ুবের স্বর্গীয় মূর্চ্ছনা।

যুগোশ্লাভিয়ার ম্যাপে, এমনকি ম্যাসিডোনিয়ার ম্যাপেও স্ট্রুগা শহরে
নাম নেই। যেমন ভারতবর্ষের, এমনকি পশ্চিমবাংলার মানচিত্রেও চম্পাহা
বা কৈখালির নাম পাওয়া যাবে না। এত ছোট শহরে এরকম এক
আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা প্রথমে বিস্ময়কর মনে হলেও পরে বুঝতে পারলু
এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। আমাদের সব কিছুই রাজধানীতে হয়, তার ফ
ছোট ছোট শহরগুলির মানুষরা আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে বিপুল বিশ্বের স্বাদ পা
না কখনো। কিন্তু দেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরও কি সমান অধিকা

নেই? রাজধানীর মানুষদের তুলনায় তারা অনেক কিছু থেকে কেন বঞ্চিত থাকবে?

ইংরিজি বানানে OHRID, উচ্চারণে ওখরিড নামে বিশাল হ্রদটির গায়ে এই স্ট্রুগা শহর। জায়গাটি বড় সুন্দর। যেদিকেই তাকাও, বড় বড় পাহাড়ের গা। হ্রদের জল স্বচ্ছ নীল। বাড়িগুলির সামনে আপেল-ন্যাশপাতির বাগান। স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে খ্যাতি আছে বলে ইওরোপের অনেক ভ্রমণকারী আসে এখানে, তাই কয়েকটি বেশ বড় বড় হোটেল আছে। সুতরাং এতগুলি অতিথির স্থান সঙ্কুলানের অসুবিধে নেই।

হোটেলে ঘর পাবার পর অনুষ্ঠান সূচিতে চোখ বোলালুম। বাইরের চল্লিশটি দেশ থেকে আশীজন কবিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, এছাড়া রয়েছে যুগোশ্লাভিয়ার কবিরা। ভারতীয় হিসেবে নাম রয়েছে তিনজন, অন্য দু'জন হলেন সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন—অজ্ঞেয় এবং এল এল মেহোত্রা। অজ্ঞেয় হিন্দী ভাষার প্রবীণ কবি, তাঁর কথা জানি, কিন্তু মেহোত্রার নাম আমি আগে কখনো শুনিনি। পরে জানলুম, এই মেহোত্রা যুগোশ্লাভিয়ায় আমাদের রাষ্ট্রদূত। বিকেলবেলা দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। অজ্ঞেয়জী তখনও এসে পৌঁছাননি, পরদিন আসবার কথা।

অন্যান্য দেশের কবিদের তালিকায় বেশ কয়েকটি নাম আমার পূর্ব পরিচিত, অন্যান্য সম্মেলনে দেখা হয়েছে, বিশেষত বেলজিয়ামের কাব্য-উৎসবে। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন আলাউদ্দীন আল-আজাদ, এঁর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল না, আসবার পথে বিমানেই আলাপ হয়েছে। আমেরিকা থেকে এসেছেন পাঁচ জন, রাশিয়া থেকে দু'জন। এই দু' দেশের তালিকায় রয়েছে দু'জন বিশ্ববিখ্যাত কবির নাম, অ্যালেন গীনস্‌বার্গ এবং আন্দ্রেজ ভজনেসেনস্কি। এই দু'জনকে ঘিরেই বেশি লোকের কৌতূহল।

গোটা ম্যাসিডোনিয়ার জনসংখ্যাই সাড়ে উনিশ লাখ, কলকাতার অর্ধেকও নয়। স্ট্রুগা শহরের জনসংখ্যা দশ-পনেরো হাজার হবে। তবু এই পুঁচকে শহরে আছে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক কবিতা-ভবন ও সংগ্রহ-শালা। সেখানে রক্ষিত আছে পৃথিবীর বহু ভাষার কবিতার বই, কবিদের ছবি ও পাণ্ডুলিপি। এ ছাড়া রয়েছে আর একটি কবিতা-কেন্দ্র। যেটি

স্থানীয় কবিদের জন্য। যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান ভাষা সার্বোক্রোয়াশিয়ান। কিন্তু তার চাপে ম্যাসিডোনিয়ান ভাষা যাতে হারিয়ে না যায়, সেইজন্য ম্যাসিডোনিয়ান ভাষার উন্নতির খুব চেষ্টা হচ্ছে। গোটা কবি সম্মেলনের সমস্ত কাজকর্ম চললো ঐ ভাষায়। আমার ধারণা হলো, এখানে এই আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনের উদ্যোগের অন্যতম কারণ, বিশ্বের লোকেরা জানুক, ম্যাসিডোনিয়ার একটি নিজস্ব ভাষা আছে।

কবিতা-ভবনের চূড়ায় একটি বিশাল আলো জ্বালিয়ে হলো সম্মেলনের উদ্বোধন। সামনেই একটি ছোট নদী। কবিতা শুনতে সারা শহরের লোকই চলে এসেছে, সম্ভবত এটাই এই শহরের প্রধান বার্ষিক উৎসব। প্রত্যেক বছর এই উৎসবে একজন কবিকে প্রধান কবির সম্মান-পুরস্কার দেওয়া হয়। সোভিয়েত দেশের জনপ্রিয় কবি আন্দ্রেজ ভজনেসেনস্কি এই পুরস্কার পেয়েছেন কয়েক বছর আগে, আমাদের অজ্ঞেয়জীও পেয়েছেন গত বছর, এ বছর পাচ্ছেন অ্যালেন গীনস্‌বার্গ।

প্রতিদিন কবিতা পাঠের আসর দু'বার। সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে। এ দেশের সন্ধ্যা শুরু হয় আটটার পর, শ্রোতারা খাওয়াদাওয়া করে আসে। যেহেতু কবিদের সংখ্যা অনেক, তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কবিদের ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সবাই একটি করে কবিতা পড়বেন। আর একটি অনুষ্ঠান মধ্যরাত্রি থেকে শুরু, তাতে যার যত খুশী কবিতা পড়তে পারেন, সারা রাত চললেও ক্ষতি নেই। দর্শক-শ্রোতারা অধৈর্য না হলেই হলো। শ্রোতাদের রাত দুটো তিনটেয় বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িঘোড়া পাওয়ার চিন্তা নেই। যে-যার হেঁটেই বাড়ি ফিরতে পারে। এ ছাড়া অনেকেরই নিজস্ব গাড়ি আছে। এই গ্রাম-প্রতিম ছোট শহরেও ইচ্ছে করলে সারা রাত ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

খুব সম্ভবত স্বাস্থ্যের কারণেই অজ্ঞেয়জী শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছালেন না। স্থানীয় উদ্যোক্তারা অনেকেই তাঁর খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। রাষ্ট্রদূত মেহোত্রা একদিন থেকেই ফিরে গেলেন। সুতরাং ভারতীয় বলতে একা আমি। এত বড় রাষ্ট্রের ভার কি একা আমার ঘাড়ে সামলাতে পারি? তার জন্য অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

তৃতীয়দিন সকালে আমি সবেমাত্র ঘুম চোখে নিজের ঘর থেকে নেমে এসে হোটেলের ডাইনিং রুমে চা খেতে এসেছি। অর্ডার দেওয়া হয়েছে, তখনও চা আসেনি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর যত গুণই থাক, হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার দাবার পেতে বড্ড দেরি হয়। যেহেতু সমস্ত হোটেলই সরকারি, তাই পরিচারকদের ব্যবহার অবিকল সরকারি কর্মচারিদের মতনই তাঁরা আস্তে হাঁটেন, অনেক কথা কানে শুনতে পান না। এখানে আবার ইংরিজিও বোঝেন না।

চায়ের প্রত্যাশায় বসে আছি, এমন সময় উদ্যোক্তাদের একজন প্রতিনিধি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বললেন, সেদিন প্রভাতী অনুষ্ঠানে কয়েকটি দেশের নামে গাছ পোঁতা হবে। ভারতবর্ষের নামের গাছটির গোড়ায় মাটি ঢালতে হবে আমাকে।

আমি বললুম, ঠিক আছে, চা-টা খেয়ে নিই ?

প্রতিনিধি বললেন, কিন্তু সবাই তৈরি হয়ে আছে। আপনার জন্য শুরু করা যাচ্ছে না, অনুগ্রহ করে এক্ষুনি চলুন।

ভদ্রলোকের চোখমুখ দেখে মনে হলো, ওঁর ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা ঠিকঠাক পালিত না হলে উনি ওপরওয়ালার কাছ থেকে বকুনি খাবেন।

আমি বললুম, তা বলে, এক কাপ চা খাওয়ারও সময় হবে না ?

উনি বললেন, তা হলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

অর্থাৎ উনিও জানেন যে আশু চা পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমাকে উঠে পড়তেই হলো।

আমাদের হোটেল থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি উদ্যানের নাম দেওয়া হয়েছে 'কবিতার উদ্যান'। সেখানে প্রতি বছরই কিছু কিছু কবিকে নিয়ে গাছ পোঁতান হয়। অজ্ঞেয়জী এলে প্রবীণ ও খ্যাতিমান হিসেবে এ কাজটি নিশ্চয়ই তাঁকেই করতে হতো। সকালবেলা প্রথম কাপ চা পানের আগে আমার মেজাজ খোলে না। তাছাড়া আগেরদিন একটা ভারি সুটকেস তুলতে গিয়ে আমার ডান হাতে হঠাৎ ব্যথা লেগেছে।

চারা গাছ নয়, মাঝারি আকারের একটি পাইন গাছ অন্য জায়গা থেকে এনে লাগানো হচ্ছে, সুতরাং অনেকখানি মাটি দিতে হবে। আমি মনে মনে ভাবছি, গাছ পোঁতার জন্য এত আদিখ্যেতার কী দরকার। আমি এক চামচে মাটি ফেলার পর বাকি কাজটা তো বাগানের মালিরা করে দিলেই পারে। তা নয় পুরোটাই করতে হবে আমাকে, ভারি কোদালটা তুলতে হাত টনটন করছে আমার। কিন্তু মুখ বিকৃত করার উপায় নেই, হাসি হাসি মুখ করে থাকতে হবে। কারণ টি. ভি-র জন্য ছবি তোলা হচ্ছে। অজ্ঞেয়জী না এসে কী বিপদেই ফেললেন আমাকে!

এই অনুষ্ঠান শেষে অ্যালেন গীনসবার্গ আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে জড়িয়ে ধরে বললো, সুনীল, কী আশ্চর্য আবার এত তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

আমি বললুম, তুমি পুরস্কার পেয়েছো, সে জন্য তোমাকে অভিনন্দন, অ্যালেন! আজকাল বড় বড় প্রতিষ্ঠান তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছে।

অ্যালেন হেসে বললো, মায়া! সবই মায়া!

আমি বললুম, কাল সন্ধেবেলা থেকে তোমাকে দূর থেকে দেখছি। কত লোকের সঙ্গে তুমি অনবরত কথা বলে যাচ্ছো। খুব ব্যস্ত। সব লোকের সঙ্গে তুমি ঠাণ্ডা মাথায় সবরকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও কী করে, অ্যালেন?

অ্যালেন সেই রকমই হেসে বললো, বড় কঠিন কর্ম। কঠিন কর্ম!

অ্যালেন মায়াকে বলে মাইয়া, কর্মকে বলে কার্মা। তবে এর দু'একদিন বাদে সে "জয় জয় দেবী, চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে…" এই শ্লোকটি নির্ভুল উচ্চারণে মুখস্থ বলেছিল, যদিও সে সংস্কৃত জানে না।

ম্যাসিডোনিয়ায় (এখানকার উচ্চারণে ম্যাকেডোনিয়া) প্রত্যেক ছোট ছোট শহরেই আছে আলাদা বেতারকেন্দ্র। এছাড়া রাজধানী স্কেপিয়ায় টি. ভি. সেণ্টার, খবরের কাগজ বেরোয় বেশ কয়েকটি, এরা সবাই মিলে বহিরাগত কবিদের সাক্ষাৎকার নেবার জন্য ব্যস্ত। কান একেবারে ঝালাপালা হবার যোগাড়। অ্যালেনের মতম এই সব 'কঠিন কর্ম' আমি ঠিক পারি না। একই কথা বারবার বলতে একঘেয়ে লাগে। আমি ওদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই, তার চেয়ে প্রকৃতি দেখা অনেক আনন্দের।

ষ্ট্রগা শহরের মাঝামাঝি বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট নদী, বেশ স্রোত। দু' পাড় বাঁধানো, মাঝে মাঝে গাছের নিচে বেঞ্চ পাতা। কেউ কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা দাপাদাপি করছে জলে। কিছুদূর অন্তর অন্তর একটা করে ব্রীজ। একটি ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আমি উঁকি মেরে চমকে উঠলুম। সেই নদীতে অসংখ্য মাছ, ছোট ছোট, চেলা জাতীয় ঐ মাছ ধরা ও বাচ্চাদের দাপাদাপি দেখে আমার পূর্ববঙ্গের বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে যায়।

নদীটি গিয়ে পড়েছে লেক ওখরিডে, সেই মোহনায় দলে দলে নারী-পুরুষ এসেছে রোদ পোহাতে। পশ্চিমি দেশগুলির সমুদ্রতীরে এই রকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই হ্রদও প্রায় সমুদ্রের মতন। তবে পশ্চিমী দেশগুলিতে এই সব জায়গায় একটা জমজমাট ভাব থাকে, তার কারণ কাছাকাছি অনেক দোকানপাট ও গানবাজনা। সেই তুলনায় সেই জায়গাটা বেশ শান্ত।

কবির দলকে ছেড়ে, একলা একলা হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেক দূরে একটি গ্রাম্য বাজারে চলে যাই। পাশেই অভ্রভেদী পাহাড়। মানুষগুলি একবিন্দু ইংরেজি বোঝে না। কিন্তু মুখের ভাবে যে সারল্য তা বিশ্বজনীন। কিছু কিছু মানুষের চেহারা ও পোশাক এবং কোনো কোনো বাড়ির গড়ন দেখলে বেশ চেনা চেনা লাগে, মনে হয় আমাদের দেশের মতন। এর কারণ, তুর্কিরা এখানে বেশ কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করে গেছে, সেই প্রভাব এখনও রয়েছে কিছু কিছু। এদেশে কিছু তুর্কি এবং মুসলমান আছে, মাঝে মাঝে মসজিদও চোখে পড়ে।

এ দেশের মুদ্রার নাম দিনার। আরব-পারস্য কাহিনীতে দিনারের উল্লেখ পেয়েছি অনেক। দশ দিনারে এক ক্রীতদাসী পাওয়া যেত, রাস্তায় কেউ এক এক দিনার কুড়িয়ে পেলে আনন্দে লাফাতো। সেই দিনারের এখন কী দুর্দশা! দু মাইল ট্যাক্সি চাপলে এক হাজার দিনার লাগে। আমাদের এক টাকায় ওদের প্রায় তিরিশ দিনার। তবে কম মূল্যের দিক থেকে দিনার এখনো ইটালির লীরাকে হারাতে পারেনি।

এখানকার খাদ্যদ্রব্যের খুব একা গুণগান করা যায় না। পেট ভরাবার উপযোগী খাদ্য আছে ঠিকই, কিন্তু সুস্বাদু নয়। রান্না বৈচিত্র্যহীন। হোটেলে

আমাদের খাদ্যদ্রব্য বিনামূল্যে, বাঁধাধরা মিনিউ, অতিরিক্ত কিছু নিতে গেলে দাম দিতে হয়। একদিন এক পরিচারক আমার পাশ দিয়ে এক প্লেট মাছ ভাজা নিয়ে যাচ্ছে দেখে বললুম, আমাকে ঐ মাছ ভাজা দাও তো এক প্লেট। মাংস খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে, তা ছাড়া বাঙালীর বাচ্চা মাছ দেখলে তো ইচ্ছে জাগবেই। একটি প্লেটে বড় সরপুঁটি জাতীয় মাছের দুটি টুকরো এনে দিয়ে সেই পরিচারক প্রায় আমার গালে থাপ্পড় মেরে তিন হাজার দিনার নিয়ে নিল! অত দামের জন্যই বোধ হয় সেই মাছের স্বাদ আমার কাছে গাছের বাকল ভাঙ্গার মতন মনে হলো! সম্মেলন কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রত্যেককে আট হাজার দিনার করে দিয়েছিলেন হাত খরচ হিসেবে। তার মধ্যে তিন হাজার চলে গেল এক প্লেট মাছ ভাজায়! লোভ থেকে যে পাপ, এটা সেই পাপের বেতন!

একদিন আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো পিকনিকে। মাইল পঞ্চাশেক দূরে পাহাড়ের ওপরে। সেন্ট লাউম নামে এক প্রাচীন মনাস্টারির চত্বরে। বড় মনোহর সেই স্থান। মনাস্টারিটি বেশ প্রাচীন, জানলাগুলিতে ছবি আঁকা রঙীন কাচ। এদিককার অধিকাংশ মানুষই গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের অন্তর্গত। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ধর্মচর্চা লোপ পায়নি।

এই পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে ওখরিড হ্রদটি অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কাছেই দেখি এক জায়গায় জলের ওপর সরল রেখায় অনেকগুলো সাদা সাদা বল ভাসছে। একজন জানালো যে প্রাচীন ম্যাসিডোনিয়া রাজ্যের মতন এই হ্রদটিও অনেক ভাগ হয়ে গেছে। কিছু অংশ গেছে গ্রীসে, কিছু অংশ আলবেনিয়ায়। আমরা যে বলগুলি দেখছি, সেটা হলো আলবেনিয়ার সীমারেখা। এই সেই আলবেনিয়া, যেখানে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের মানুষের প্রবেশ নিষেধ।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল আমার পূর্ব পরিচিত মার্ক নেসভর নামে এক মার্কিন তরুণ কবি। সে বললো, সুনীল, তুমি যদি মনের ভুলে ঐ সীমান্ত পেরিয়ে যাও, তা হলেই গুলি খেয়ে মরবে!

আমি বললুম, তোমার সে ভয় থাকতে পারে, আমার নেই। আমি মাদার টেরিজার কলকাতা থেকে এসেছি।

স্ট্রুগায় কবিতা উৎসব হলো চারদিন। এর মধ্যে দুটি সন্ধ্যা খুবই অভিনব। একটি সন্ধ্যা পুরোপুরি এবারের পুরস্কার বিজয়ী অ্যালেন গীনসবার্গকে কেন্দ্র করে। সেই আসর বসলো ওখরিড শহরের সেন্ট সোফিয়া গীর্জার অভ্যন্তরে, রাত দশটায়। এখানে অ্যালেনের কবিতা পড়া হলো বিভিন্ন ভাষায়, তারপর অ্যালেন ছোট্ট বক্তৃতা দিল। নিজের কবিতা পড়লো, অনেকগুলি এবং গান তো সে গাইবেই। সঙ্গে আছে খুদে হারমোনিয়ামটি। তার প্রথম গানটিই হলো, 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'।

স্ট্রুগার শেষ সন্ধ্যাটি যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনই বর্ণাঢ্য। অনুষ্ঠানের নাম দা ব্রিজেস। অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের কবিদের মধ্যে সেতুবন্ধন। মঞ্চ সাজানো হলো নদীর ওপরে সত্যিকারের একটি সেতুর ওপরে। দর্শক শ্রোতারা বসেছে নদীর দু ধারে। প্রত্যেক দেশের একজন মাত্র কবি একটি করে কবিতা পড়বেন। এমনকি আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও একজন করে। সুসজ্জিত মঞ্চটি নদীর ধার থেকে এমন অপরূপ দেখাচ্ছিল যে আমার ইচ্ছে করছিল দর্শকদের মধ্যেই বসতে। অজ্ঞেয়জী এলে আমি নিস্তার পেয়ে যেতুম, কিন্তু অগত্যা আমাকেও উঠতে হলো মঞ্চে।

এ এক এমনই বিচিত্র কবি সম্মেলন, যেখানে মঞ্চোপরি উপবিষ্ট কবিরা কেউ কারুর কবিতা প্রায় এক অক্ষরও বুঝতে পারছেন না। প্রত্যেক কবি কবিতা পাঠ করেছেন তাঁদের মাতৃভাষায়, তারপর স্থানীয় কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী এসে আবৃত্তি করছে সেই কবিতার ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায় অনুবাদ। ইংরেজির মধ্যস্থতা নেই। অর্থাৎ আমরা ফরাসী—জার্মান—ইজিপশিয়ান—গ্রীক—ইতালিয়ান—স্প্যানীশ—পোলিশ — নরওয়েইনিয়ান —টার্কিশ ইত্যাদি ভাষার মূল কবিতাও বুঝছি না, ম্যাসিডোনিয়ান অনুবাদ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। কবিরা পড়ছেন নদীর দিকে তাকিয়ে। আমি মনে মনে বললুম, আর কেউ না বুঝুক, নদী বুঝবে।

অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি এই যে, এই আসরে গ্রীক-জার্মান-ইতালিয়ান ইত্যাদি ভাষা মাত্র একবার করে শোনা গেলেও বাংলা ভাষা শোনা গেছে দুবার। ভারত ও বাংলাদেশ থেকে।

মঞ্চে শাড়ী পরা মহিলাও ছিলেন একজন, তিনি এসেছেন শ্রীলঙ্কা থেকে, তিনি কবিতা পড়লেন ইংরিজিতে। সব শেষে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হলো অ্যালেন গীনসবার্গের হাতে। সেটি একটি গোল্ডেন রীথ্ বা স্বর্ণ-শিরোমাল্য। সত্যি সত্যি সোনার। সেটি গ্রহণ করে অ্যালেন মাইকে তিনবার শুধু বললো, ওম্ ওম্ ওম্। এই ধ্বনির মর্ম বোধ হয় অন্য কেউই বোঝেনি, অ্যালেন চোখ টিপলো আমার দিকে, দর্শকদের মধ্যে থেকেও অনেকে ওম্ ওম্ বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

এর পরদিন কবিতার আসর ছড়িয়ে গেল বিভিন্ন শহরে ; কবিরা ভাগ হয়ে গেল কয়েকটি দলে। উদ্দেশ্য এই যে ম্যাসিডোনিয়ার সব অঞ্চলের মানুষই যেন এই আন্তর্জাতিক সমাবেশের কিছুটা অংশ নিতে পারে।

আমি আগে থেকেই বলে রেখেছিলুম, আমি খুব ছোট শহরে যেতে চাই। ছোট জায়গা আমার অন্তরঙ্গ লাগে, রাস্তাঘাটও ভালো করে দেখা যায়। আলাউদ্দিন আল-আজাদ ও আমি একই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এলুম স্টিপ নামে একটি ছোট্ট শৈলহ্রদে। পথে প্রিলেপ নামে এক জায়গার এক দোকানে প্রকৃত টার্কিশ খাবার খাওয়া হলো, বেশ ঝাল ঝাল খাদ্য, বেশ আমাদের রুচিমতন। এখানকার ওখানকার ওয়াইন বিখ্যাত। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ায় এসে দেখছি, এঁরা ওয়াইনের সঙ্গে সোডা কিংবা মিনারাল ওয়াটার মিশিয়ে দেয়। ইওরোপের অনেক দেশে ওয়াইনের সঙ্গে জল মেশালে বাঙাল বলবে!

স্টিপ শহরটি ক্ষুদ্র হলেও এখানেও একটি সংস্কৃতি ভবন আছে। কবিতা পাঠ হলো তার চত্বরে, আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলেন কিছু কিছু স্থানীয় কবি। সেই সব কবিদের সঙ্গে আড্ডা জমালো রাত্রে ভোজসভায়। সেই আড্ডা চললো রাত পৌনে তিনটে পর্যন্ত। কবিতা পাঠের আসরের চেয়েও আমার এই সব আড্ডা বেশি ভালো লাগে। আমরা কেউ কারুর কবিতা বুঝতে পারিনি, কিন্তু আড্ডায় চলে এলুম অনেক কাছকাছি। এর মধ্যেই এক সময় প্রস্তাব উঠলো, প্রত্যেককে নিজের দেশের দু একখানা করে গান শোনাতে হবে। প্রথমে শুরু করলো কিউবার মেয়ে মারলিন বোবেস, তারপর চেকোশ্লোভাকিয়ার লিভিয়া ভাদকের গ্যাভেরনিকোভা, তারপর হাঙ্গেরির পেটার কানট্রর···একে একে প্রত্যেকে। আলাউদ্দীন আল-আজাদ

ানালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। যুগোশ্লাভিয়ার কবিরা দলে ভারি, তাঁরা শোনালেন নেকগুলি পল্লীগীতি থেকে আধুনিক। আমাকেও বেসুরো হেঁড়ে গলায় াইতেই হলো দু-একখানা।

সারা ম্যাসিডোনিয়া ঘুরে সমস্ত কবির দল আবার জমায়েত হলো খানকার রাজধানী স্কোপিয়া-য়। (বানান Skopje) এখানেও কবিতা াঠ করতে হলো একটি কারখানায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের ভূমিকা রুত্বপূর্ণ, তাদেরও কবিতা শোনাবার প্রথা আছে।

তবে, কারখানায় কবিতা শোনাবার কথা মানে এই নয় যে, শ্রমিকরা ভারঅল পরে যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে বড় বড় মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ার আমরা সেখানে কবিতা পড়ে যাচ্ছি। সে রকম ব্যাপারই নয়। মস্ত ড় কারখানা, প্রায় দশ হাজার লোক কাজ করে, তাদের রয়েছে নিজস্ব সুদৃশ্য ঙ্গমঞ্চ। সেখানে এসেছেন বিশেষ নিমন্ত্রিতরা। তবে এঁদের নিজস্ব বেতার ্যবস্থা আছে। এখানকার কবিতা পাঠ সরাসরি শ্রমিকদের কাছে রিলে রা হবে, শ্রমিকরা ইচ্ছে করলে শুনতে পারেন, বন্ধ করে দিতে পারেন!

এই আসরে আমার পাশেই বসেছেন ভজনেসেনস্কি। এর আগে দু তিনবার দেখা হলেও আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করিনি। কারণ, প্রথমত, আমি নিজে থেকে কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। দ্বিতীয়ত ভজনেসেনস্কির াবভঙ্গি দেখে তাঁকে আমার অহঙ্কারী মনে হচ্ছিল। অহংকারের কারণ াছে, তিনি সোভিয়েত দেশের জনপ্রিয় কবি। যুগোশ্লাভিয়ানরা অনেকেই শ ভাষা মোটামুটি বোঝে সুতরাং এঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত, তিনি এখান থেকে পুরস্কারও পেয়ে গেছেন।

আমার লাজুকতাও বোধ হয় এক ধরনের অহংকার, তাই আমি বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যেচে কথা বলতে পারি না। সুতরাং পাশাপাশি বসেও আমাদের দুজনের কোনো কথা হলো না।

ভজনেসেনস্কির কবিতা পাঠের ভঙ্গিটি নাটকীয়। মঞ্চে মাইক্রোফোনটি ছিল একটি ডেস্কের ওপর, তিনি সেটি সরিয়ে আনলেন ফাঁকা জায়গায়, যাতে সম্পূর্ণ শরীরটি দেখা যায়। তাঁর পরনে সাদা প্যাণ্ট ও সাদা শার্ট,

মধ্যবয়েসী সুগঠিত দেহ, মাথার চুল ঈষৎ পাতলা হয়ে এসেছে। একটা পা সামনে এগিয়ে, এক হাত তুলে তিনি কখনো চেঁচিয়ে কখনো নিচু গলায় পড়লেন দুটি কবিতা। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলুম না, তবে স্ট্রুগা শব্দটি শোনা গেল কয়েকবার, এই সব উল্লেখ থাকলে স্থানীয় লোকেরা খুশী হয়।

এই সব আসরে অনেককেই খুব চেঁচিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে কবিতা পড়তে দেখি। ম্যাক্স মোয়ার্টস নামে একজন আমেরিকান কবি, অতি দীর্ঘকায়, কাউবয়ের মতন চেহারা, সে প্রায় নাচতে নাচতে লম্বা একটা কবিতা মুখস্থ বলে। মালয়েশিয়ার কবি আবদুল গফ্ফার ইব্রাহিম এমন হুঙ্কার দিয়ে, ডেস্ক চাপড়াতে চাপড়াতে কবিতা পড়লে যেন সে মেঠো রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছে। আবার অনেক লাজুক, মৃদু গলার কবিও আছেন।

অ্যালেন গীনসবার্গ এই আসরে ছিল না, তাকে পাঠানো হয়েছিল অন্য কারখানায়। তার সঙ্গে দেখা হলো সন্ধেবেলা হোটেলের লবিতে। সে বললো, সুনীল, তোমার সঙ্গে তো এবার ভালো করে গল্পই করা গেল না। আমি বললুম, তুমি এখানে বড্ড ব্যস্ত। অনেকে তোমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে।

অ্যালেন আমার কাঁধ ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, সত্যি, ক্লান্ত হয়ে গেছি। শোনো, আর কারুকে বলো না, তুমি ঠিক পৌনে সাতটায় হোটেলের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো।

নির্দিষ্ট সময়ে অনেটা নামে এক পথপ্রদর্শিকা (অনেকেই তাকে ডাকছিল অনীতা বলে) অ্যালেন, ভজনেসেনস্কি ও আমি হোটেল থেকে কেটে পড়লুম আড্ডা দিতে। অ্যালেনের সঙ্গে ভজনেসেনস্কির খুব বন্ধুত্ব, পৃথিবীর অনেক দেশের কবি সম্মেলনে দেখা হয়েছে। ভজনেসেনস্কি আমেরিকাতেও গেছেন কয়েকবার, অ্যালেনও সোভিয়েত দেশে গেছে, যুগোশ্লাভিয়াতেও এসেছে দু বার

পরিচয় হবার পর দেখা গেল ভজনেসেনস্কি যথেষ্ট নম্র ও ভদ্র, তাঁর মঞ্চের নাটকীয়তার সঙ্গে বাইরের ব্যবহারে কোনো মিল নেই।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এলুম টার্কিস বাজার নামে একটি বিচিত্র এলাকায়। বেশ পুরোনো জায়গা, খোয়া পাথরের পথ, আঁকাবাঁকা, দু পাশে অসংখ্য দোকান, বেশির ভাগই খাবারের, কোনো কোনো দোকান উপচে

দছে রাস্তায়। সেখানেই চেয়ার টেবিল পাতা। এটা যেন একটা আলাদা রী, এখানে শুধু তরুণ-তরুণীর ভিড়। অনেকেই কোনো দোকানে বসার য়গা পায়নি। তারা আড্ডা দিচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এই তারুণ্যের াৎ দেখে নিমেষে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠে।

অনেটা-র চেনা, রাস্তার ওপর একটা খোলামেলা দোকানে একটা টেবিল য়ে বসলুম আমরা। সামান্য কিছু খাবার নেওয়া হলো, আর চা। আড্ডা তে লাগলো আস্তে আস্তে। অ্যালেন ভজনেসেনস্কিকে জিজ্ঞেস করলো, মি ইণ্ডিয়ায় যাওনি কখনো?

ভজনেসেনস্কি মাথা নেড়ে ক্ষুণ্ণভাবে বললো, না। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কবার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। সব ঠিকঠাক, কিন্তু সেই সময়েই কিয়েভ রে দু জায়গায় আমার কবিতা পাঠের ব্যবস্থা হয়েছিল, লোকজন টিকিট টে ফেলেছিল। তাই ইণ্ডিয়ায় যাওয়া হলো না। আবার কোনো কারণে য়েভের অনুষ্ঠানও শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল!

আমি বললুম, এরপর আসুন একবার!

অ্যালেন বললো, হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ায় গিয়ে অবশ্যই কলকাতায় যাব। গঙ্গার র, নিমতলা শ্মশানে, দক্ষিণেশ্বরে। কী চমৎকার সময় কেটেছে আমার।

তারপর অ্যালেন মহা উৎসাহে শক্তি ও জ্যোতির্ময় দত্তের গল্প শোনাতে গলো ওকে।

সর্বক্ষণই যে আমরা কলকাতা নিয়ে পড়ে রইলুম তা নয়। আড্ডার ম অনুসারে কথা গড়িয়ে যেতে লাগলো প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। রাত্রি হলো কিন্তু যুবক-যুবতীদের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। চতুর্দিকে হাসিখুশী

অনেটা নামের মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। ইংরেজি সাহিত্যের যথেষ্ট র রাখে, সে খুব সাবলীলভাবে মিশে গেল আড্ডায়। টেবিল যাতে ড়তে না হয় সে জন্য আমরা কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাচ্ছি। এখানে টদও পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিকে কারুর ঝোঁক নেই। অনেটা যথেষ্ট ণী, আমি ও ভজনেসেনস্কি প্রায় সমবয়েসী। অ্যালেনই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সে ষাট পূর্ণ করেছে। সে খাবার দাবারের ব্যাপারে কিছুটা সাবধানী য়েছে এখন, কিন্তু বার্ধক্যের ছোঁয়া লাগেনি শরীরে।

কথায় কথায় প্রসঙ্গ এলো পৃথিবীর ধ্বংস-সম্ভাবনায়। পরমাণু যুদ্ধে পৃথিবী থেকে কি একদিন মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? ভজনেসেনস্কি কোনো উত্তর না দিয়ে কাতর, উদাসীনভাবে তাকিয়ে রইলেন। অ্যালেন আমার দিকে চাইতেই আমি বললুম, আমার নৈরাশ্যবাদী হতে ইচ্ছে করে না। অনেটা জোর দিয়ে বললো, না, না, পৃথিবী বাঁচবে। মানুষ বাঁচবে, মানুষের সমাজ আরও সুন্দর হবে।

অ্যালেন হেসে বললো, এই যৌবনের তেজই হয়তো একমাত্র বাঁচাতে পারে পৃথিবীকে।

বাইশ

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি ব্যাংক, বারবণিতা ও বই মেলার জন্য বিখ্যাত। শহরটি পুরোনো নয় আবার নতুনও বলা যাবে না। নতুন বলা যাবে না এইজন্য যে এই নামের শহরটি জন্ম প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। তবু প্রাচীন নয় এই কারণে যে আসল শহরটির নব্বই ভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দু'একটা গীর্জা ও প্রাসাদ ইত্যাদি ছাড়া মধ্যযুগীয় এই নগরীটির আসল সৌন্দর্যের বিশেষ কিছু চিহ্নই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তার বদলে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য কেজো, আঁটসাট দেশলাই-এর বাক্সের মতন বাড়ি। মহাকবি গ্যেটে যেমন জন্মেছিলেন এই শহরে, সেই রকম ধনকুবের, আন্তর্জাতিক ব্যাংক-ব্যবসায়ী রথসিল্ড পরিবারের আদি নিবাসও ছিল এই শহরে। ফ্রাঙ্কফুর্ট নামটির মানে হলো ফ্রাংক জাতির যাতায়াতের রাস্তা, এককালে ফ্রাংকরা এখান দিয়েই আলেমান্নিদের তাড়া করে গিয়েছিল।

বরাবরই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যই এই শহরটির সমৃদ্ধির নানারকম বাণিজ্যমেলা এই শহরে বসছে প্রায় সাত-আটশো বছর ধরে। সেই বাণিজ্যমেলার সূত্র ধরে ডাচ্, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ দালাল ও ফাট্‌কাবাজের এখানে এসে আসর জমায় ও ব্যাংকের ব্যবসা শুরু করে। আর যেখানেই

াকার ওড়াউড়ি সেখানেই রূপসী নারী ও শিল্পীদের আনাগোনা। ধনী
্যবসায়ীরা কেউ কেউ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সেই জন্য ফ্রাঙ্কফুর্টে
চ্চাঙ্গের আর্ট গ্যালারি ও থিয়েটারেরও অভাব নেই। ইহুদিরা বাড়িয়ে
তালে এই শহরের ধন সম্পদ আর রিফিউজিরা—সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড
। নেদারল্যাণ্ডস থেকে তাড়া খাওয়া প্রটেস্টান্ট—নিয়ে আসে উন্নত মানের
শল্প-সংস্কৃতি। তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট যখন উন্নতির শিখরে তখন হিটলার আরম্ভ
রলো ইহুদি নিধন-বিতাড়ন যজ্ঞ, ইঙ্গ-মার্কিন বোমায় এই গর্বিত নগরীটি
শে গেল ধুলোয়।

যুদ্ধ শেষ হবার এক-দেড় দশকের মধ্যেই আলাদীনের প্রদীপের দৈত্য
এই শহরটিকে আবার নতুন করে নির্মান করেছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে সাহিত্যের আবহাওয়া বিশেষ নেই কিন্তু বই প্রচুর। বই
এখানে একটি দ্রব্য। বাণিজ্য মেলায় অভিজ্ঞ এই নগর সারা বছর ধরেই
নানারকম দ্রব্যের পরপর মেলা বসায়। আন্তর্জাতিক গাড়ির মেলা, জামা-
কাপড়ের মেলা, জুতো ও পশমের মেলা, সেইরকমই বইমেলা। এখানে
বিশাল, বিস্তীর্ণ মেলা প্রাঙ্গণ আছে, অনেকগুলি বহুতল আধুনিক অট্টালিকা
সমেত, তলা থেকে ওপরে ওঠার জন্য আছে এসকেলেটর আর মেলার এক
প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবার জন্য বাস চলাচল করে, তাতে টিকিট লাগে
না। শহরে সব বাস, ট্রাম, ট্রেন রুটেই মেলা প্রাঙ্গণে যাওয়ার নির্দেশ আছে।
মেলার জার্মান প্রতিশব্দ হল মেসে, সারা বছরই কোনো না কোন মেলা
চলে, অক্টোবরের গোড়ায় বুক মেসে। অনেকে বলে, এটাই নাকি এখন
বিশ্বের সর্ববৃহৎ বই মেলা।

বইমেলা দেখতে গিয়েছিলাম। স্বতঃপ্রবৃত্ত
হয়ে নয়, যাওয়া-আসার ভাড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচের আশ্বাস পেয়ে ও
আমন্ত্রিত হয়ে। এই বছরে মেলা কর্তৃপক্ষ মেলা শুরু হবার আগে দু'দিন
ধরে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। সেটির বিষয়; ইণ্ডিয়া—
চেইঞ্জ ইন কনটিনিউইটি। এই বছর ভারতের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া
হয়েছিল, ভারতের নামে তৈরি হয়েছিল একটি আলাদা প্যাভিলিয়ান।
কেন হঠাৎ ভারতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ? তার উত্তর জানি না। তবে

এর আগে আফ্রিকার বই ও সাহিত্য নিয়ে এরকম সেমিনার ইত্যা
হয়েছিল। আফ্রিকার পর ভারত, একটা বোধহয় যোগসূত্র আছে।

যাই হোক, এই সেমিনারে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল পঁচিশ জন ভা
লেখক-লেখিকাকে। তাঁরা হলেন : অজ্ঞেয় (দিল্লী), মুল্‌করাজ আন
(বম্বে), ইউ আর অনন্তমূর্তি (মহীশূর), অশোক মিত্রণ (মাদ্রাজ), ম
ভাণ্ডারি (দিল্লী), দিলীপ চিত্রে (বম্বে), কমলা দাস (প্রন্নায়ারকুলম
অনীতা দেশাই (দিল্লী), বিজয় দান দেন্তা (যোধপুর), মহাশ্বেতা দে
(কলকাতা), সিসিম ইজিকিয়েল (বম্বে), কুরাত-উল-আইন হায়দার (দিল্লী
বিষ্ণু খারে (দিল্লী), অরুণ কোলাতকর (বম্বে), সীতাকান্ত মহাপ
(ভুবনেশ্বর), আর কে নারায়ণ (মহীশূর), দয়া পাওয়ার (বম্বে), অমৃ
প্রীতম (দিল্লী), এ কে রামানুজম (শিকাগো), রঘুবীর সহায় (দিল্লী
কবিতা সিংহ (কলকাতা), বিজয় তেণ্ডুলকর (বম্বে), নির্মল ভার্মা (দিল্লী
সিতাংশু যশচন্দ্র (বরোদা) এবং বর্তমান লেখক।

এই তালিকায় দিল্লীর প্রাধান্য থাকলেও তাঁদের মধ্যে আছেন অে
ভাষার লেখক যাঁরা কার্যসূত্রে দিল্লীতে থাকেন। সব মিলিয়ে এই
লেখকরা নির্বাচিত হয়েছেন বাংলা, গুজরাতি, হিন্দী, কানাড়া, মালয়াল
মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, উর্দু এবং ইংরাজী ভাষা থেকে। অসমী
তেলেগু ইত্যাদি কেন বাদ গেল জানি না। নির্বাচনের মাপকাঠি হিসে
প্রচার পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে "প্রবীণ ও ত
লেখকদের, কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং অচ্ছুৎ ও জাতিগত সংখ্যালঘু
সাহিত্যের প্রতিনিধিদের। নারী-লেখকেরা (আক্ষরিক অনুবাদ) ভারত
নারীদের সাহিত্যের প্রয়োজনীয় ভূমিকার কথা বলবেন।"

এই পঁচিশজনের মধ্যে অবশ্য অমৃতা প্রীতম এবং বিজয় তেণ্ডুলকর (
পর্যন্ত আসতে পারেন নি। অমৃতা প্রীতমকে কট্টর ফেমিনিস্ট হিসেবে জা
তিনি না যাওয়াতে ভারতীয় নারীদের বক্তব্য অনেকখানিই অব্যক্ত রয়ে গে
আর বিজয় তেণ্ডুলকরের অনুপস্থিতিতে নাট্য জাগতের কোনো প্রতিনিধি
রইলো না।

দু'দিনের চারবেলার সেমিনারের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, ভার

সাহিত্যের বিভিন্নতা ; বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের ; ভারতীয় সাহিত্যের প্রকাশনা ও বই-ব্যবসা ; ভারতীয় সাহিত্যের সমাদর। বিভিন্নবেলায় সভাপতি ছিলেন ডঃ লোথার লুৎসে, পিটাই ওয়াইডহাস, ডঃ রাইমেনস্নাইডার এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। অলোকরঞ্জন এই পদে মনোনীত হয়েছিলেন বাঙালী বা ভারতীয় বলে নয়, একই সঙ্গে ভারতীয় ও জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য। আমাদেরই সমসাময়িক এই কবি ও অধ্যাপকের এরকম সম্মাননায় অমি গর্বিত বোধ করেছি।

সেমিনার কেমন হয়েছিল ? বেশ ভালোই তো হয়েছিল, যে-রকম সব সেমিনার হয়। এই সব সেমিনারে বক্তৃতা, হাস্য পরিহাস ও ক্কচিৎ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। কেউ কেউ মন দিয়ে শোনে, কেউ কেউ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। বক্তাদের মধ্যে কেউ কেউ সর্বক্ষণ নিজে কী বলবে মনে মনে তার মহড়া দিয়ে যায়। কেউ কেউ জ্বালাময়ী ভাষণ দেয় এবং অন্যদের ভাষণের সময় বাইরে সিগারেট টানতে চলে যায়। কেউ কেউ বিনামূল্যে প্রাপ্ত প্যাডে পেন্সিল দিয়ে অনবরত কী নোট করে যায় কে জানে! কেউ অন্যের বক্তৃতার সময় পাশের লোকের সঙ্গে গল্প করে, কেউ কান চুলকোয়।

চার বেলাতেই সব লেখক-লেখিকারা ভাগ ভাগ করে মাতৃভাষায় (ইংরেজিতে যাঁরা লেখেন তাঁরা বিমাতৃভাষায়) নিজের রচনা থেকে খানিকটা অংশ পাঠ করেছেন। তারপর সেই অংশের পূর্বকৃত জার্মান অনুবাদ পড়ে দিচ্ছিলেন একজন অভিনেত্রী। আলোচনার ভাষা ইংরেজি (ভারতীয়দের ক্ষেত্রে, একজন শুধু হিন্দীতে বলেছিলেন) এবং জার্মান। তবে জার্মান দর্শক-শ্রোতাদের জন্য জার্মান ছাড়া অন্য ভাষায় কিছু বলা হলেই সঙ্গে সঙ্গে তার জার্মান অনুবাদ শুনিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। এই সব ব্যবস্থা প্রায় নিখুঁত। প্রায় বললাম এই কারণে যে যন্ত্র সভ্যতায় অগ্রগণ্য জার্মান জাতির ব্যবস্থাপনাতেও দু' একবার মাইক্রোফোনের কিছু গোলমাল হয়েছিল।

এই আলোচনা সভা, কোনো খোলা জায়গাতে নয়, বইমেলার মধ্যেও নয়, নগরের কেন্দ্রস্থলে বসেছিল একটি ঐতিহাসিক কক্ষে। শ্রোতারা সবাই আমন্ত্রিত। শ্রোতারা অধিকাংশই বই প্রকাশনার ব্যাপারে জড়িত, কিছু

ভারত-বিশেষজ্ঞ এবং ভারত-কৌতূহলী এবং কিছু স্থানীয় ভারতীয়, যাঁদের মধ্যে বাঙালী মুখ নজরে পড়ার মতন। শ্রোতারা প্রশ্নোত্তরে আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন।

শ্রোতাদের মধ্যে নাকি জার্মান লেখকরা কেউ ছিলেন না কিংবা জার্মান লেখকদের সঙ্গে ভারতীয় লেখকদের ঠিক মতন পরিচয় বা মেলামেশার সুযোগ করিয়ে দেওয়া হয়নি, এরকম অভিযোগ ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ করেছেন।

প্রত্যাশা বেশি থাকলে আশা ভঙ্গের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। আমার সেরকম কিছু প্রত্যাশা ছিল না, জার্মান লেখকদের সঙ্গে পরিচয় বা আলাপ আলোচনার জন্য আমার কোনো ব্যগ্রতাও ছিল না। আমি গিয়েছিলাম বিনা পয়সায় ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে। সেই আনন্দে। আমি মনে করি, প্রত্যেক লেখকেরই বিশ্ব ভ্রমণ করা উচিত, কারণ লেখকেরা তো নিছক কোনো দেশের অধিবাসী নন, তাঁরা এই পৃথিবীর একজন মানুষ, তাঁদের রচনায় পৃথিবী শব্দটা আসে অসংখ্যবার, অথচ তাঁরা পৃথিবীটা স্বচক্ষে দেখবে না? পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখকেরই নিজের দেশের বাইরে পা বাড়াবার সুযোগ নেই, (অনেকে নিজের দেশটাও পুরোপুরি ঘুরে দেখতে উৎসাহ পান না, তাও অবশ্য স্বীকার করা উচিত) ইচ্ছে থাকলেও অর্থের অনটন এবং ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝামেলার জন্য প্রবাসে যাওয়া সম্ভব হয় না। জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাসের মতন পশ্চিমী লেখকরা যেমন দুর্দশা নগরী কলকাতাকে সশরীরে অনুভব করার জন্য মাসের পর মাস এখানে থেকে যেতে পারেন। সেইরকম কোনো ভারতীয় লেখকের যদি মনে হয় জার্মান জাতির মানসিক অধোগতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ওদেশে কয়েক মাস থেকে আসা দরকার, তিনি তা পারবেন না, সেটা এ এক অসম্ভব প্রস্তাব।

বিদেশের বেশ কয়েকটি সেমিনার দেখে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে স্বদেশের সেমিনারগুলির সঙ্গেও তার কোনো তফাত নেই। দু'তিন দিনের সেমিনারে পৃথিবীর কোনো উপকার হয় না। কোনো ক্ষতিও হয় না। সাহিত্য বিষয়ক সেমিনারে সাহিত্যের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। কিছু কথার

খেলা হয়, সেমিনারের বাইরে কফিখানায় বা পানশালায় চমৎকার গুলতানি হয়। সেমিনারের প্রত্যক্ষ উপকারিতা তাতে গৌরী সেনের টাকায় প্রবাস-ভ্রমণ হয়। কেউ সেই সুযোগে আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার ও গ্রন্থাগার দেখে আসে, যার সামর্থ্য থাকে সে বিদেশী দ্রব্যের শপিং করে। প্রবীণ ঔপন্যাসিক আর কে নারায়ণকে জার্মান টেলিভিশানের সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি ফ্রাঙ্কফুর্টে কেন এসেছেন? সুরসিক বৃদ্ধ মৃদু হাস্যে চোখের চশমা খুলে বললেন, এসেছি দু'এক জোড়া চশমা কিনতে। শুনেছি ফ্রাঙ্কফুর্টে ভালো চশমা পাওয়া যায়।

আমি মোটেই আশা করি নি যে ভারতীয় সাহিত্যের সেমিনার হচ্ছে বলেই জার্মান জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগবে। এরা ব্যস্ত মানুষ, এদের অন্যান্য ভালো ভালো কাজ আছে। জার্মান লেখকরাই বা কেন ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক সেমিনাব শুনতে রবাহূত, অনাহূত, এমনকি নিমন্ত্রিত হলেও ছুটে আসবে? আফ্রিকা বা ভারত সম্পর্কে যাদের মনে দায়-দক্ষিণ্যের ভাব আছে তাদের কথা আলাদা। আমাদের দেশে যদি কোরিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান (কথার কথা) সাহিত্যের দু'একজন প্রতিনিধি আসে, সরকারি বা কোনো দূতাবাসের উদ্যোগে সেমিনার হয়, যেমন প্রায়ই হয়, তাতে আমরা, ভারতীয় লেখকরা কি ছুটে যাই? আমন্ত্রণ পেলেও তো গড়িমসি করি। অবশ্য পশ্চিমী কয়েকটা দেশ বা সোভিয়েত দেশের লেখক প্রতিনিধি এলে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য যে আমন্ত্রণ আসে, তার সঙ্গে খাদ্য-পানীয়ের চাপা প্রলোভন থাকে, এই গরিব দেশের অনেক লেখক সেইসব সমাবেশে গেলেও আমি কোনো দোষ দেখি না। জার্মানিতেও কোনো আমেরিকান, ফরাসী, ইংরেজ, রুশ লেখক এলে জার্মান লেখকরাও তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে যাবেন হয়তো, খাদ্য-পানীয়ের লোভে নয়, আগে থেকেই ঐসব লেখকের নাম জানেন কিংবা তাঁদের রচনা পড়েছেন বলে। ভারতীয় লেখকদের ক্ষেত্রে সে প্রশ্নও ওঠেই না। এবারে ফ্রাঙ্কফুর্টের এই দলের দুই প্রধান প্রবীণ মুল্‌ক রাজ আনন্দ এবং অজ্ঞেয়কেও বিশেষ কেউ চেনেন বলে মনে হল না। মিডিয়া ওদের বিশেষ পাত্তা দেননি।

আমি তো ঠিক করেই ফেলেছি, কলকাতায় বিদেশী কোনো লেখক

এলে, তিনি বা তাঁরা যদি আমার বাড়িতে দেখা করতে আসেন তো খুব ভালো কথা, সময় থাকলে নিশ্চিত আমি তাঁদের জন্য সময় ব্যয় করবো, চা-টা খাওয়াবো, গল্প করবো, কিন্তু আমি নিজে থেকে তাঁদের সঙ্গে কোথাও দেখা করতে যাবো না। কী দরকার। নিজের বাড়িতে বসে যদি আমি বাংলা ভাষা খানিকটা গবিত ভাব পোষণ করি, তাতে এমন কি দোষ হয়? অবশ্য যে বিদেশী লেখকের লেখা আমি আগে পড়েছি বা যাঁর লেখা আমার প্রিয়, তাঁর ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। প্রিয় লেখকের কাছে তো আমি একজন পাঠক মাত্র, তাঁর কাছে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তো অসুবিধের কিছু নেই।

আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। কোনো একটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করা একটা বিড়ম্বনা। বিদেশে আমার গায়ে কেউ ভারতীয় বলে মার্কা মেরে দিলে আমার অতি বাজে লাগে। যখন আমি একলা থাকি, তখন তো আমি বাঙালীও নই. ভারতীয়ও নই, একজন শুধুই মানুষ, গোটা মানব সভ্যতার একজন অংশীদার, তাই না? শেকস্‌পীয়ার-ডিকেন্স, টলস্টয়-গোর্কি, উগো বদলেয়ার, গ্যেটে-হাইনে পড়ার সময় কি তাঁদের জাতের বিচার করি, না মনে করি ওরা আমাদের আত্মীয়? হ্যামলেটের শোক গাথায় আমাদের চক্ষু সজল হয় কেন, ইংল্যাণ্ড বা ডেনমার্কের রাজবংশের খুনোখুনিতে একজন ভারতীয় হিসেবে আমার কী আসে যায়! ডস্টয়েভস্কি বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মানুষ কি কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির সীমানায় আবদ্ধ? বিদেশের কোনো কোনো সাহিত্য সমাবেশে এক এক সময় আমার চিৎকার করে, রুক্ষ কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে হয়, না, না, আমি ভারতীয় নই, ভারতীয় নই, আমি একজন মানুষ, মানুষ!

এইবারে জার্মান সংবাদপত্রগুলি, বেতার ও দূরদর্শন দু'জন ভারতীয় লেখক-লেখিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। সেই দু'জন হলেন দয়া পাওয়ার এবং মহাশ্বেতা দেবী। দয়া পাওয়ারের কোনো লেখা আমি আগে পড়িনি, শুধু এইটুকুই জানি যে তিনি একজন দলিত লেখক, জাতে হরিজন, তাঁর কাছাকাছি মানুষের কথাই লেখেন। আমাদের মহাশ্বেতা অতি শক্তিশালিনী লেখিকা, ইদানীং তিনি আদিবাসী-উপজাতীয়দের

কথাই প্রবলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর সম্মানে আমাদের গর্ব। জার্মান মিডিয়ায় হরিজন-আদিবাসী প্রসঙ্গেই বারবার উত্থাপিত হচ্ছিল। দলিত, নির্যাতিত, হরিজন, আদিবাসী; উপজাতি, সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সহানুভূতি নিশ্চিত শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মিডিয়া যখন ভারতের এই দিকটিরই বেশি প্রচার করে, তখন কী রকম যেন একটা সন্দেহ হয়!

ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক মেসের কর্তৃপক্ষ দু'দিনের সেমিনার শেষ হতেই আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানান নি। পরবর্তী সাতদিনের বইমেলা দেখার ও থেকে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। সে জন্য তাঁরা অশেষ ধন্যবাদার্হ। কিন্তু থাকার ব্যবস্থাটি যে খুব একটা উপভোগ্য ছিল, সত্যের খাতিরে সেকথা বলা যাবে না। আমাদের অবশ্য ভারতের লম্বা রাস্তার পাশে পাশে ধাবার হোটেলে খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা আছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও কত রাত কাটিয়েছি, সেই তুলনায় সাহেবদের দেশে যে-কোনো হোটেলের সাদা বিছানা তো স্বর্গ। তবু কেন যেন মনে হচ্ছিল, শ্বেতাঙ্গ জাতের লেখকরা এলে নিশ্চিত উৎকৃষ্টকর আপ্যায়ন পেতেন। আন্তর্জাতিক অতিথি সৎকারে একটা নির্দিষ্ট মান আছে। এর কিছু দিন আগেই আমরা কয়েকজন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত-উৎসবের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে দরিদ্র ভারত মাতা তাঁর সন্তানদের কিন্তু আন্তর্জাতিক মানেই রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাটি বিরাট তো বটেই এবং বিচিত্র প্রকৃতির। এ এমন এক মেলা যেখানে বই অঢেল, দর্শকও প্রচুর কিন্তু একজনও ক্রেতা নেই। কলকাতার বইমেলার সঙ্গে তো মেলেই না, এমনকি মেলা বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গেও মেলে না। বই কি মেয়েদের মুখ বা জঙ্গলের হরিণ বা শিল্পীর তুলির টান, যা শুধু দেখতেই সুখ? বই দেখতে দেখতে, ঘাটতে ঘাটতে যদি হঠাৎ একটি বই পছন্দ হয়, পকেট যদি তখন একেবারে নিঃস্ব না হয়, তাহলে তখুনি সেই বইটি পড়ার জন্য হস্তগত করার ইচ্ছে দমন করা কি ভয়াবহ কোনো অবদমনের পর্যায়ে পড়ে না? এই অবদমনের কোনো মানসিক চাপ নেই? ব্যবসায়ীদের শহর ফ্রাঙ্কফুর্টে বইমেলায় খুচরো বই বিক্রির কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে এক দেশের প্রকাশকরা আসেন

অন্যদেশের প্রকাশকদের সঙ্গে দরাদরি ও চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে, অনুবাদ সত্ব, সংস্করণ ক্রয় হ্যানো ত্যানো নিয়ে কথাবর্তা হয়, নিছক একজন পাঠক বা বই-প্রেমীর কোনো ভূমিকাই নেই। বইমেলা নাম হলেও এটি আসলে একটি বাণিজ্যমেলা, বা উদ্দেশ্যমূলক প্রদর্শনী, এখানে লেখকদের বিশেষ যাতায়াত নেই। পরে একসময় গুণ্টার গ্রাস কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তিনি ঐ বইমেলায় কদাচিৎ যান।

সাতটি প্যাভেলিয়ান ভরা অসংখ্য বই। দু'একদিন ঘুরে ঘুরে দেখার পর ক্লান্ত লাগে, একঘেয়ে লাগে। দর্শকদের হাতে শুধু বিভিন্ন প্রকাশকের পুস্তক তালিকা, কেউ কেউ আবার বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য নানান রকম মনোহারী ঠোঙা সংগ্রহ করতে আগ্রহী। একটি গোটা প্যাভিলিয়ান এবারে আলাদাভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলীর জন্য। মণ্ডপটির সম্মুখ ভাগ সুন্দরভাবে সজ্জিত, সেখানে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন। এ ছাড়া অনেকগুলি ছোট বড় দোকানে ভারতের বিভিন্ন ভাষার প্রকাশকরা তাঁদের বই সাজিয়ে বসে ছিলেন। এ বছর ভারতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও এই মণ্ডপটিতে জন সমাগম হয়েছে সবচেয়ে কম। বিশ্ব সাহিত্যে এবং বিশ্বের বইয়ের বাজারে ভারতের ভূমিকা এখন নগণ্য। ল্যাটিন আমেরিকার যে-কোনো ছোট দেশের তুলনায়ও ভারতীয় লেখকদের বইয়ের অনুবাদ অনেক কম। পশ্চিমী দেশগুলির ঝোঁক এখন চীনের দিকে, ভারত যেন শুধুই ধর্ম আর দারিদ্র্যের দেশ। ভারতেও যে আধুনিক সাহিত্য রচিত হয় তা অনেকেই জানে না, জানার জন্য মাথাব্যথাও নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে তবু যা ভারতীয় সহিত্যের অনুবাদ হয়, পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে তার দশ ভাগের একভাগও না। ফ্রাঙ্কফুর্ট বই মেলা কর্তৃপক্ষ অবশ্য আগামী বছর থেকে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

বইমেলার দিনগুলি আমাদের কাছে কিছুটা উপভোগ্য হয়েছিল বাঙালি আড্ডায়। এ বছর বইমেলা ও দুর্গাপূজো প্রায় কাছাকাছি সময়ে পড়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্টে রাইন-মাইন ক্লাব নামে একটি বাঙালীদের ক্লাব আছে, তাঁরা পুজোর আয়োজন করেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে বিদেশীর সংখ্যা কম নয়, প্রতি সাত জনে

একজন তবে তাদের মধ্যে যুগোশ্লাভ, ইটালিয়ান, তুর্কি, স্প্যানিয়ার্ড ও গ্রীকরাই বেশি। ভারতীয়দের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর, তবু তারই মধ্যে বাঙালীদের উপস্থিতি বেশ চোখে পড়ে। এখানকার বাঙালীরা বেশ করিৎকর্মা, এবং অতিথিপরায়ণ ও সজ্জন। তুর্গাপুজোর সময় তাঁরা সাহিত্য সভারও আয়োজন করেছিলেন, সেই উপলক্ষে স্বদেশ থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখককে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এসেছিলেন সমরেশ বসু, বুদ্ধদেব গুহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়; কলকাতার প্রকাশকদের মধ্য থেকে গিয়েছিলেন সুপ্রিয় সরকার, বিমল ধর, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, প্রসূন বসু, বাদল বসু ও আরও কেউ কেউ, এদের মধ্যে কয়েকজনের স্ত্রী। আমার স্ত্রী স্বাতীও গিয়েছিল দেব-দর্শন মানসে। পশ্চিম জার্মানির অন্যান্য শহর থেকে বেড়াতে আসা বেশ কয়েকজন বাঙালী পুরুষ ও রমণীরও সাক্ষাৎ পেয়েছি। সুতরাং মেলায় কিছুক্ষণ ঘুরেই ফিরে আমরা এসে বসতুম বাংলা বইয়ের দোকানে। তু পাঁচ মিনিটের বেশি ইংরিজি বলতে হলে আমি ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠি, বাংলা আড্ডাতেই আমার পরম সন্তোষ। দেশে যাঁদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, বিদেশে গিয়েও তাঁদের কারু সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হলে সেই আড্ডায় একটা অন্যরকম স্বাদ আসে।

কলকাতায় কোনো বইয়ের দোকানে বেশিক্ষণ বসে থাকার সুযোগ আমাদের হয় না। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কফুর্টে বাংলা বইয়ের দোকানে বসে আমি দেখেছি বিদেশী দর্শকদের ভাবলেশহীন মুখ। যেসব বিখ্যাত বাংলা বই স্বদেশের শত-সহস্র পাঠকের মন আন্দোলিত করেছে, সেই বই সম্পর্কে বিদেশী পাঠকের বিন্দুমাত্র আগ্রহও নেই। কেনই বা থাকবে? ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, সেই ভাষাই আবার মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। চিত্র শিল্প কিংবা গণিতের আন্তর্জাতিক সমমর্মিতা আছে, সাহিত্যের নেই। সাহিত্যকে নির্ভর করতে হয় অনুবাদের ওপর। তা বলে নিজেদের উদ্যোগে প্রকৃতভাবে ভারতীয় সাহিত্যের ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান অনুবাদ করানোর আমি পক্ষপাতী নই। তাতে কিছু সুফলও হয় না। ওদের যদি ইচ্ছে হয় ওরা করে নেবে, না করলেও ক্ষতি কিছু নেই। প্রায় পনেরো-ষোলো কোটি লোক বাংলা

ভাষায় কথা বলে, তাদের জন্যই কি বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট নয়? ওরা যদি বাংলা সাহিত্য না পড়ে তাহলে ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো, সারা জীবন একটা ভালো সাহিত্যের সন্ধান না পেয়ে কিছুটা মূর্খ থেকে গেল। সেই তুলনায় আমরা বাংলাও পড়ি আবার কিছু কিছু ইংরেজি-ফরাসি-জার্মানি ইত্যাদি সাহিত্যেরও রসগ্রহণ করি। সুতরাং ওদের তুলনায় নিশ্চিত আমরা শিক্ষিততর।

সাতদিনের বইমেলায় পুরো সাতদিন থাকা হয়নি। শুধু ঘুরে ঘুরে বই দেখা, খুচরা-খাচরা সাহিত্য-বাসর ও আড্ডার পক্ষেও সাতদিন বড় লম্বা সময়, তাই দিন চারেক পরেই আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়লুম জার্মানির অন্যান্য অঞ্চল ভ্রমণে। টাটকা বাতাসে নিঃশ্বাস ও দু' চক্ষু ভরে সবুজ দেখার আনন্দ তো সব দেশেই সমান।

তেইশ

না, এটা মানস সরোবরের কথা নয়। অতদূর আমি এখনো যাইনি, যাবার ইচ্ছে আছে।

আসামের একটি সংরক্ষিত অরণ্যের নাম মানস। কেউ কেউ বলেন মনাস বা মানাস। কিন্তু মানস নামটিই বেশী প্রচলিত এবং পছন্দসই। ভারতে যে ক'টি সংরক্ষিত বন আছে, তার মধ্যে আয়তনে এটিই সবচেয়ে বড় এবং অনতিগম্য। অনেকদিন থেকেই বিশ্বস্ত লোকজনের মুখে এর সৌন্দর্যের কথা শুনেছি; পড়েওছি কিছু জায়গায়, প্রখ্যাত লেখক ই পি জি মানসের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি মানস দর্শনের বাসনা মনে মনে পুষে রেখেছি, যদিও জানতাম, একার চেষ্টায় ওখানে যাওয়া সহজ নয়।

সুতরাং অসম সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিলাম, এই সুযোগে মানস ঘুরে আসতে হবে। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আসামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পরদিন তাঁর দূতের

ঙ্গে যোগাযোগ হতেই আমার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিলুম। এ বৎসর অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন হলো অভয়াপুর নামে একটি ক্ষুদ্র শহরে। ম্যাপ খুলে দেখে নিলাম, সেখান থেকে মানস অরণ্য বিরাট দূর নয়।

অসম সাহিত্য সভার তুল্য কোনো প্রতিষ্ঠান আমাদের বাংলায় নেই বলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের অনেকের সঠিক ধারণা করা সম্ভব হবে না। আসামের যে-কোনো রাজনৈতিক দলের চেয়েও এই সভা বেশী শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়। এঁদের বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বছরই কোনো এক শহরে হয় না। বেছে নেওয়া হয় আসামের যে-কোনো একটি অঞ্চল, সাহিত্য-সভাটি ধারণ করে বিশাল একটি মেলার আকার, আসে দূর দূর থেকে গ্রামীণ মানুষ এই এক একটা উৎসবে যোগ দিতে। সভার বক্তৃতা দশ বারো হাজার মানুষ টুঁ শব্দটি না করে শোনে, সব কিছু না বুঝলেও এটুকু অন্তত বোঝে যায় যে সাহিত্য বলে একটা ব্যাপার আছে, মাতৃভাষার একটা গৌরব আছে। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারী আনুকূল্য প্রায় পুরোপুরি। মুখ্যমন্ত্রী সব কাজ ফেলে দু'তিন দিনের জন্য চলে আসেন এবং যে-দিন তাঁর বক্তৃতা থাকে না সেদিনও মঞ্চে দু'তিন ঘণ্টা বসে থেকে শোনেন সব কিছু। অন্যান্য অনেক মন্ত্রী বড় বড় আমলা এবং রাজনৈতিক নেতারা ঘোরাফেরা করেন সাধারণ অতিথির মতন, দুপুরে কয়েক হাজার অভ্যাগতর সঙ্গে বসেন পংক্তিভোজনে। আসেন আসামের অধিকাংশ লেখক, কবি, শিল্পী, গায়ক। যে-শহরে সাহিত্য সভা হয়, সেখানকার রাস্তাঘাটের ঝটিতি উন্নতি হয়ে যায়, তৈরী হয় নতুন বাড়ি ঘর। সাহিত্যের জন্য আসাম এতটা করে।

চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা অভয়াপুর শহরটি প্রায় গ্রামের মতন, অত্যন্ত ঝকঝকে সুন্দর। এককালে ছিল ছোট একটি রাজ্য বা জমিদারি, প্রাক্তন রাজাদের বাড়িটিতে এখনো বসতি আছে। এইখানকার মেয়ে বাসন্তী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, তাই প্রবীণেরা এখনো দেশবন্ধুকে অভয়াপুরের জামাই বলে মনে করেন। এই জায়গাটি গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে, এবং গোয়ালপাড়া আর ভুটান রাজ্যের সীমান্তেই মানস অরণ্য।

কথা ছিল, আমার জন্য থাকবে একটি গাড়ি, সঙ্গে যাবেন আরও দু'তিন জন এবং বন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অতি উৎসাহী ব্যক্তি। কিন্তু সাহিত্য সভার কাজে অনেকে নিযুক্ত, তা ছাড়া হঠাৎ-ঘোষিত নির্বাচনের জন্যও সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সুতরাং বন্দোবস্তে অনেক ফাটল দেখা দেয়।

যাঁদের সঙ্গে যাবার কথা, তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না, গাড়ির জোগাড় হয় না ঠিক মতন, আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রচার সচিব শ্রী দাশ খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েন। তিনি প্রস্তাব দেন, আমি যদি পরে আবার কখনো আসি, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন, এবার ঠিক সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি যাবো ঠিক করেছি, যাবোই। অন্তত শেষ পর্যন্ত চেষ্টা দিতে হবে।

শেষ চেষ্টার জন্য অভয়াপুর থেকে শ্রী দাশের গাড়িতে চলে এলাম বরপেটা রোডে। গাড়ি চালাচ্ছিলেন শ্রী দাশ নিজে, তাঁর মুখে চিন্তার রেখা। একা একা আমায় ছেড়ে দিলে আমার কোনো বিপদ ঘটতে পারে, তিনি ভাবছিলেন। মানসে একা একা কেউ যায় না। মানসে খাবার দাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। ওখানে হিংস্র জন্তু, বিশেষ করে হাতির উপদ্রব খুব। এরকম জায়গায় একলা কোনো অতিথিকে কেউ পাঠায় না। তবে জেলার অরণ্য-অফিসার শ্রী লাহানকে পাওয়া গেলে আর কোনো চিন্তা নেই, তিনি অতি উৎসাহী মানুষ, তিনি সঙ্গে যাবেন এবং সব ব্যবস্থা করে দেবেন। বরপেটা রোডে শ্রী লাহানের বাড়িতে গিয়েও তাকে পাওয়া গেল না। তিনি হঠাৎ গৌহাটি চলে গেছেন। শ্রী দাসের মুখ আরও শুষ্ক হলো।

আমি কিন্তু মনে মনে খুশী হয়ে উঠলাম। যত শুনছি আর কোনো সঙ্গী পাওয়া যাবে না, তত আমার উৎসাহ বাড়ছে। আমি একাচোরা ধরনের মানুষ, একা একা বেড়াতেই ভালোবাসি।

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দল বেঁধে অনেক জায়গায় গেছি অবশ্য, কিন্তু কোথাও গিয়ে নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবার ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম। আমি সু-আলাপী নই। তাছাড়া দল বেঁধে দেখা আর এই দেখার স্বাদই আলাদা। মানস অরণ্য আমি আপন মনেই দেখতে চাই।

আমার চাই শুধু একটা গাড়ি, কেননা, পায়ে হেঁটে কিছুতেই একদিনে মানসে পৌঁছানো যায় না, সেখান থেকেই অন্তত পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা।

উল্টো দিকে পনেরো-কুড়ি মাইল উজিয়ে আসা হলো বরপেটা শহরে। সেখানে শ্রী দাশের জেলা-সহকারীর অফিসে যদি সেই সহকারীকে পাওয়া যায়। তিনিও নেই। সেদিন রবিবার কে কোথায় যাবে ঠিক নেই তো। সেই অফিসে আছে একটি জিপ। জিপই দরকার, জঙ্গলের পাহাড়ী রাস্তায় অ্যামবাসেডর সুবিধা-জনক নয়। কিন্তু জিপটা আছে, নেই তার ড্রাইভার। ছুটির দিনে সে-ও কোথায় যেন গেছে।

শ্রী দাশ অত্যন্ত ভদ্রতাসম্মত উপায়ে আমাকে নিরস্ত করার আরও অনেক চেষ্টা করলেন। নেহাৎ আমি অতিথি, তাই রূঢ় কথা বলতে পারেন না। আমিও ততোধিক ভদ্রতার সঙ্গে আমার গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ করছিলাম।

আসলে, আমাকে মানস-ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি যে সুচারু বন্দোবস্ত করে উঠতে পারছেন না, এজন্য তিনি লজ্জিত ও আমার নিরাপত্তা বিষয়ে চিন্তিত বোধ করছিলেন। আমি তাঁর ঐ লজ্জাটুকুর সুযোগ নিচ্ছিলাম পুরোপুরি। আমি সাহিত্যসভা-টভা এড়িয়ে চলি, যদি া তার সঙ্গে আলাদা ভ্রমণের আনন্দ যুক্ত থাকে। অনেক তেতো ওষুধের ানুপান যেমন মধু।

শ্রী দাশের গাড়িতে, তাঁর পাশে একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে সেছিল। শ্রী দাশ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, তুই পারবি? ছলেটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লো। তিনি বললেন, তাহলে ছাখ, জিপটা চালু াবস্থায় আছে কিনা।

ছেলেটি নেমে যাবার পর শ্রী দাস আমাকে বললেন, এই ছেলেটি আমার াাড়ি চালায়। কিন্তু ও কোনদিন জিপ চালায় নি। ওকে নিয়ে যাওয়া ক ঠিক হবে আপনার?

আমি বললাম, কেন, অসুবিধে কী আছে?

উনি বললেন, যেতে যেতেই অন্ধকার হয়ে যাবে, রাস্তা খুব খারাপ, এই ছেলেটা কোনোদিন জিপ চালায়নি, যে-কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে—

আমি বললাম, কিচ্ছু হবে না, কোনো চিন্তা নেই। উনি বললেন সন্ধের পর রাস্তার ওপর হাতি বসে থাকে।

আমি বললাম চমৎকার! তা হলে তো যেতেই হবে।

শ্রী দাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বিকেল গাঢ় হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিকে লম্বা লম্বা ছায়া। এর মধ্যে সেই ছেলেটি জিপ গাড়িটি বার করে এনেছে রাস্তায়। গাড়িটি থেকে মাঝে মধ্যে অদ্ভুত গর্জন রব বেরুচ্ছে—নতুন সওয়ারিকে পিঠে নিয়ে অবাধ্য ঘোড়া যেমন বিরক্তি প্রকাশ করে! জিপটিকে তেল-জল-মোবিল দিয়ে সুস্থির করতে আরও আধঘণ্টা কাটলো, ততক্ষণে পুরোপুরি সন্ধ্যা। চিন্তা ভারাক্রান্ত শ্রী দাশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এগিয়ে পড়লুম।

ষোলো-সতেরো বছরের অসমীয়া ছেলেটির নাম অতুল ওঝা। সে অত্যন্ত কম কথা বলে। কিংবা জীবনে প্রথম জিপ চালনার দায়িত্ব পেয়ে সে এতই ব্যস্ত যে কথা বলার সময় নেই। আমার সব প্রশ্নের সে শুধু হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়!

যাত্রার আগে কয়েকটি তথ্য আমরা সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম বরপেটা রোডের বাজারে রাত্রির আহার সেরে পরের দিনের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে। কেননা, তারপর মাইল পঁচিশেকের মধ্যে আর কোনো দোকান নেই। চেক পোস্ট থেকে প্রায় মাইল পনেরো দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে ডাক বাংলোতে খাদ্য ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয় না। তবে বাংলোতে আমার নামে একটা ঘর আগে থেকেই রিজার্ভ করা আছে, সে জন্য চৌকিদার আমাকে ফেরাবে না, এবং আমি সঙ্গে চাল ডাল নিয়ে গেলে সে রান্না করে দেবে। মানস অরণ্যে দর্শনার্থী অধিকাংশই সাহেব হয়, তারা সঙ্গে টিনের কৌটোয় খাদ্য ও পাঁউরুটি নিয়ে যায়। ডাকবাংলোয় আলো নেই, আমাদের মোমবাতিও নিতে হবে সঙ্গে করে। বরপেটা রোড বাজারে পৌঁছোবার আগেই নিকষ কালো রাস্তায় জিপ গাড়িটা দু'বার হেঁচকি তুলে থেমে গেল। আমি সচকিতে ওঝাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো?

সে কোনো উত্তর না দিয়ে নেমে গিয়ে বনেট খুললো। আমি নিজেও

কখনো জিপ চালাই নি, গাড়ির যন্ত্রপাতি বিষয়ে কিছুই বুঝি না। ছেলেটির পাশে গিয়ে এমনই উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলুম। ফিনফিনে ধারালো হাওয়ায় বেশ শীত। কলকাতায় এই সময় শীত অনেক কমে গেছে বলে বেশী কিছু গরম বস্ত্র আনিনি। সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগলুম। এতক্ষণ আমি বেশ মজাই পাচ্ছিলুম সব কিছুতেই, কিন্তু রাস্তার মধ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়াটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, মাঝে মাঝে দু'একটা ভারী চেহারার গাড়ি যাচ্ছে এদিক ওদিক দিয়ে, আমার ভয় হলো, এই অন্ধকারে কোনো লরি হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে জিপটা আমাদের ঘাড়ের ওপর ফেলে না দেয়। ছেলেটি আমাদের গাড়ির ব্যাকলাইট জ্বেলে রাখে নি। সেটা জ্বেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হে ওঝা, এ গাড়ি যাবে তো?

সে বললো, হ্যাঁ, যাবে।

আবার কিছুক্ষণ খুটখাট।

এক এক সময় মনে হয়, গাড়িরও বুঝি প্রাণ আছে। অন্তত ইচ্ছা অনিচ্ছা শক্তি আছেই। এই জিপটা বোধহয় তার নিজের ড্রাইভার ছাড়া অন্য কারুর হাতে যেতে চাইছে না। বিশেষত এই রকম একটা বাচ্চা ছেলের হাতে। নইলে, জিপটার বেশ নতুন নতুন চেহারা, হঠাৎ এরকম পঙ্গু হবার কথা নয়।

ছেলেটিও জেদী কম নয় কিন্তু, লেগে রইলো অনেকক্ষণ, এবং শেষ পর্যন্ত কিছু আওয়াজও বার করে ছাড়লো। এবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি স্টিয়ারিং-এ বসে সুইচ দিয়ে অ্যাকসিলেটারে পা দিয়ে বসতে পারবো কিনা। এটুকু আমি পারি। সে রকম বসবার পর, কয়েকবারের চেষ্টায় ইঞ্জিন আবার গর্জন করে উঠলো। তার ফলে, বরপেটা রোড বাজারে পৌঁছোতে আমাদেব সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

একটা ছোট হোটেলে ঢুকে আমরা দু'জনে খেয়ে নিলাম গরম গরম ভাত আর মাংস। অত্যন্ত সুখাদ্য। যাঁরা পাঁঠার মাংস খেতে ভালোবাসেন, তাঁরা এই সব দূরের ছোট খাটো জায়গায় মাছ ডিম বা মুর্গী না চেয়ে মটন কারিই চাইবেন। কারণ এই সব জায়গায় পাওয়া যায় নরম কচি পাঁঠার

ঝোল তার স্বাদই আলাদা। কলকাতার বাজারে ওঠে শুধু ধেড়ে ধেড়ে ছাগল আর রাম ছাগল।

রাত্রির খাওয়া সেরে নিয়ে পরের দিনের জন্য বাজার। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সব এক কিলো করে। ডিম পাওয়া গেল না, মাখনও না। ঠিক আছে, একদিন নিরামিষেই চালাতে হবে। এক ডজন মোম কেনার পর একটা টর্চও কিনে ফেললাম। সিগারেট দেশলাইয়ের স্টকও রইলো।

একটা জিনিস নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, গাড়িতে ওঠার পরও ওঝাকে আবার পাঠালাম দোকানে! কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। যা সঙ্গে না থাকলে আমি খাদ্যে কোন স্বাদই পাই না।

এবারেও গাড়ি স্টার্ট নিতে চাইলো না।

অ্যাকসিলেটরে চাপ দিলে খানিকটা ঘ্যাসঘেসে শব্দ করেই থেমে যায়। গাড়িটি সত্যিই বেয়াদপি করছে। লোকালয়ের মধ্যে গাড়ি খারাপ হলেই কিছু কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে। অনেকে অযাচিত ভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন?

আমি মানস যাবো শুনে কেউ কেউ ভুরু তুললো। মানসে তো কেউ রাত্তিরবেলা যায় না, ঢুকতেই দেয় না ভেতরে।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, আমার জন্য ব্যবস্থা আছে। আমাকে ঢুকতে দেবে।

তখন দু'একজন বললো, এরপর রাস্তা খুব খারাপ। আর কোনো মানুষজন বা দোকানপাট নেই। গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে খুব বিপদে পড়বেন।

ওরা এমনভাবে কথা বলছে, যেন এখানেই সভ্য জগতের শেষ। এরপর শুধু অরণ্য প্রকৃতির রাজ্য

খানিকটা পরে অবশ্য আমারও অনেকটা সেরকমই মনে হলো। লোকজনের সামনে আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্যে গাড়িটা একটু বাদেই চলতে শুরু করেছিলো। কাছাকাছি একটা রেল লাইন পেরিয়ে যাবার অল্প কিছু পরেই পথ গৃহ-বিরল হয়ে এলো, তারপর দু'পাশে শুধু ধু ধু মাঠ। পথের অবস্থা সাংঘাতিক। পথটা এককালে কেউ পাকা করে বানিয়েছিল, তারপর

এর কথা একদম ভুলে গেছে। মাঝে মাঝেই প্রকাণ্ড গর্ত, ঠিক ঘোড়ার পিঠে সওয়ারের মতন লাফাতে লাফাতে চলেছি।

দু'পাশ খোলা জিপ। হু-হু করা ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার হাত পা আড়ষ্ট করে দিচ্ছে একেবারে। গায়ে শুধু একটা পাতলা সোয়েটার। ব্যাগে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি ছিল, সেটা খুলে কয়েকবার কাঁচা চুমুক দিতেই হাত পায়ের সাড়া একটু ফিরে এলো।

জিপ গাড়িটি সত্যিই বড় বেয়াদপ। বেশ বড় কোনো একটা গর্ত লাফাবার পরই হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। গীয়ার বদলাবার সময় মড়-মড় মড়াৎ করে বীভৎস শব্দ ওঠে। যেন সে আমাদের নিয়ে যেতে খুবই অনিচ্ছুক। রেলগাড়ির চলার শব্দের যেমন অনেক রকম ভাষা আছে, তেমনি এই জিপ গাড়িটির গর্জনের মধ্যেও ফুটে ওঠে একটা কথা। 'এখনো ফেরো, এখনো ফেরো'। কিন্তু কিশোর ড্রাইভারটি কিছুতেই অবদমিত হয় না। যতবার স্টার্ট থামে, ততবার সে লাফিয়ে নেমে গিয়ে বনেট খুলে কিসের যেন টুং টাং শব্দ করে। সে আগে কখনো জিপ না চালালেই বা, জিপের যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করতে তার কোনো দ্বিধা নেই। প্রতিবারই জিপটা একটু পরে চলতে বাধ্য হয়। সেইজন্য আমার আর ভয় করে না। মনে হয়, হাতে একটা চাবুক থাকলে ঘোড়ার মতন, এই জিপটাকে বারবার ছপটি মেরে শায়েস্তা করা যেত।

জেনে এসেছি, এর পর আমাদের যেতে হবে একটা চা বাগানের ঠিক মাঝখান দিয়ে। দু'পাশে চা গাছের সারি দেখে বুঝলাম, আর বেশী দেরি নেই, চা বাগানটা পেরুলেই আমরা জঙ্গলের চেকপোস্টে পৌঁছে যাবো। সেখানে যখন এলাম, তখন রাত ঠিক ন'টা।

চেকপোস্টে তালা ঝুলছে, পাশে একটা বড় বোর্ডে এই মর্মে নোটিশ লেখা আছে যে সন্ধ্যে ছ'টার পর আর কারুকে এই অরণ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। সেটা দেখায় বিচলিত বোধ করলুম না আমি। ওরকম অনেক লেখা থাকে, সবাই সব কিছু মানে না।

কাছেই ফরেস্ট অফিস, সেখানে ড্রাইভার ছেলেটিকে পাঠালাম গেট ম্যানকে ডেকে আনবার জন্য। এখানে আরও কয়েকটি বাড়িঘর দেখা

যাচ্ছে, সম্ভবত চা-বাগান সংক্রান্ত লোকেরা থাকে। একজন লোক গান গাইতে গাইতে পায়চারি করছে রাস্তায়। টপ্পা অঙ্গের গান। সম্ভবত শীতের জন্য লোকটির গলায় টপ্পার কাজ বেশী খেলছিল। আমিও গুণগুণ করে একটা গান ধরলাম। 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না' গানটার 'তোমায়' জায়গাটার কাজ আমার গলায় আসে না, কিন্তু এখন বেশ পেরে গেলাম। আহা, কেউ শুনলো না!

ওঝা ফিরে এলো বেশ খানিকক্ষণ পরে। মুখ শুকনো করে জানালো, গেট কীপার বলছে, এখন গেট খুলবে না।

আমি বিরক্তভাবে বললাম, এখন খুলবে না তো কখন খুলবে?

—সারা রাত খুলবে না, কাল সকালে খুলবে।

—সারা রাত তাহলে আমরা এখানে বসে থাকবো নাকি? চলো, আমি যাচ্ছি ওর কাছে। টপ্পা গায়কটি এবার গান থামিয়ে পাশে এসে বললো, গেট খুললেও তো আপনি যেতে পারবেন না। হাতি মহারাজ আটকে দেবে!

আমি বললাম, হাতি জিপ গাড়িকে কী করবে? পাশ দিয়ে চলে যাবো।

লোকটি বলল, সরু রাস্তা, হাতির পাল ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে ভালবাসে, ঠিক এই সময় রোজ বেরোয়—আপনি গাড়ি ঘোরাতে পারবেন না। হঠাৎ ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে!

পথের উটকো লোকেদের কথা আমি একদম বিশ্বাস করি না, কিছু লোক সব সময়েই আলটপকা উপদেশ দিতে আসে।

আর কোনো উত্তর না দিয়ে ড্রাইভার ছেলেটির সঙ্গে আমি গেলাম গেটকীপারের ঘরে!

গেট কীপার নিতান্ত হেলাফেলার লোক নয়। প্যাণ্ট সার্ট পরা, দু' একটা ইংরিজি বলে, তার ঘরে একটা রেডিও টেলিফোনের সেট আছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সে আমার প্রস্তাব একেবারে উড়িয়েই দিল। বললো, অসম্ভব, এত রাতে আমরা কারুকে যেতে দিই না, আপনি যেতে পারবেনই না। সাতদিন আগে হাতি একটা লোককে মেরে ফেলেছে। ভুটানের ডি এফ ও সাহেব রাত্তিরের দিকে দু দু'বার যেতে গিয়েও ফিরে এসেছেন!

আমি বললাম, আমরা তো আর জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরবেলা ঘুরতে যাচ্ছি

া! সোজা গিয়ে বাংলোতে উঠবো। বাংলোতে আজ রাত্তিরের জন্য আমার ঘর রিজার্ভ করা আছে।

লোকটি বলল, এখান থেকে বাংলো একুশ কিলোমিটার দূরে। পুরোটা পথ আপনাকে যেতে হবে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় হাতি রাস্তা আটকে দিলেই আর কোন যাবার উপায় নেই। আপনি গাড়ি ঘোরাতেও পারবেন না। মারা পড়বেন। আজ ফিরে যান, কাল সকালে আসবেন।

আমি একটু দমে গেলাম, এত দূর এসে ফিরে যাবো? এখন আবার বরপেটা শহরে ফিরতে হলে ঘণ্টা দু'এক লেগে যাবে। অত রাত্রে সেখানে গিয়েই বা থাকবো কোথায়, কারুকে তো চিনি না। সারারাত জিপের মধ্যে কাটাতে হবে, এই শীতের মধ্যে? তার চেয়ে ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়াই ভালো। যে-কোনো কারণেই হোক, হাতি সম্পর্কে খুব ভয় জাগছে না মনের মধ্যে। অতবড় একটা জানোয়ারকে দূর থেকে দেখে কোনো ভাবে নিশ্চয়ই পালিয়ে বাঁচা যাবে

এই সব জায়গায় কয়েকটা বড় বড় নাম উচ্চারণ কবলে অনেক সময় কাজ দেয়। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আমি আসামের হোম মিনিস্টারের গেস্ট। চীফ কনজারভেটার অব ফরেস্টের কাছে আমার বন্ধু আমার নামে চিঠি লিখেছেন, আমি আজ অসম সাহিত্য সভায়···

ফল হলো একেবারে উল্টো। লোকটি বললো, আপনি গভর্নমেণ্টের গেস্ট বলেই তো এত চিন্তা করছি। আপনি যে আসবেন, সেকথা আর টি-তে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই দেখুন না, আমার খাতায় আপনার নাম লেখা আছে। কিন্তু আপনার প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে? আপনার কিছু হলে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

আমি বললাম, আপনাদের কাছে পট্‌কা থাকে না?

লোকটি অবাক হয়ে বললো, পট্‌কা? পট্‌কা কি?

এর আগে একবার উত্তরবঙ্গেও জঙ্গলে এক রকম পথজুড়ে হাতি চলাচলের কথা শুনেছিলাম। রাজা-ভাত-খাওয়া ছাড়িয়ে জয়ন্তী নদীর ওপরে যে বন, তার ভেতরের রাস্তার ওপর দিয়ে এক এক সময় পারাপার করে পঞ্চাশ ষাটটা

হাতির পাল। এদিকে, বক্সাইট না ডলোমাইট কি যেন আনবার জন্য ঐ রাস্তা দিয়ে কিছু ট্রাকও যায়। হাতির পালের মুখোমুখি পড়ে গেলে ট্রাক থেকে দুম্ দাম করে পটকা ফাটানো হয়। সেই আওয়াজে হাতির পাল সরে যায়। বুঝলাম, এখানে সে রকম কোনো ব্যবস্থা নেই।

বললাম, আমার প্রাণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সে কথা আমি লিখে দিয়ে যেতে রাজি আছি। এতদূর এসে আমি ফিরে যাবো না।

লোকটি দু'এক মিনিট চুপ করে রইলো। তারপর অসন্তুষ্টভাবে বললো, রেঞ্জার সাহেব এখনো ফেরেন নি, তিনি থাকলে দায়িত্ব নিতে পারতেন। আমি একা···তা ছাড়া···

এবার সে ড্রাইভার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, তাছাড়া এইটুকু একটা ছেলেকে নিয়ে আপনি ঐ সাংঘাতিক রাস্তায় যাবেন? এ তো পারবেই না যেতে! এই ছোকরা, তুই যেতে পারবি?

আমি দম বন্ধ করে অতুল ওঝার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই বিপদের সম্ভাবনার কথাটা আমার মনেই পড়েনি। এ যদি রাজী না হয়, তা হলে আমার আর কোনো আশাই নেই!

অতুল ওঝা বীরের মতন উত্তর দিল, হ্যাঁ আমি সাহেবকে ঠিক পৌঁছে দিতে পারবো। আমি ভয় পাই না।

আমি বুক খালি করা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ছেলেটিকে আমার মনে হলো বন্ধুর মতন। সেই সঙ্গে মনে হলো, ভাগ্যিস, কোনো পুরোনো অভিজ্ঞ ড্রাইভারকে পাওয়া যায় নি। অনেকদিন ধরে সরকারী চাকরি করছে, এমন কোনো ড্রাইভার হয়তো এই অবস্থায় যেতে রাজী হতো না। বহুদিন চাকরি করতে করতে কী রকম যেন একটা ক্ষয়াটে ঘুণধরা মন হয়ে যায়। তখন 'ডিউটি' ছাড়া আর কিছু সম্পর্কেই উৎসাহ থাকে না। নিছক চাকরির খাতিরে কেন একজন ড্রাইভার আমাকে এরকম ঝুঁকির রাস্তায় নিয়ে যাবে এই রাত্তিরে। সে অনায়াসেই বলতে পারতো, না স্যার পারবো না, আমি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমবো! জোর করার কোনো উপায় ছিল না আমার, কারণ আমি অতিথি মাত্র, সরকারী কেউ-কেটা তো নই!

অতুল ওঝার কাঁধে হাত দিয়ে আমি ফিরে এলাম। গেটম্যান অনিচ্ছার

সঙ্গে তালা খুলে দিয়ে বললো, আমি আধঘন্টা অপেক্ষা করবো। খানিকটা গিয়ে বেগতিক দেখলে ফিরে আসবেন। তার পরে এলে কিন্তু আমায় আর পাবেন না। আমার ডিউটি ওভার হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, জেনে রাখলাম, ধন্যবাদ!

অতুল ওঝা বয়েসে প্রায় কিশোর হলেও বেশ বুদ্ধিমান, তা এই সময় বুঝলাম। সে জিপটার স্টার্ট বন্ধ করে নি। এতক্ষণ ধরে জিপটা ধক্ ধক্ করেছে। এই সময়, গেটম্যানের সামনেই যদি জিপটা স্টার্ট নিতে গোলমাল করতো, তাহলে অপমানের একশেষ হতে হতো নিশ্চয়ই। তার বদলে, গেট পেরিয়ে সামনের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো জিপটা।

গেট পেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যরকম অনুভূতি হয় এখন আমরা জঙ্গলের মধ্যে। যদিও সেখানে তেমন কিছু জঙ্গল নেই। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি রাত, ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, চারপাশে প্রায় ফাঁকা মাঠ, এখানে ওখানে দু'একটা গাছ। তবু তো এক ঘোষিত অরণ্যের মধ্যে এসে পড়েছি, এ জায়গাটা বাইরের থেকে আলাদা।

প্রায় দু'কিলোমিটার পথ পার হবার পর জঙ্গল শুরু হয়। তাও এমন কিছু নয়, রাস্তার দু'পাশে বড় বড় ঘাস, এখানে সেখানে ছড়ানো গাছ পালা। দেখলে কোনো ভয়ের অনুভূতি হয় না। রাস্তা বেশ খারাপ, মাঝে মাঝে কাঠের ব্রীজ।

ব্রীজগুলোর চেহারা সুবিধাজনক নয়, দু'পাশে দুটো কাঠের পাটাতন যার উপর দিয়ে গাড়ি যাবার কথা। অনভ্যস্ত হাতে আমার ড্রাইভার এক একবার সেই পাটাতন থেকে বিচ্যুত হচ্ছে আর শব্দ উঠছে ঘট-ঘটাং।

আমি অতুল ওঝার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ রাস্তায় আগে কখনো এসেছো। সে বললো, না স্যার।

—এরকম জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি চালিয়েছো কখনো?

–না, সাব!

–ভয় করছে?

–না, সাব!

-আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো, কি বলো?

—হ্যাঁ, সাব।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হেড লাইটের আলোয় রাস্তার ওররেই দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। ঠিক সচেতন ভাবে নয়, অচেতন ভাবেই বোধহয় আমি দেখে নিলাম চোখ দুটির উচ্চতা কতখানি। খুব বেশী নয়। এবং কাছাকাছি আরও কয়েকটি চোখ।

আর একটু কাছে আসবার পর দেখা গেল কয়েকটি চিত্রল হরিণ ও একটি বড় সম্বর। হরিণগুলি জীপ গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলো দু'তিন পলক, তারপর এক পলক ফেলার চেয়েও কম সময় তাদের সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে, বায়ুতে সাঁতার কেটে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের অন্ধকারে। সম্বরটি দাঁড়িয়েই আছে, দুটি সরল নির্বোধ চোখ, আমরা যখন খুব কাছে, যখন প্রায় একটা লাঠি বাড়িয়েই তাকে ছোঁয়া যায়, সেই সময় তার ঘোর ভাঙলো, পেছন ফিরেই উন্মত্তের মতন লাফিয়ে পড়ল একটা ঝোপে, হুড়মুড় করে শব্দ হলো।

এরপর দেখতে পেলাম কয়েকটি ময়ূর। তারা লীলায়িত ভঙ্গিতে রাস্তা পার হচ্ছিল, আলোয় তাদের পালকের বর্ণ সম্ভার চকিতে ঠিকরে ওঠে, তারা প্রত্যেকেই গ্রীবা ঘুরিয়ে একবার তাকায় গাড়ির দিকে। কী অসম্ভব ক্রুর ভয়াল তাদের চোখ! রাত্রিবেলা যে-কোনো জন্তু জানোয়ারের চোখই অন্যরকম হয়ে যায়। সাধারণ কোনো বিড়াল বা গোরুর চোখও অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোয় অচেনা নিষ্ঠুর হয়ে যায়। রাত্রিবেলা মোষের চোখের চেয়ে উজ্জ্বল কোনো জিনিস আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। ময়ূরের চোখও অন্যরকম। এদের চোখের মধ্যে থেকে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে একরকমের বেগুনি ধরনের আলো।

এক ধরনের পাখির চোখেও এরকম আলো দেখলাম। শুধু এই জঙ্গলে নয়। এর আগেও রাত্রির ড্রাইভে বাইরের ফাঁকা রাস্তায় এই ধরনের পাখি চোখে পড়ে। এরা রাস্তায় শুয়ে থাকতে ভালোবাসে। এগুলো কী পাখি? বাদুড় নয়, গায়ের রঙ গাঢ় খয়েরি, ডানা মেলে শুয়ে থাকে পিচের রাস্তায়, চোখ দুটি আগুনের ফুলকির মতন, গাড়ি খুব কাছে এলে এরা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায়।

আরও কয়েকটি হরিণ ও সম্বর পার হয়ে এলাম। হরিণ যতই সুন্দর প্রাণী হোক, রাত্রিবেলা তারা আমাদের মুগ্ধ করে না। রাত্তিরবেলা দলবেঁধে সংরক্ষিত অরণ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার অনেক আছে। প্রত্যেকবারই দেখেছি, কেউ হরিণ পছন্দ করে না। কারণ ঘুরতে ঘুরতে হরিণ বা বুনো শুয়োরই বেশী চোখে পড়ে, বারবার। কেউ কেউ বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে, 'আঃ হরিণ দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল।' কেননা, তখন সকলেরই আগ্রহ আরও কোনও বড় জানোয়ারের জন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদের দেখা পাওয়া যায় না। আপাতত আমাদের অধীর অপেক্ষা যেমন হাতির জন্য।

খানিক পরে পাশের ঝোপ থেকে দুটি বেশ বড় প্রাণী বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির ঠিক সামনের দিকে ছুটতে লাগলো। জিপের চেয়েও তাদের ছোটার গতি বেশী দ্রুত। প্রথমে বেশ চমকে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল গণ্ডার। সেই রকমই দেহের আকার। জলদাপাড়া ও কাজিরাঙ্গার মতন মানসেও বেশ কিছু এক-খড়্গা গণ্ডারের বাস। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে ভুল ভাঙলো। গণ্ডার নয়, মোষের মতন কোনো জানোয়ার, কারণ খড়্গা নেই, বিরাট পাকানো শিং। হতে পারে বাইসন, নাও হতে পারে, বন-গোরু হওয়াও বিচিত্র নয়, শুনেছি বন-মোরগের মতন বন-গোরুও আছে এ তল্লাটে। ওদের মাথা দুটি আমরা ভালো করে দেখতে পেলাম না, কিছুক্ষণ আমাদের সামনে রেস দিয়ে ওরা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর দশ-পনেরো মিনিট আর কিছু নেই। একটা পাখি পর্যন্ত না। সব দিক নিঃসাড়, নিঃশব্দ। রাত দশটা বেজে গেছে। রাস্তার সামনের দিকে তাকালে মনে হয় যেন একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে চলেছি। দু'পাশের বড় বড় গাছ ওপরের দিকে গোল হয়ে এসে মিলে গেছে, রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু ঘাস। এগুলোকেই বোধহয় এলিফ্যান্ট গ্রাস বলে।

রাস্তা ফাঁকা দেখে ওঝা বেশ জোরে চালাচ্ছে। ছেলেটির আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। কিন্তু আমি ওকে একটু সংযত হতে বললাম। হঠাৎ একটা শায়িত হাতির গায়ে ধাক্কা মারা কোনো কাজের কথা নয়। তখন আর কোনো উপায়ই থাকবে না। তাছাড়া রাস্তা এত খারাপ যে দুর্ঘটনায় মরার সম্ভাবনাই বেশী।

শীতের জন্যই কিনা জানি না, হঠাৎ শরীরে একটা শিহরণ জাগলো, আর কোনো জন্তু-জানোয়ারের দেখা পাচ্ছি না বলেই যেন মনে হচ্ছে, আমরা এবারেই সবচেয়ে বিপদের এলাকায় এসেছি। ভয় ও অস্বস্তি কাটাবার জন্য ব্র্যাণ্ডির বোতল থেকে আর একটা লম্বা চুমুক দিলাম। চোখ দুটি যথাসম্ভব খব করে সামনের দিকে স্থির। দূরের ঝুপসি ঝুপসি গাছপালাকে মনে হচ্ছে হাতির পাল। যেন, যে-কোন মুহূর্তে আমাদের পথ আটকে যাবে।

হঠাৎ মনে হলো, আমি যাচ্ছি কেন? এতগুলি লোক নিষেধ করেছে যখন, তখন নিশ্চিত কিছুটা প্রাণের ঝুঁকি আছে। পথ জুড়ে যদি হাতির পাল শুয়ে থাকে তাহলে এখন কী করবো? অর্ধেকের বেশী রাস্তা পার হয়ে এসেছি। এখন আর ফেরার উপায় নেই। রাস্তার অবস্থা ক্রমশ আরও শোচনীয় হচ্ছে, বিরাট বিরাট গর্তে চাকা পড়ে লগবগ করছে স্টিয়ারিং। একবার পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেলেই শেষ। তাহলে এত ঝুঁকি নিয়ে এলাম কেন? আমি তো কোনো দুঃসাহসী অভিযাত্রী নই, সাধারণ ভ্রমণকারী মাত্র। রাত্তিরটা নিরাপদে কাটিয়ে কাল সকালে নিশ্চিন্তে নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার নিয়েই তো আসা যেতে পারতো। তাতে দিনের আলোয় প্রাণ বাঁচিয়ে প্রকৃতি দর্শন হতো। কিংবা, কাল সকালেও যদি আসবার অসুবিধে থাকতো, এ যাত্রায় হতো না মানস ভ্রমণ, তাতেই বা কি ক্ষতি এমন? এ জীবনে কত কিছুই তো দেখা হয় নি। আমার মনের একটা অংশ আর একটা অংশকে খুব জেদীভাবে প্রশ্ন করতে লাগলো, কেন যাচ্ছি? এমনভাবে যাবার কী মানে হয়, উত্তর দাও। অনেকক্ষণ কোনো উত্তর আসে না। তাতে অস্বস্তি আরও বাড়ে। তারপর মরীয়াভাবে একটা উত্তর পেয়ে যাই। অস্ফুটভাবে বলি, যাচ্ছি, তার কারণ না-যাবারও কোনো মানে হয় না।

এরপর ভেতরটা বেশ হালকা হয়ে যায়। এভারেস্টের শিখর আরোহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন অভিযাত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি বারবার ওখানে যাও কেন? উত্তরে তিনি, সেই বিখ্যাত অভিযাত্রীর নাম মালোরি, সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন, 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার!' আমার উত্তরটাও অনেকটা সেইরকম ভেবে আমি নিজের কাছেই একটু অহংকার দেখাই। এর আগেও

তো কত জঙ্গলে গেছি, কতরকম ব্যবস্থা ট্যবস্থা করে, মানসে নিশ্চয়ই এইরকম ভাবেই আমার যাবার কথা ছিল? তা ছাড়া অনিশ্চয়তা বরাবরই আমার প্রিয়।

মাঝে মাঝে কাঠের সেতু পেরুতে হচ্ছে। সেতুগুলোর অবস্থাও সাংঘাতিক, মনে হয় যেকোনো মুহূর্তে সবশুদ্ধ ভেঙ্গে পড়বে। এইরকম চতুর্থ সেতুটি পেরিয়ে রাস্তাটি সবেমাত্র বাঁক নিয়েছে, এই সময় সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে শব্দ হলো উম্ ম্ ম্ আঁ আঁ—। যেন একটা বাজ পড়লো! খুব কাছ থেকে এবং এত অসম্ভব জোরে সেই শব্দ যে মনে হলো তা আমার বুকে প্রবল ধাক্কা মেরে আমার হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়েছে। ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেললাম।

চিড়িয়াখানায় বাঘের ডাক শুনেছি আগে। কিন্তু নিস্তব্ধ জঙ্গলে তার ভয়াবহ জোর যেন একশো গুণ বেশি। তাছাড়া এমনই আকস্মিক। বাঘের কথা আমি একবারও চিন্তা করিনি তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার ভয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল, মনে হলো যেন আমি মরে গেছি। এবং এত জোরালো শব্দের প্রতিক্রিয়া এই যে তারপর কিছুক্ষণ মনে হয়, পৃথিবীতে আর কোনো শব্দই নেই। সব শব্দ মৃত্যুতে নীরব।

আবার চোখ মেলেই পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওঝার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে, স্টিয়ারিং-এর ওপর তার একটুও দখল নেই, জিপটা এঁকে বেঁকে পাশের দিকে গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্টিয়ারিং-এর ওপর। ডান পা বাড়িয়ে ওঝার পায়ের ওপর দিয়েই এক লাথি কষলাম ব্রেকে।

গাড়িটা থামতেই দ্বিতীয়বার আকাশ ফাটিয়ে বাঘটা ডাকলো। এবার আরও জোরে। মনে হয় পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরেই বাঘটা রয়েছে। বাঁ পাশের জঙ্গলে।

বীর বালকটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয়বার বাঘটা ডাকতেই সে হুড়মুড়িয়ে আমার কোলে মাথা গুঁজলো। আমিও মাথা নীচু করে ফেললাম। কেন তা জানি না। আমরা হাতির জন্য চিন্তিত ছিলাম, বাঘের কথা মনেও স্থান দিই নি, তাই ভয়টা কাটানোর কোন উপায়ই মনে এলো না। সম্পূর্ণ শরীরটা কাঁপছে।

খোলা জীপ, বাঘটা আক্রমণ করলে আমাদের বাঁচার কোনো উপায়ই নেই। অস্ত্র বলতে শুধু আমার হাতের ব্রাণ্ডির বোতল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, বাঘটা আসুক, আমাদের খেয়ে নিক।

কিন্তু বাঘটা খোলা জায়গায় এলো না। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে তীব্র চোখে আমাদের দেখছে। যে-কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বে।

নির্বোধের মতন আমরা গাড়ি থামিয়ে সেখানে চুপচাপ বসে রইলাম দু-তিন মিনিট, যাতে বাঘটার কোনো রকম অসুবিধেই না হয়। বাঘের গর্জনের মধ্যেই বোধহয় এরকম মৃত্যুচুম্বক থাকে। তারপর অতিকষ্টে সেই ঘোর কাটিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার চিন্তা ফিরে এলো। বুঝলাম, থেমে যাবার চেয়ে এগিয়ে যাওয়া সব সময়ই ভালো। চলন্ত গাড়িতে আমরা তবু খানিকক্ষণ বেশী বাঁচবো। যেখানে পিছিয়ে যাবার উপায় নেই, সেখানে সামনে এগোতেই হবে।

আমি ওঝাকে মৃদু গলায় বললাম, চলো।

জিপ গাড়িটাও নিশ্চয়ই বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছিল। কারণ এবার সে স্টার্ট দিতে একটুও দেরি করলো না। সেখানে যদি জিপটা আবার গণ্ডগোল করতো, তাহলে এ কাহিনী নিশ্চয়ই অন্যরকম হতো। কিন্তু এবার অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিতেই জিপটা ব্যস্ত হয়ে সামনের দিকে দৌড়ালো। ওঝার সঙ্গে আমিও ধরে রাখলাম স্টিয়ারিং। গাড়ি চললো মাঝারী গতিতে।

বাঘটা সামনে এলো না, আর ডাকলোও না। এবং এক হিসেবে সে আমাদের বাঁচিয়ে দিল। বোধ হয় তার জন্যই আমাদের বিপদ কেটে গেল, এরপর আর কোনো রকম জন্তু-জানোয়ারই চোখে পড়লো না। যদিও বাঘের পরপর দু বার গর্জন শুনে যে ভয় পেয়েছিলাম, তা কাটতে সময় লাগলো যথেষ্ট। বেশ কিছুক্ষণ মাথাটা দুর্বল হয়ে রইলো।

আরও আধঘণ্টা পর পথের ওপর একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়লো। 'ওয়ে টু আপার বাংলো'। তার পাশে লেখা, অরণ্যের স্তব্ধতা নষ্ট করবেন না। ডানদিকে ঘুরে একটা টিলার ওপরে বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। হাত

গায়ের জড়তা ছাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে একটা বড় নিঃশ্বাস নিলাম। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি দেখে বেশ খুশী ভাব হলো। বেঁচে থাকার অমলিন আনন্দ।

হাঁক-ডাক করে তোলা হলো চৌকিদারকে। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমের থেকেও বেশী বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এগারোটা বেজে গেছে, এত রাত্রে কেউ কোনোদিন তাকে ডেকে তোলেনি। আমরা বে-আইনী আগন্তুক।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম যে আমাদের খাবার-দাবারের কিছু দরকার নেই। বাংলোর একটি ঘর আমার নামে রিজার্ভ করা আছে, সেটি খুলে দিলেই চলবে।

চৌকিদার জিজ্ঞেস করলো, আপনারা এ সময় এলেন কি করে? হাতিতে রাস্তা আটকায় নি?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, না, হাতি কিছু করেনি। কিন্তু বাঘের কথা কেউ আমাকে বলেনি কেন?

বরপেটাতেও বলেনি, চেক-পোস্টেও বলেনি। শুধু হাতির ভয় দেখিয়েছে। যদি জানতাম রাস্তায় বাঘ পড়বে, তাহলে আমি আসতাম না। বাঘের সঙ্গে চালাকি চলে না। কেন কেউ বলেনি?

চৌকিদার বললো, বাঘ? চার নম্বর ব্রীজটার কাছাকাছি?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

চৌকিদার বললো, এখানে চার-পাঁচটা বাঘ মাঝে মাঝে আসে একসঙ্গে।

একটা নয়। চার-পাঁচটা? কিন্তু সে ব্যাপারে কেউ আমাকে সাবধান করে দেয়নি কেন?

চৌকিদার বললো, ওরা এ পর্যন্ত কোনো মানুষ মারে নি। মানুষ দেখলে সরে যায়। আমিও কয়েকবার দেখেছি।

কোন্ বাঘ মানুষ মারবে আর কোন্ বাঘ মারবে না, গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে সে বিচার করার সাধ্য আমার নেই। ডাক শুনেই বুকের অতি পরিচিত শব্দটা থামবার উপক্রম হয়েছিল। এবং পিলে পর্যন্ত চমকে যাওয়া কাকে বলে, সেই তখনই বুঝেছিলাম।

বাংলোটি প্রকাণ্ড। দোতলা অন্ততঃ আটখানা ঘর। চৌকিদার আমার ঘরটা খুলে দিল। এরপর তার শুধু আর একটা কাজ বাকি।

আগে থেকেই আমার জানা ছিল যে ভোর পাঁচটায় পোষা হাতির পিঠে চেপে এখানে জঙ্গলে ঘোরার ব্যবস্থা আছে। ঠিক সেই সময় সেই হাতি আনবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে এখনই।

চৌকিদার বললো, কিন্তু সে তো আগে থেকেই খবর দিয়ে রাখতে হয়। তাছাড়া আপনি একা······আপনার একার জন্য হাতি······

আমি বললাম, হ্যাঁ আমার একার জন্যই হাতির ব্যবস্থা করতে হবে। যা খরচ লাগে আমি দেবো।

তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, ভাই, আগে থেকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি, কিন্তু এসে যখন পড়েছি তোমার অতিথি হয়ে, কষ্ট করে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

লোকটি গজগজানি ধরনের নয়। শান্ত মুখেই রাজী হলো। তাকে এখন কিছু দূরে মাহুতের ঝোপড়িতে গিয়ে খবর দিতে হবে।

আমি বললাম, আর একটা কাজ, ভোর পাঁচটার যদি আমার ঘুম না ভাঙে, একটু ডেকে দিও, আর সেই সঙ্গে যদি এককাপ চা···

সে বললো, সঙ্গে চা-চিনি-দুধ এনেছেন ?

এই রে, আর সবই তো বাজার করে এনেছি, চা কেনার কথা মনেই ছিল না। ভোরবেলা এককাপ চা না পেলে কি করে চলবে ?

চৌকিদার বললো, তার কাছে শুধু চা-পাতা আছে। দুধ-চিনি নেই আমি বললাম, তাই-ই সই। শুধু লিকার গরম গরম—

চৌকিদার চলে গেল। ড্রাইভার ওঝাও গেল তার সঙ্গে। তারপর আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। এতবড় বাংলোটিতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাকি সব ঘর তালাবন্ধ।

এতখানি রাস্তা লম্ফমান জিপে চড়ে এসে বেশ ক্লান্ত লাগছে জামাকাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। চমৎকার নরম বিছানা নতুন মশারি ও কম্বল। কাল ভোরে উঠতে হবে।

কিন্তু আধঘণ্টা শুয়ে থাকার পরও আমার ঘুম এলো না। এতবড় একটা বাড়িতে আমি একা।

ভাগ্যিস আমার সঙ্গে আর কেউ আসে নি এ যাত্রায়। কত দুর্লভ ই একাকিত্ব। শহরে সব সময় মানুষ, সব সময় কেউ না কেউ, সব সময়ে আমাকে থাকতে হয় নিজের পরিচয়ে। আমি কারুর বন্ধু, কারুর ভাই, কারুর কাছে দেনাদার, কারুর কাছে কৃপাপ্রার্থী। এখানে এই মুহূর্তে আমি কেউ না। আমি শুধু আমি।

এরকম রাতটা ঘুমিয়ে নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না

কাচের গ্লাসের ব্র্যাণ্ডি ঢেলে সেটা হাতে নিয়ে উঠে এলাম দোতালায়। হঠাৎ যেন আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। অসাধারণ জ্যোৎস্না ফুটে আছে দিগন্ত জুড়ে। সামনের দিকে যতদূর তাকাই শুধু অরণ্য। যেন সত্যিই আমি পৃথিবীর সমস্ত ইঁটে গড়া সভ্যতা ছাড়িয়ে চলে এসেছি, এরপর বাকি থিবী জোড়া অরণ্য রাজ্য। আমার ডান পাশে একটা বিশাল চওড়া নদী। এই নদীরও নাম মানস। মানস সরোবর থেকে নেমে এসে এই দী এখানে পড়েছে সমতলে, তাই সব সময় সমুদ্রের মতন গর্জমান।

বাংলোর ওপরতলায় একটি বেশ প্রশস্ত কাঁচের ঘর। সেখান থেকে খা যায় নদীর ওপারের স্তব্ধ অন্ধকার বনভূমি। বহুদূর থেকে দুটি পাখি কটান ডেকে চলেছে, টিউ······টিউ······টিউ। রাতে কোন্ পাখি ডাকে আমি জানি না। এমন মধুর সুরেলা স্বরও তো কখনো শুনিনি। মাঝে ঝে বন থেকে আর একটা শব্দ আসছে, এটা ধোপার কাপড় কাচার ব্দের মতন অবিকল। এটা নিশ্চিত কোনো জানোয়ারের ডাক। এত তে জঙ্গলের মধ্যে বসে কে আর কাপড় কাচবে। কোন্ জানোয়ার নি না।

জ্যোৎস্নার মধ্যে আমি নিজেই একটি ছায়ামূর্তি হয়ে সারা বাংলোটি ঘুরে থলাম। হাওয়ায় কোনো জানলা একবার খোলে আর বন্ধ হয়। একটা কনো পাতা উড়ে এসে বারান্দায় পড়ে হঠাৎ আপন মনে ঘুরে ঘুরে খেলা রু করে। আমি তন্ময় হয়ে সেই খেলা দেখি। যেন বহুদিন আগে কেই ঠিক করা ছিল যে, একদিন রাত্রি সাড়ে বারোটায় মানস ডাকবাংলোয়

একটি শুকনো পাতা এইভাবে উড়ে এসে খেলা দেখাবে এবং আমি তা দেখবো।

ডাক বাংলোটির সামনে ধাপ ধাপ ফুলের বাগান নেমে গছে নীচের দিকে। ঘোরানো পথ চলে গেছে নদীপ্রান্তে। বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে সেই পথ ধরলাম। রাত-চরা পাখি দুটি এখনো ডেকে চলেছে, শোনা যাচ্ছে কাপড় কাচার শব্দ। আমার একটু একটু গা ছমছম করছে। কিন্তু ভয়েরও একটা নেশা আছে। যেমন রাত্রির আছে আলাদা জীবন। সচরাচর তো তার সন্ধান পাই না, তাই পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম। বাঘের জন্যই বেশী ভয় এবং এই ভয় বহু শতাব্দীর। তবে বাংলোর এত কাছে নিশ্চয়ই বাঘ আসবে না। যদিও বা আসে, একটু আগে চৌকিদারের মুখে শুনলাম, এখানকার বাঘ এ পর্যন্ত মানুষ মারে নি তাহলে আমাকেই বা প্রথম মারবে কেন? কোনো ব্যাপারেই প্রথম হওয়ার যোগ্যতা নেই আমার।

সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা, অচেনা অন্ধকার, অচেনা পথ। একবার ভাবলাম আসবার সময় একটা টর্চ কিনেছিলাম তো! কিন্তু ফিরে গিয়ে সেটা নিয়ে আসার ইচ্ছে হলো না। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মনে হয় যে টর্চের আলোও শব্দ করে উঠবে।

কয়েকবার সামান্য হোঁচট খেতে খেতেও সামলে নিয়ে পৌঁছে গেলাম

ধারা। একটু ঝুঁকে সেই নদীর জলে হাত দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিলাম। পাহাড়ী নদী সম্পর্কে আমার যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কোথাও কোথাও স্রোত এতই প্রবল হয় যে, ঝোঁক সামলানো যায় না টেনে নিয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। সাধারণ পাহাড়ী নদীর থে অনেক বেশি প্রশস্ত এলাকায় মানস নদী। তাও শেষ-শীতকাল। ব এর রূপ আরও খুলবে। ওপারের ঘন অন্ধকার অরণ্যের দিকে তাকি থাকতে থাকতে এক সময় মনে হয়, ওদিকের সাদা বালির চড়ায় নড়াচ করছে একটি প্রাণী। মানুষ? না, হতে পারে না। বাঘ কিংবা হাতি

নয়, তার চেয়ে ছোট। হতে পারে কোনো কুকুর, শেয়াল বা হরিণ ভালো করে দেখা যায় না, তবু আমার হরিণী বলে মেনে নিতেই সাধ হলো আমি নিজের কাছে আবার জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হরিণী।

হরিণীটি সম্ভবত জলপান করতে এসেছিল, বেশী দেরি করলো না, চট করে আবার আঁধারে মিলিয়ে গেল। তবু সে তার ক্ষণিক উপস্থিতিতে যেন ধন্য করে দিয়ে গেল আমাকে। এই নির্জন প্রদেশে সে আমার সঙ্গিনী ছিল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। এমন জ্যোৎস্না বোধ হয় আমি ইহজীবনে আর কখনো দেখিনি। এই শান্ত নীরবতায় তা যেন উদ্ভাসিত হয়েছে সহস্রগুণ বেশী। এই অরণ্যের মধ্যে চন্দ্রকিরণে ভেসে যাওয়া একা এক নদী, তার পাশে একজন একা মানুষ—এই দৃশ্যটি যেন বহু হাজার বছরের পুরোনো। এবং আমার চতুষ্পার্শ্বের যে রূপ, তার মধ্যে আমি যেন এক নারী সৌন্দর্যের আভাস পাই। এই জ্যোৎস্নার যে-কোন উপমাই নারী। এই স্তব্ধ গহন বনভূমির উপমাও নারী। আমার কাছে নারী সৌন্দর্যই সব সৌন্দর্যের সার। তাই প্রকৃতির কাছে এসেও আমি বাস্তব কোনো নারীর সান্নিধ্য টের পাই। এই জ্যোৎস্নালোক, তার হাস্য, এই আঁধার অরণ্য, তার রহস্যময়তা।

সত্যিই আমি জন্ম রোমান্টিক, আমি না মরলে আমার এই দোষ শুধরোবে না!

এই অপরূপ রাত্রিকে একটি নারী হিসাবে কল্পনা করে আমি রীতিমতন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি, এত শীতের মধ্যেও আমার শরীরে উত্তাপ জেগে ওঠে। বিছানা থেকে কম্বলটা উঠিয়ে এনেছিলাম, সেটা গা থেকে খুলে ফেলে আমি আমার সম্মুখবর্তী শূন্যতাকে আলিঙ্গন করি এবং প্রগাঢ় চুম্বন দিই। চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমনকি শুয়েও পড়ি বালির ওপরে এবং রীতিমতন প্রণয় খেলা শুরু হয়ে যায়।

এর আগে কখনো প্রকৃতির সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে প্রণয় আমার হয়নি। প্রকৃতিকেও এমন বহু ঈপ্সিতা, সম্পূর্ণ নারী হিসেবে আমি পাইনি কখনো। আমি তার শরীরের গন্ধ নিই, বারবার গরম আদর দিই তার ওষ্ঠে, তার শরীরের সঙ্গে শরীর মেশাই।

আবেশে কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর কেঁপে উঠলো। ভয়ে কিংবা শীতে। আর যাই হোক, এখানে ঘুমিয়ে থাকা যায় না। ঘড়িতে দেখলাম, দুটো পাঁচ। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বেশি করে শীত নামে। প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে আমি উঠে পড়লাম। এখনো ঘণ্টা আড়াই বিছানায় শুয়ে আরাম করা যেতে পারে।

ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় চৌকিদার চা এনে আমাকে জাগিয়ে তোলে। আমি জড়তা কাটিয়ে তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে পড়ি। আলস্য করতে গেলেই আলো ফুটে যাবে। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে দৌড়োলাম। এবার টর্চটা সঙ্গে নিতে ভুল হলো না।

ডাক বাংলো থেকে রাস্তাটা নেমে গেছে একটা বাঁধের মতন হয়ে। তারই মাঝামাঝি জায়গায় একটা উঁচু সিমেন্টের মঞ্চ তৈরি করা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ড্রাইভার ওঝাও চোখ ডলতে ডলতে উঠে এসেছে। সেও জঙ্গল দেখবে।

কাছেই দুটো হাতি বাঁধা, একটি বেশ বড়, আর একটা বাচ্চা। অন্ধকারের মধ্যে সে দুটি জমাট অন্ধকার হয়ে আছে। তাদের গায়ে টর্চের আলো ফেললে কান লটপট করে। এরই কোনো একটাতে যেতে হবে: কিন্তু মাহুত কোথায়?

মিনিট দশেক পরে মাহুত এলো তৃতীয় হাতি নিয়ে। এই হাতিটির আকার মাঝারি। মাহুতের চেহারাটি দেখে বেশ পছন্দ হলো। আজকাল অনেক কিছুই ঠিক-ঠাক মেলে না। রাখাল বলতেই যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, সেরকম রাখাল মাঠে-ঘাটে দেখা যায় না। গয়লানীদের যে-রকম ছবি আঁকা হয় সেরকম গয়লানী বহুদিন দেখিনি। সেদিক থেকে এই হাতিটাকে তো হাতির মতন দেখতে বটেই, মাহুতটিও অবিকল মাহুতের মতন। কুচকুচে কালো এবং ছিপছিপে মেদবর্জিত শরীরের একটি যুবক মাথায় পাগড়ি, কোমরে ছুরি গোঁজা ও হাতে ডাঙস। সে কোনো কথা বললো না, ইশারায় আমাকে হাতির পিঠে চেপে বসার কথা জানালো।

হাতির পিঠে হাওদা নেই। একটা দুটো তোশক ফেলে তার ওপর মোটা দড়ি বাঁধা। ঘোড়ার পিঠে বসার মতন এখানেও বসতে হবে দুদিকে

ঝুলিয়ে। কিন্তু ঘোড়ার দু দিকে পা ঝোলানো আর হাতির দু দিকে পা ঝোলানো কি এক কথা হলো? পা দুটি বিসদৃশ অবস্থায় থাকে এবং একটু পরেই বেশ ব্যথা করে। দড়িটাও শক্ত করে ধরে থাকতে হয়। নইলে যে-কোনো মুহূর্তে টাল খেয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

রাস্তা পেরিয়ে হাতি ঢুকলো বনের মধ্যে। তখন সবে মাত্র অন্ধকার পাতলা হতে শুরু করেছে। একটু পরেই বুঝলাম, হাতি যেখান দিয়ে চলেছে, সেখানে গাড়ি-টাড়ি তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও মানুষের পক্ষে যাতায়াত সম্ভব নয়: সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল, গাছে গাছে কোনো ফাঁক নেই বললেই চলে, তাছাড়া রয়েছে লতাপাতার ঝোপ। কিন্তু হাতির গতির মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব আছে, সে কিছুই মানে না, মাঝারি সাইজের গাছও সে মট মটাং করে ভেঙে ফেলে। আমরা মাথা নীচু করে মাথা বাঁচাই। এই সময় মনে হলো, কাল রাত্রে আসবার সময় পথের দু ধারে এরকম অনেক আধভাঙা গাছ দেখেছি, সেগুলি তবে হাতিরই কীর্তি।

ভোরের প্রথম সিগারেটটা ধরালেই বেশ কিছুক্ষণ কাশি হবার কথা। স্মোকারদের এই এক অভিশাপ। কিন্তু সিগারেট ধরিয়েও আমি জোর করে মুখ চেপে রইলাম। কিছুতেই কোনো শব্দ করা চলবে না। সমস্ত বনে হাতির পায়ে চলার শব্দ ছাড়া আর একটাই শব্দ হচ্ছে শুধু। একটা বন-মোরগের ডাক। তীক্ষ্ণ স্বরটা ভেসে আসছে একটা ঘন ঝোপ থেকে। আমরা সেইদিকেই এগোচ্ছি। ভোরবেলা প্রথম সূর্যালোকের বার্তা দিকে দিকে ঘোষণা করার দায়িত্ব এই মোরগজাতিকে কে দিয়েছে কে জানে! আর কোনো পাখির ডাক এখনও শোনা যাচ্ছে না। সেই রাত পাখি দুটিও বুঝি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঝোপটার কাছে আসতেই ঝটপটিয়ে বেরিয়ে এলো বন মোরগটা, অসম্ভব গাঢ় লাল আর হলুদ তার পাখনার রং, আমাদের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে সে উড়ে গেল অনেক দূরে। যেন মাঝপথে বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে তার সঙ্গীতের। তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

হাতিটা মাঝে মাঝে কোনো ছোট টিলার ওপর দিকে উঠছে। কখনো নেমে যাচ্ছে কোনো শুকনো নদীগর্ভে। সেই সময় দুহাতে দড়ি আঁকড়ে

ধরে দেহের ভারসাম্য রাখতে হয়। হাত আলগা হলেই ধপাস্। সমতলে চলার সময় এত জোর লাগে না।

পোষা হাতির পিঠে চেপে বনের মধ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার আরো হয়েছে কয়েকবার। তখন সঙ্গে অনেক লোক। দু তিনটে হাতি, এবং কেউ না কেউ কথাবার্তা বলে ফেলেছে। কিন্তু এবার মাহুতকে নিয়ে আমরা মাত্র তিনজন, এবং আধঘণ্টা হয়ে গেল তবু টু শব্দটি পর্যন্ত করিনি। এই স্তব্ধতাটাও উপভোগ্য।

ক্রমশ কয়েকটি হরিণ ও সম্বর দেখা দিতে লাগলো। চিত্রল হরিণগুলিই বড় সুন্দর, দেখলে আশ্রম মৃগের কথাই মনে হয়। আজ সকালের আলোয় শুধু সম্বর নয়, হরিণগুলিও আমরা খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত পালাচ্ছে না। প্রথমে এর কারণ ভেবে অবাক হয়েছিলাম। হরিণগুলিও কি টুরিস্ট দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে? অপেক্ষা করছে কখন আমি ক্যামেরা বার করবো? তত টুরিস্ট তো এখানে আসে না। একটু পরেই কারণটা সম্যক বুঝলাম। জঙ্গলে হাতির পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, এই আওয়াজ হরিণদের চেনা এবং নিরামিষাশী হাতি সম্পর্কে তাদের কোনো ভয় থাকার কথাও নয়। তারপর হঠাৎ যখন তারা হাতির পিঠে কয়েকটি দু-পেয়ে ভয়াবহ প্রাণীকে দেখছে, তখনই তারা পালাচ্ছে। হরিণের পলায়ন দৃশ্য সত্যি দেখবার মতন। বিস্মিত হয়ে তারা লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, তারপর সময়কে সময়হীনতায় এনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর সম্বরের পলায়নটা একটা জবরজং ব্যাপার, পেছন ফিরতেই অনেক সময় লেগে যায়। আহা, বেচারা সম্বরগুলো এই জন্যই এত সহজে শিকৃত হয়।

আর একটু দূর যাবার পর মাঝে মাঝেই একটা শব্দ কানে আসতে লাগলো। এই পরিবেশে অ-মানানসই। অনেকটা যেন রেলের পুরোনো কয়লা-ইঞ্জিনের মতন। ঘ্যাস ঘ্যাস ঘ্যাস ঘ্যাস! যতবার শব্দটা শুনি, ততবার চমকে উঠি।

কাছাকাছি কি কোনো রেল লাইন আছে? তা হলে আর এমনকি দুর্ভেদ্য অরণ্য! মাহুতকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আবার সেই শব্দ হলো ঠিক মাথার উপরে।

দেখলাম, শকুনের চেয়েও বড় আকারের দুটি পাখি, হলদে আর কালো রঙের, উড়ে যাচ্ছে কাছের গাছ থেকে দূরের গাছে। উড়ন্ত এত বড় কোনো পাখি আমি আগে কখনো দেখিনি। একটু পরেই, আরও কয়েকটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। ধনেশ পাখি ওগুলো, এখানে রয়েছে শয়ে শয়ে। সে বড় বিচিত্র দৃশ্য। তাদের ডানায় অবিকল রেল ইঞ্জিনের শব্দ।

নিস্তব্ধ, অতি আগ্রহী, অধীর মন ও চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছি সামনে। মাঝে মাঝে কোনো জীবন্ত প্রাণী দেখলেই মনে হয় কিছু যেন একটা পেলাম। এক সময় মাহুতকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, গণ্ডার নেই? গণ্ডার কোথায়?

মাহুত বললো, আছে সাহেব, বহুৎ। কিন্তু এই সময় পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে যায়। মাঝে মাঝে দেখা যায়—পরশুদিন আমি দুটো দেখেছি।

আমি তাকে গণ্ডার খোঁজার জন্য তাগিদ দিলাম। সে হাতিকে চালনা করলো বন-বাদাড় ভেদ করে, অন্যদিকে। তারপরেও বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে গণ্ডার পাওয়া গেল না। তখন বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, যেন সবটাই ব্যর্থ হয়ে গেল, তারপর নিজেকে এক ধমক দিলাম।

অরণ্যে এসে অনেক সময়ই অরণ্য দেখাই হয় না। ছেলেমানুষের মতন শুধু জন্তু-জানোয়ার দেখার ইচ্ছেই জাগে। আমারও এরকম হয়! গণ্ডার না দেখলে কী এমন ক্ষতি হবে? গণ্ডার কি কখনো দেখিনি? শুধু চিড়িয়াখানাতেই নয়, উত্তর বাংলার জলদাপাড়াতেও আমার অরণ্যচারী গণ্ডার দর্শন হয়ে গেছে আগে। এখানেও শুধু গণ্ডারের জন্য ছোটাছুটি করে কী লাভ? গণ্ডারের চিন্তা যেই মন থেকে মুছে ফেললাম, অমনি সমগ্র অরণ্যটাই আমার চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে সন্তর্পণে খুব কোমল ও বিনীত সূর্য উঠেছে। এটা সেই ধরনের দুর্লভ একটি ভোর, যখন প্রথম সূর্যের আলো ঠিকরে লাগে চাঁদের গায়ে। আমার সামনের দিকে সূর্য, ঘাড় ফিরিয়ে একবার চাঁদকেও দেখে নিলাম। মনে হয়, এমন যে দেখলাম, এর জন্য নিশ্চয়ই আমার অনেক সুকৃতি জমা ছিল। থোকা থোকা সাদা ফুল ভোরের আলোয় হঠাৎ রক্তিম

মনে হয়। ওড়িশার সিমলিপাল জঙ্গলে এক জায়গায় দেখেছিলাম শুধু অজস্র হালকা ভায়োলেট রঙের ফুল, আর কোনো রঙের ফুল নেই! এক বন্ধু বলেছিলেন, ভূতলে তামা থাকলে নাকি সেখানকার ফুল ঐরকম বেগুনী হয়ে যায়। মানস অরণ্যে বেগুনী ফুল নেই, শুধু সাদা, আর কিছু কিছু টকটকে লাল। কোনোটারই নাম জানি না।

ফুলের চেয়েও এই জঙ্গলে পাখির সমারোহই বেশি। বন-মোরগরা তাদের কর্তব্য সাঙ্গ করেছে। এখন অসংখ্য জাতের পাখি তাদের আলাদা আলাদা সুরে শুরু করে দিয়েছে ঊষার বন্দনা। যেন অরণ্যের শিখরে শিখরে একটা গানের জলসা বসে গেছে।

মাঝে মাঝেই ছোট ছোট জলাশয়। সেরকম একটির কাছে পৌঁছোতেই দেখলাম, পিঠটা কালচে আর বুকের কাছটা সাদা রঙের একজাতীয় হাঁস ঝাঁক বেঁধে দারুণ জোরে এসে জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই উঠে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, চক্রাকারে বাতাস কেটে ঘুরে এসে তারা আবার ঐরকম ভাবে জল ছুঁচ্ছে। এটা কি একটা খেলা? নাকি শীতের জন্য স্নান করতে এসেও ওরা বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারছে না? এত ভোরে স্নান না করলেই বা কি দোষ ছিল? অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম সেই হাঁস-গুলির জল সইতে আসার খেলা। আবার অন্য একটি ডোবায় অন্যরকম। সেখানে খয়েরি রঙের একটু আলাদা চেহারার কয়েকশো হাঁস নিশ্চিন্তে জলে ভেসে আছে। এদের শীতবোধ নেই? আমাদের হাতিটি অবলীলাক্রমে সেই ডোবাটিতে নেমে পড়তেই ফরফর করে অসংখ্য প্রজাপতির মতন তারা উড়ে গেল। ভাগ্যিস ডোবাটিতে হাতিটির হাঁটুজল।

ডোবাটি পেরিয়ে খানিকটা যাবার পর খনিকটা প্রশস্ত প্রান্তর। তার একেবারে শেষ সীমায় গোটা ছয়েক মোষের মতন প্রাণী গোল হয়ে ঘিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ঘরোয়া সভা করছে। মাহুতটি উত্তেজিত-ভাবে বললো, সার বাইসন! প্রাণীগুলি বেশ দূরে এবং ওদিকটায় ঠিক মতন আলো পড়েনি বলে আমি ভালোমতন দেখতে পাচ্ছি না। বললাম, আর একটু কাছে চলো না। মাহুতটি রাজী হলো না। আমিও অবশ্য খুব পীড়াপীড়ি করলাম না তাকে। জঙ্গলের নিয়ম সে-ই ভালো বোঝে।

কাল রাত্রেও যেমন বুঝতে পারিনি, আজ সকালেও তেমন মোষের তুলনায় বাইসনের আলাদা কি বৈশিষ্ট্য তা ঠিক অনুধাবন করতে পারা গেল না।

হাতির মুখ ফিরিয়ে মাহুত জিজ্ঞেস করলো, এবার ফিরবো। বেলা হয়ে গেছে আর বিশেষ কিছু দেখা যাবে না।

আমি একটু জোর করলে সে হয়তো আরও ঘুরতে রাজী হতো। কিন্তু আমারই উৎসাহ কমে গেছে। হাতির দু'দিকে পা ছড়িয়ে বসার জন্য একটা পায়ে রীতিমতন আড়ষ্ট ব্যথা। এছাড়া ঘণ্টা দুয়েক ধরে দড়ি আঁকড়ে থাকার জন্য ঘষে গেছে হাতের তালু। হাতিটা যখন হুড়মুড় করে জলা-ডোবায় নামে কিংবা উঁচুতে ওঠে, তখন যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবার ভয় হয়। বললাম, চলো।

ফিরছিলাম অন্যদিক দিয়ে। এক সময় জঙ্গলের মধ্যকার যে পথ দিয়ে আমরা কাল জিপে এসেছি, সেটা পার হতে হলো। এবং তার একটু পরেই পেছন থেকে অতুল ওঝা আমার পিঠে একটা খোঁচা মেরে বললো, সাব। ডাইনে—

ডানদিকে তাকাতেই আমি একটি বিশাল দৃশ্য দেখতে পেলাম। একটি অতিকায় দাঁতালো হাতি, তার সাদা দাঁত ঝকঝক করছে রোদে এবং নিউ থিয়েটার্সের প্রতীক চিহ্নের মতন সে শুঁড়টা উঁচু করে আছে।

সেটিকে দেখে আমাদের বাহন এবং মাহুত দু'জনেই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো। মাহুত ডাঙস কষাতেই আমাদের হাতিটা দ্রুতগতিতে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে স্থির হয়ে রইলো। সেখানটা রীতিমতন অন্ধকার।

আমি অতি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো?

মাহুত বললো, ঐ হাতিটা একলা ঘোরে, ওটা বড় বদমাস, গুণ্ডা—

একলা হাতিটা যে বিপজ্জনক তা আমার জানা ছিল। সুতরাং বেশ খানিকটা রোমাঞ্চিত হয়ে ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম তাকে।

গুণ্ডা হাতিটা কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়েছিল। আমাদের পলায়ন-কালে সে মাথা ঘুরিয়ে তার খুদে চোখে তাকিয়েছিল কয়েক পলক। কিন্তু সম্ভবত তার মেজাজ এখন প্রসন্ন। সে খুব মন্থরগতিতে হাঁটতে লাগলো। যেন মনে হয়, বড়বাবু মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন। চোখের সামনে

মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে একটি জলজ্যান্ত দাঁতালো গুণ্ডা হাতিকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এটাকে যেন একটা অবিশ্বাস্য সত্য বলে মনে হয়।

মাহুত দাঁতে দাঁতে চেপে বললো, শালা রোডের দিকে যাচ্ছে। এই শালা যখন তখন রোডের ওপর শুয়ে থাকে। তখন মানুষ যেতে পারে না।

তাহলে কাল রাত্তিতে এই হাতি মহারাজের জন্যই সবাই আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল? আমি পেছন ফিরে অতুল ওঝার দিকে তাকালাম। সেও আমার দিকে চেয়ে হাসলো।

কিন্তু হাতিটা রাস্তার ওপরেই শুয়ে থাকে কেন? অন্য কোথাও শুতে পারে না?

মাহুত যা বললো, তাতে বোঝা গেল যে অতবড় একটা হাতির শুয়ে থাকার মতন ফাঁকা জায়গা এই জঙ্গলে বেশি নেই। সেই তুলনায় রাস্তাটাই ফাঁকা, সেটাই ওদের বিশ্রামের জায়গা।

গুণ্ডা হাতিটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর আমরা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ফেরা-পথ ধরলাম। এবং বাংলোয় পৌঁছোবার আগে গণ্ডার না দেখায় ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল আরও দুটি হাতির পাল দেখে। এক-এক দলে দশ-বারোটা হাতি, বুড়ো বাচ্চা মিলিয়ে। একটি দল একটা জলাশয়ে নেমে গোরু-মোষের মতন স্নান করছে! হাতিরা বেশ কৌতুকপ্রবণ। এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে মেতে আছে খেলায়। আমরা পাশ দিয়ে চলে গেলুম ভ্রূক্ষেপও

বাংলোয় ফিরে এক কাপ দুধ-চিনিহীন চায়ের অর্ডার করলাম চৌকিদারকে। গায়ের ব্যথা মারবার জন্য বিছানায় গিয়ে একটু শুয়েছি অমনি শুনলাম, নারীর কলকণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে আবার চলে এলাম বাইরে ঝলমলে রঙীন পোশাক পরা কয়েকটি ভুটিয়া মেয়ে পিঠে একরাশ বোঝা নিয়ে বাংলোর গা-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে নদীর দিকে। আমার দিকে তারা কৌতূহলের সঙ্গে তাকালো, হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে তারপর আকস্মিক হাসির ঝিলিক দিয়ে আবার চলে গেল। তারপর আরও কিছু নারী-পুরুষ ঐ একই রকম পোশাক।

কাল রাত্রে ভেবেছিলাম, চৌকিদার ও আমার ড্রাইভারকে বাদ দিলে

এই জঙ্গলে আমি সম্পূর্ণ একা। কিন্তু মানুষ কোথা থেকে আসছে, কোথায় াচ্ছে?

শুধু চা নয়, কয়েকটা বিস্কুটও জোগাড় করে এনেছে অতুল ওঝা। তার কাছ থেকে কিছু খবর পেলাম। এবং একটু পরে, একজন তরুণ বীট অফিসার এসে আমায় সব কিছু জানালো। এই মানস নদীর ওপারেই ভূটান রাজ্য। এমনকি নদীর এপারেও কিছুটা অংশ ভুটানের এলাকায়। ওদিকে কাছাকাছি কোনো শহর বা বাজার নেই। তাই ভুটানীরা এদিকে আসে বাজার করতে, অনেক সময় দু'দিন তিনদিনের পথ হেঁটে ওরা বাজার করে আনে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, তাহলে এই নদী পার হওয়া যায়? পারে আমরাও যেতে পারি? কোনো বাধা নেই?

বীট অফিসারটি বললেন, না, না, কোনো বাধা নেই। সবাই যেতে পারে।

তৎক্ষণাৎ আমি ওপারে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লুম।

কাল রাত্রে আমি নদীর কিনারে যেখানে এসেছিলাম, তার পাশ দিয়েই াস্তা চলে গেছে উজানের দিকে। খানিক দূরে খেয়াঘাট। স্বচ্ছ, নীলবর্ণ ল। তাকিয়ে থাকলে মাছেদের খেলা দেখা যায়। এই জায়গাটি ট্রাউট ফিশিং-এর জন্য বিখ্যাত, তাই সাহেবদের কাছে আকর্ষণীয়। ছিপ থাকলে ামিও বসে যেতাম। কিছুদিন আগেই নাকি এখান থেকে একজন ত্রিশ কজি ওজনের একটি মাছ ধরেছে।

মানস নদী বেশ খরস্রোতা বলেই পার হবার কায়দাও আলাদা। রাসরি এপার-ওপার করা যায় না। নদী গা দিয়েই লাঠি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা উজিয়ে যেতে হয়। তারপর স্রোতের মধ্যে এসে কোণাকুনি ানিকটা পিছিয়ে এসে ওপারে ওঠা যায়।

এপারেও নিবিড় বন। কিছুক্ষণ সেই বীট অফিসার ও স্থানীয় কিছু াকের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। এখানে সেই কাপড়-কাচার মতন ব্দটির রহস্যেরও মীমাংসা হলো। দু একবার সে-রকম শব্দ হতেই আমি ীট অফিসারটির দিকে তাকালাম। সে বললো, ও হচ্ছে বার্কিং ডিয়ারের াক। এই জঙ্গলে খুব আছে। ওরা দিনে-রাত্রে সব সময় ডাকে।

বীট অফিসারটি আর একটি দুর্লভ জিনিস আমাকে দেখাবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করলো। বনে বনে প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে তা দেখতে পেলাম। ডজনখানেক গোল্‌ডেন লাঙ্গুর। এরা এক জাতের হনুমান। মুখ কালো দারুণ লম্বা লেজ আর গায়ের রং ঝকঝকে সোনালি। খুব উঁচু গাছের মগডালে এরা থাকে, দেখলাম, গায়ে রোদ পড়লেই প্রায় চোখ ঝলসানো সোনালী আভা বেরোয় এদের গা থেকে। এই জাতের হনুমান এখন অবলুপ্তির পথে। সব সমেত বারো কি চোদ্দটি হনুমানের সেই দলটির দিকে তাকিয়ে বড় বিষণ্ণ মায়া বোধ করলাম। এরা ধ্বংস সামনে নিয়ে বসে আছে।

এই বনেও ধনেশ পাখির সংখ্যা প্রচুর। এক এক সময় চেনা যায় যুগল ধনেশ-ধনেশী লম্বা ডানা আছড়ে নদী পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ডাকবাংলোর চৌকিদার বলেছিল, কয়েকদিন আগে দিনে-দুপুরে সে একটি বাঘকেও নদী সাঁতরে এদিকে আসতে দেখেছে। জন্তু-জানোয়াররা এখনো সীমান্ত মানতে শেখেনি। মানস নদীর দু'দিকের অরণ্যের নামই মানস। তাই অরণ্য ও পশুদের সংরক্ষণের যৌথ দায়িত্ব নিয়েছেন ভারত ও ভূটান সরকার।

বীট অফিসারটি শহরের ছেলে, নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, অবিবাহিত, জঙ্গলে সে একলা থাকে। কি করে তার সময় কাটে? কিছু বই আছে তার সঙ্গী, তাছাড়া এরই মধ্যে অরণ্য তার ভালো লেগে গেছে। অরণে সবচেয়ে যা তার ভালো লাগে, সে আমাকে বললো, তা হলো অরণ্যের স্তব্ধতা। 'বুঝলেন, এই যে নদীর স্রোতের শব্দ, এটাও সেই স্তব্ধতারই অঙ্গ।' আমার সন্দেহ হলো, সে কবিতা লেখে।

ভূটানের দিকে কয়েকটি বাড়িঘর আছে। কিছু কিছু কাট-কাটা ব্যাপারও রয়েছে। রয়েছে ভূটানের রাজার একটি সুদৃশ্য বাড়ি। দু পাঁচ বছরের মধ্যেও তার তালা খোলা হয় না। আর একটি বাংলো রয়েছে এদিকে। এখন কেউ নেই। নদীর এপার-ওপারে ভারত-ভূটানের দুটি বাংলোতেই এখন আমিই একমাত্র অধীশ্বর। বীট অফিসারটি বললো, আমি ইচ্ছে করলে ভূটানের বাংলোতেও এসে থাকতে পারি। সেরকম ব্যবস্থা করা যায়

কারা আসে এখানে? উত্তর পাওয়া খুব শক্ত নয়, সাহেবরা। ভারতের দিকে যে আটখানি ঘরওয়ালা বিশাল বাংলোটি প্রস্তুত, সেটিও তো সাহেবদের মুখ চেয়েই। আমাদের দেশে পর্যটনের সব কিছুই তো সাহেব-নির্ভর। ভিখারির জাত, সব সময় কোল পেতে বসে আছি, কখন দয়া করে কোনো সাহেব-দেবতা আসবে। এসো সাহেব, বসো সাহেব, যো-হুজুর সাহেব, একটু ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝুমঝুমি বাজাও তো সাহেব—এই তো আমাদের পর্যটন উন্নয়নের মন্ত্র!

এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই আর একটি আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়লো। নদীর খুব কাছে একটি খড়ের চালের কুঁড়েঘর। তার কাছেই একটা গাছের গুঁড়িতে একটা তক্তা সাঁটা, সেটাতে খড়ি দিয়ে ইংরেজিতে লেখা 'বার'। আমি স্তম্ভিতভাবে বললাম, এখানে বার?

পাপে পায়ে এগিয়ে গেলাম। বার রীতিমতন খোলা। কোমরে ভোজালি গুঁজে ভূটানের জাতীয় পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে বার-টেণ্ডার। অপরূপ সারল্যে উদ্ভাসিত তার মুখ।

বীট অফিসারটি একটু অপ্রসন্নভাবে বললো চলুন, এখানে দেখবার কিছু নেই, এদিকে পাহাড়ের কাছে অনেক পাখি আছে। বুঝলাম সে একটু নীতিবাতিকগ্রস্ত। আমি হেসে বললুম, 'একজন যখন এমন নির্জন জায়গায় বার খুলে রেখেছে, তখন কারুকে তো সেটা প্রেট্রোনাই করতেই হবে।'

সে বুঝলো না, বললো, চলুন, চলুন! তখন আমি তাকে বিদায় জানালুম। সে প্রকৃতি দর্শনে গেল, আমি রয়ে গেলাম সেখানেই।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। সেই খড়ের ঘরের বারে পর পর সাজানো রয়েছে শুধু স্কচ হুইস্কির বোতল। এখানে স্কচ হুইস্কি? বীট অফিসার ও আমি ছাড়া আর একটিও প্যান্ট-শার্ট পরা লোক নেই সেখানে। দাম জিজ্ঞেস করলাম। কলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা হলেও এমন সস্তা নয় যে জঙ্গলের মানুষ কিনতে পারবে। তাদের আয়ত্তের যথেষ্ট বাইরে। তবে, কে খায় এসব?

উত্তর সেই একই। আমাদের মতন দুর্বল দোনা-মোনা নীতি নেই ভূটান সরকারের।

তাঁদের টুরিস্ট বাংলো থাকলেই সঙ্গে বার থাকবে। এই সুদূর জঙ্গলে যেখানে হয়তো বছরে একবার দুবার সাহেবরা আসে, তাদের জন্য। এব মানুষ থাক বা না থাক বার-টেণ্ডার ঠিক তার দোকান খুলে রাখে। পাহাড়ী মানুষরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চলে যায়।

জানি বাঙ্গালী লেখকদের শুধু লেবুর জল খাওয়াই নিয়ম। কোনে সাহেবসুবোর পার্টিতে লেখকের নিজের উপস্থিতি বর্ণনা দিতে গেলে অনিবার্যভাবে এই লাইনটি এসে পড়ে, 'না, আমার চলে না।'

শরৎচন্দ্র মদ খাওয়ার কমপিটিশান দিতে গিয়ে এক সাহেবকে মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু নিজের লেখার মধ্যে কোথাও সেকথা স্বীকার করেন নি

আমি ওসব বুঝি না। এইরকম পরিবেশে আমি কোনোদিন কোনে স্কচ হুইস্কির দোকান দেখিনি। এখানে স্বাদ নিশ্চয়ই আলাদা হবে সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

কয়েকটি জ্যান্ত গাছকে মাঝখান থেকে কেটে ফেলা হয়েছে, গুঁড়িগুলোই এখন বসবার জায়গা। চমৎকার ব্যবস্থা। একপাত্র 'কালো-সাদা'র অর্ডার দিলাম। সুশ্রী বারম্যানটি আমার দিকে পানীয় সমেত গেলাস এগিয়ে দিতে, আমি বললাম থোড়া পানি হোগা? সে তরতর করে ছুটে গিয়ে নদী থেকে এক বোতল জল নিয়ে এলে। সেই পবিত্র মানস সরোবরের জল মিশিয়ে স্কচ পান করতে করতে আমি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলাম আমি এইসব মজা একা একা বেশ উপভোগ করি।

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একঝাঁক টিয়াপাখি। নদীর ধারে রাস্তা দিয়ে উঠে এলো সাত-আটটি ভুটানী যুবতী। তাদের পোষাকে সবুজ ও লাল রঙের প্রাধান্য। তাদের দিকে তাকালে তারা চোখ সরায় না, হঠাৎ হঠাৎ হেসে ওঠে। টিয়াপাখির ঠোঁটের রঙের সঙ্গে তাদের ঠোঁটের মিল আছে একটু পরেই তারা জঙ্গলের মধ্যে মিশে যায়। আবার আর একটি দল জল থেকে উঠে আসে। একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে একটি বার্কিং ডিয়ার অনাবশ্যকভাবে ডেকে ওঠে দু'বার। দুটি সারস ধরনের পাখি মানসের ঠিক মাঝখানে জলের কাছেই গোল হয়ে ঘুরছে ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে তাদের ছায়া।

মাথার টুপিতে লম্বা একটা ধনেশ পাখির পালক গোঁজা এক বুড়ো আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে সহস্র ভাঁজ। সে আমাকে বললো, সেলাম সাব! আমিও বললাম, সেলাম। সে আবার বললো, সেলাম। আমিও। সে-ও আবার। এই খেলাটা আমি জানি। গহন অরণ্য হোক বা ধূ-ধূ করা মরুভূমি হোক, যেখানেই পানশালা আছে, সেখানেই এরকম একটি চরিত্র থাকবেই। বৃদ্ধটি আমার গেলাসের দিকে দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে।

'আমি বললাম, ওরে বাবা, বড্ড দামী জিনিস। তোমায় বেশী খাওয়াতে পারবো না। আচ্ছা দাও ওকে এক পেগ।

সে তৎক্ষণাৎ আমার পাশের কাটা-গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ে বললো, সাহেব, শের দেখবে? আমি তোমাকে শের দেখাতে পারি। আর রাইনো, সাব, এক এক শিং রাইনো, পাইথন, ইতনা মোটা—

বুঝলাম, অ্যামেরিকান টুরিস্টদের সে এইভাবে ভোলায়। আমি বললাম, আমার কিছু দরকার নেই। কিন্তু তোমাকে বেশী খাওয়াতে পারবো না।

তিন পাত্তর খেয়েই আমি উঠে পড়লাম। লোকটি বড় বেশী কথা বলছিল। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর আমার পছন্দ হচ্ছিল না তখন।

নদীর ধার দিয়ে একা একা হাঁটতে লাগলাম ওপরের দিকে। নানা আকারের পাথর ছড়ানো। ভাবতে ভালো লাগে যে, এইসব পাথর এসেছে শ শ মাইল দূরের মানস সরোবর থেকে। কয়েকটি পাথর কুড়িয়ে নিই, রং ও আকৃতি দেখে সংগ্রহ করতে করতে দু'হাত ভরে যায়। এসব কিছুই জমানো যায় না, তাই আবার একটি একটি করে ছুঁড়ে দিই জলের মধ্যে। একটা পাথরও নদীর এপার থেকে ওপারে পৌঁছে দিতে পারি না।

এক জায়গায় পাতলা জঙ্গল দেখে বসে পড়লাম। বেশ চড়া হয়ে রোদ উঠলেও এখানে গাছের ছায়া। পরিষ্কার বালি। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ি। দু'পাশে গম্ভীর পাহাড় আমাকে দেখছে। জঙ্গল থেকে যে-কোনো সময় যে-কোনো একটি জন্তুর বেরিয়ে আসা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু ভয় আসে না। শুয়ে শুয়ে দেখি পাখিদের ওড়াউড়ি। কী অদ্ভুত তীব্র নীল

এখানকার আকাশ। মানস সরোবর কী রকম, এই আকাশের মতন? একদিন যেতে হবে।

হাত থেকে খসে পড়ে সিগারেট, ঘুম আসে। মনে হয়, এখানেই শুয়ে থাকবো, আর কোনোদিন কোথাও যাবো না। বহুদিন আগে আমি এখানেই ছিলাম, কেন দূরে চলে গিয়েছিলাম ভুল করে? আর ভুল করবো না। পাতার ফাঁক দিয়ে একটি রোদের রেখা এসে পড়ায় আমি দু'হাতে চোখে চাপা দিই।

আমার এই অরণ্য বৈরাগ্য মাত্র দেড়ঘন্টা স্থায়ী হয়। অতুল ওঝা ঠিক আমাকে খুঁজে বার করেছে। ডাক বাংলোতে ততক্ষণে খিচুড়ি রান্না তৈরি বলে সে আমাকে তাড়া দেয়।

আমিও উঠে পড়ি। এবার ফিরতে হবে। ফিরতে তো হয়ই।

চব্বিশ

নদীর নাম হাতানিয়া-দোয়ানিয়া। কোনো নদীর এমন অদ্ভুত নাম আমি আর শুনিনি। কী এর মানে? কোন উদ্দাম কল্পনায় এরকম নাম দেওয়া যায়! অথচ নামটা বেশ সুন্দর, বেশ ঘরোয়া, খুব আপন আপন। সুন্দরবন এলাকায় অনেক নদীর নামই খুব মধুর। যেমন ঠাকুরান, যেমন মৃদঙ্গভাঙা। তবু হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নামটিই আমার বেশী পছন্দ। এর সমতুল্য নামের আর একটা নদী আমি পেয়েছিলাম, সেটি আসামে, তার নাম ঝাটিংগা।

হাতানিয়া-দোয়ানিয়া ছোট নদী হলেও বেশ তেজী। কলকাতা থেকে মাত্র সত্তর-আশী মাইল দূরে সমুদ্র থাকলেও আমরা যে সরাসরি বাসে চেপে বা গাড়িতে সমুদ্রের কাছে পৌঁছে যেতে পারি না, তার কারণ এই নদীটি শুয়ে আছে নামখানার পাশে। এর ওপর একটা সেতু বানানো যায় না? যায় নিশ্চয়ই, তবে যেমন তেমন সেতু বানালে চলবে না, সেটি বানাতে হবে বেশ উঁচু করে কারণ এই নদী দিয়ে অনেক বড় বড় মাছবাহী নৌকো যায়,

ানীয় বাণিজ্যের জন্য যে-গুলি খুব জরুরী। তবু সেরকম একটা সেতুও ক বানানো যায় না? যাবে না কেন, কিন্তু কে-ই বা তা নিয়ে মাথা ামাচ্ছে?

হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার বুকে একটা ছোট্ট ছিমছাম সপ্রতিভ লঞ্চে চড়ে ত্রা শুরু হলো। বিকেলের পাতলা রোদকে চাদরের মতন উড়িয়ে সুপবন ইছে। আমরা কয়েক বন্ধু লঞ্চের ওপরের ছোট ক্যাবিনে জমিয়ে বসলাম। নিকটা দূরে যেতে যেতেই নদীর দু'ধার গৃহ-বিরল হয়ে এলো, ধু-ধু করা ঠ, মাঝে মাঝে এক-একটা একলা গাছ। নদীর ধারে এখানে সেখানে তীক্ষমান এক পায়ে-খাড়া হয়ে থাকা বক। পরিচিত দৃশ্য।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এসে পড়লাম একটা বড় নদীতে। এ নদীর ম সপ্তমুখী। নদী তো নয়, গোলোকধাঁধা। সাতনরী হারের মতন নদীটি ড়িয়ে আছে, এর কোন মুখ যে কোথায় গিয়ে পড়েছে, একবার দুবার তায়াতে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য।

এবার আর নদীর দু'ধার রুক্ষ নয়, ঘন গাছের দেওয়াল। আমরা ঢুকে ড়ছি সুন্দরবনে। বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, চোখ দুটি যেন ব কিছু হাঁ করে গিলতে চায়। এর আগে আমি আসাম, বিহার, ওড়িশা, ধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশের অনেক জঙ্গলে ঘুরেছি, এমন কি জঙ্গল দেখতে ছি সুদূর আন্দামানও, কিন্তু ঘরের কাছেই সুন্দরবন, পৃথিবীর বিখ্যাত রণ্যগুলির একটি তা-ই আমার দেখা হয়নি এতদিন। এক একটা ব্যাপার ক যেন হয়ে ওঠে না। যেমন, আমি শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস-খানা ড়িনি। শরৎচন্দ্রের অন্য সব বই একাধিকবার পড়া, অথচ এই বইখানা তের কাছে পাইনি বা যে-কারণেই হোক, পড়া হয়ে ওঠেনি। লোকে যখন হদাহ' নিয়ে আলোচনা করে, চুপ করে থাকি। তেমনি সুন্দরবন সম্পর্কেও।

আমরা যে-দিকটায় যাচ্ছি সেদিকটা সুন্দরবনের আসল ভয়াবহ দিক য়। ক্যানিং থেকে গোসাবা হয়ে ঢোকা যায় নিবিড় সুন্দরবনে, সেখানকার টা ব্লক ইত্যাদি রোমহর্ষক জায়গা। সেদিকে এখনো যাওয়া হয়নি, কদিন যাবো নিশ্চয়ই। অবশ্য আমরা যেদিকে চলেছি সেদিকেও ধনচে কি বাঘ আছে। তাই নামখানার টাইগার প্রজেক্টের বোর্ড ঝোলে।

ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউগুলো ধাক্কা মারে তীরের নরম মাটিতে। মা
মাঝে ঝুপ ঝুপ করে পাড় ভেঙে পড়ে। সেইদিকে তাকিয়ে আমা
ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। এক একজনের এক একরকম অনুষঙ্গ
আমার ছেলেবেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নদী-নালা-খাল-বিল। জলের দে
বাল্য ও কৈশোরের কিছু বছর কাটিয়েছি। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি
খেলা করতে যাবার সময় মাঝখানের খানিকটা জায়গা সাঁতরে পার হ
যেতে হতো। একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি নৌকোয়, ছোট খাল, দু'পা
ঝুঁকে পড়েছে গাছপালা, স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখা যায় খলসে আর চাঁ
মাছ। (খলসে মাছ কি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে? বহুকা
দেখিনি।) ফরিদপুরে আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিল এ
দুর্ধর্ষ নদী, নাম আড়িয়েল খাঁ—পাড় ভাঙার জন্য বিখ্যাত। কতদি
সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি ঝুপঝাপ করে পাড় ভেঙে জলে পড়ে যাচ্ছে
তখন নদীর কূল ভাঙার সঙ্গে জীবন বা সংসারের কোনো উপমা মনে আস
না, এমনিই দেখতে দেখতে শিহরণ জাগতো।

—ঐ যে একটা কুমীর।

ডেক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। কুমীর দেখার জন্য আমরা হুড়মু
করে বাইরে এলাম। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরী, তপন বন্দ্যোপাধ্যা
ও আমি। এছাড়া সেচ ও শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন অফিসার, আম
যাঁদের অতিথি। কিন্তু আমরা ঠকে গেলাম, চিৎকারকারী আমাদের স
ঠাট্টা করছিলেন। কুমীর টুমির কিছু নয়, চরের ওপর পড়ে আছে এক খ
পোড়া কাঠ। কুমীর এরকমভাবে শুয়ে থাকে বটে কিন্তু আমাদের খু
করার জন্য সেদিন কোনো কুমীর একবারও চরের ওপর রোদ পোহাতে এ
না। আমরা ক্যাবিনের জানলা দিয়ে এমন ব্যগ্রভাবে তাকিয়েছিলাম ে
যেকোনো মুহূর্তেই একপাল হরিণ কিংবা একটা জ্যান্ত বাঘ দেখে ফেলবে
কিন্তু একটাও জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। শুধু একটানা বোবা জঙ্গল।

প্রথম দর্শনে সুন্দরবনকে একটুও সুন্দর লাগে না। মনে মনে আমি এ
অরণ্যের অন্য একটি চিত্র এঁকে রেখেছিলাম। বস্তুত, আগেকার দেখা অ
কোনো বনের সঙ্গেই সুন্দরবন মেলে না। অন্য সমস্ত নিবিড় বনে দেখে

বিশাল বিশাল বনস্পতি, শাল, সেগুন, জারুলের গগনচুম্বী স্পর্ধা। কিন্তু সুন্দরবনের গাছগুলো ছোট ছোট, একতলা দেড়তলা বাড়ির চেয়ে বেশী উঁচু নয়। ভেড়ার লোমের মতন অত্যন্ত ঘনভাবে জড়ামড়ি করে আছে গাছগুলো। দেখলেই বোঝা যায়, তারা অত্যন্ত জেদী ও শক্তিশালী, তাদের মোটামোটা শেকড় লম্বা হয়ে মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। জোয়ারের সময় নদী অনেকটা ঢুকে যায় বনের মধ্যে, আবার জল নেমে আসার পর জমে থাকে থকথকে কাদা, সেই কাদা ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে থাকে অজস্র শূল। এবং সেই কাদার ওপরে কানকো দিয়ে হাঁটা চলা করে এক রকমের মাছ। মেঘ ডাকলে কই মাছকে অনেক সময় ডাঙার ওপর দিয়ে চলতে দেখেছি—এছাড়া যখন তখন স্থলে ভ্রাম্যমাণ এই একটাই মাছ আমার চোখে পড়েছে চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় যে মাছের সঠিক বাংলা নাম কেউ জানে না, এক একজন এক একরকম বলে। নোনা জল ঢুকলে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই নোনা জল খেয়েই সুন্দরবনের গাছপালা এত তেজী ও স্বাস্থ্যবান। শুনেছি সুন্দর ওরফে সুঁদরি গাছের জন্যই সুন্দরবন নাম। সে গাছ একটাও দেখলাম না। শোনা গেল, পূর্ববাংলা ওরফে বাংলাদেশের দিকে কিছু আছে। এ পাশে আর চোখে পড়ে না। আর এক রকম গাছ খুব বেশী, যার স্থানীয় নাম বাইন। আর সব গাছের নাম জানি না।

নদীর ধারের দিকের গাছগুলি অধিকাংশই হিন্তাল বা হেঁতাল, এরকম শুনলাম। আবার অবাক হবার পালা। মনসামঙ্গল কাব্যে পড়েছিলাম, চাঁদ সদাগরের হাতে সব সময় একটা হিন্তালের লাঠি থাকতো। আগে জানতাম না হিন্তাল গাছ কী রকম, কিন্তু চাঁদ সদাগরের লাঠি নিশ্চয়ই একটা বেশ শক্তপোক্ত জিনিস হবে। কিন্তু এ গাছগুলো তো বেঁটে ঝোপের মতন অনেকটা বেত ও খেজুর গাছের সংমিশ্রণ বলে মনে হয়। পাতাগুলো সবুজ হলদেতে মেশানো, বাঘের ক্যামুফ্লাজের পক্ষে আদর্শ। বাঘেরা এই হিন্তালের ঝোপেই লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। পরে অবশ্য কাছ থেকে দেখেছি, হিন্তালের দু'একটা ডাল বেশ লম্বা হয়, তা দিয়ে ভালো লাঠি বানানোও যায়। হেঁতালের ঝোপগুলো দেখে মনে পড়ছিল মানগ্রোভের

কথা, যা প্রচুর দেখেছি আন্দামানে। সেখানে অবশ্য নদী নেই, খাঁড়ি বা ক্রীত। তার মধ্যে এক গলা নোনা জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানগ্রোভগুলোর ডাকাতের মতন স্বাস্থ্য।

খানিক বাদেই অন্ধকার হয়ে এলো। এখন দু'পাশে শুধু নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটাও বাঘের ডাক শুনিনি তবু কি রকম গা ছমছম করে। নদীর বুকে আমাদের লঞ্চের জোরালো সার্চলাইট একটা আলোকপথ তৈরি করে রেখেছে, তাতে মাঝে মাঝে দেখা যায়, দু'একটা মাছ ধরার নৌকোর টিমটিমে আলো। দূরে এক জায়গায় দেখা বায় জলের বুকে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। না আলেয়া নয়, কাছে গেলে দেখা যায়, একটা বড় স্টিমার বা গাধাবোট, তাকে ঘিরে সাত আটটি নৌকো। এরা বাংলাদেশের ব্যাপারী এরকমভাবে থেমে থেমে সাত আট দিনে পৌঁছোয়। এখানকার ডাঙায় যেমন বাঘ-কুমীর, তেমনি জলে বড় ডাকাতের উপদ্রব।

ওয়ালস ক্রীক, কারজন ক্রীক, চালতাবুনিয়া, জগদ্দল—এইসব অদ্ভুত নামের খাঁড়ি-নদীর পাশে পাশে পাথরপ্রতিমা, শিবগঞ্জ, কিশোরী নগর—এ ধরনের নামের গ্রাম। এরই মধ্যে একটি ভাগবতপুর; এখানে আছে কুমীরের চাষ। আমরা ভাগবতপুরে দিনের আলো থাকতে থাকতেই একবার লঞ্চ থামিয়ে নেমে পড়েছিলাম। লঞ্চ থেকে একটা কাঠের তক্তা বেয়ে নামতে গিয়ে একজন পড়লো কাদার মধ্যে, আমি ভাঙা-ঝিনুকে পা কেটে ফেললাম। ভাগবতপুর—এরকম জমকালো নাম সত্ত্বেও ঘড়বাড়ি ক্বচিৎ চোখে পড়ে। এখানে নারকোল চাষের সরকারী পরিকল্পনায় খুব ধুমধাম করে নারকোলের চারা লাগানো হয়েছিল কয়েক হাজার। তার অধিকাংশই শুয়োরে খেয়ে গেছে কিংবা লোকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কুমীর প্রকল্পটি অবশ্য সত্য তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এখন আর কুমীর নেই, তাই ভারত সেই সব দেশে কুমীর বিক্রি করে বিদেশী মুদ্রা আনবে। বাঘ-সিংহ-কুমীর জাতীয় প্রাণীরা স্মরণাতীত কাল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত ছিল মানুষের শত্রু, মানুষ ওদের হাতে মরেছে কিংবা ওদের মেরেছে। এখন সেই মানুষই যত্ন করে ওদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এখন বাঘ যদি

মানুষ মারে, তার কোনো শাস্তি হবে না, কিন্তু মানুষ যদি বাঘ মারে তার জেল হবে নির্ঘাৎ। মানুষ বড় মজার জাত।

সুন্দরবনের নানা জায়গা থেকে ধরে আনা হচ্ছে কুমীর, কিংবা খুঁজে আনা হচ্ছে কুমীরের ডিম। তারপর জলের উত্তাপ মেপে, তাদের রুচিমতন খাদ্য দিয়ে অনেক তরিবৎ করে লালন করা হচ্ছে তাদের। পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো জলে পা ধুয়ে আমরা ঢুকলাম একটা হলঘরের মতন খাঁচাঘরে কুমীরের বাচ্চা দেখতে। চল্লিশ বেয়াল্লিশটা বাচ্চা কুমীরকে ডিম ফুটিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন চৌবাচ্চায়। এক একটা গিরগিটির চেয়ে একটু বড়, কাছে গেলেই ধারালো দাঁত মেলে হাঁ করে আসে। একবার ধরতে পারলে খুবলে মাংস তুলে নেবে। আমরা মুখ দিয়ে উৎকট শব্দ করে ওদের ভয় দেখাই। একসঙ্গে এতগুলো কুমীরের বাচ্চা। জীবনে আরও কত কিছু দেখবো। সন্ধে হবার আগেই লঞ্চে ফিরে এলাম।

আমাদের গন্তব্য সীতারামপুর। সেখানে সেচ বিভাগের একটা ছোট বাংলো আছে। এর পর আর জনবসতি নেই বললেই চলে। অদূরে সমুদ্র। আমরা কয়েক বন্ধু রাত্রে লঞ্চেই থেকে গেলাম হৈ হৈ করে জেগে, আধো-ঘুমিয়ে। ওপারের ধনচে জঙ্গলের বাঘরা আমাদের সেই কোলাহলে বিরক্ত হয়েছিল কিনা কে জানে।

সকালবেলা সাগরের মোহনা পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করেও ফিরে আসতে হলো। জোয়ারের জল ঢুকছে তার মধ্যে আমাদের লঞ্চটা মোচার খোলার মতন টাল-মাটাল। সারেং চটপট লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে ফেললো।

ফেরার পথ ওপারের জঙ্গল ঘেঁষে। পারমিট ছাড়া এই জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। আমাদের কাছে সেসব কিছুই নেই। ঠাসা, জমজমাট অত্যন্ত বন্য ধরনের বন, এর ভেতরে হাঁটতে গেলে দু'হাতে বন ঠেলে ঠেলে যেতে হবে। তবু একবার যেতে ইচ্ছে করে। চরের ওপর বসে আছে এক ঝাঁক খয়েরি রঙের বুনো হাঁস, হাওয়ায় গাছের ডগাগুলো দুলে দুলে উঠছে, জোয়ারের জল বেড়ে উঠছে লকলক করে। এ সময় কোনো ভয়ের চিন্তা মনে আসে না। ইচ্ছে হয় এক ছুটে জঙ্গলটা একবার ঘুরে আসি।

সারেংকে বললাম, একবার লঞ্চটা থামান না। এখানে তো দেখবার কেউ নেই। আমরা একটুখানি ঘুরেই চলে আসবো।

সারেং কিছুতেই রাজি নয়। মানুষটি বেশ সদালাপী' এর আগে আমাদের অনেক উপদ্রব সহ্য করেছেন। কিন্তু এবার বললেন, না বাবু, আপনারা জানেন না সুন্দরবনকে বিশ্বাস নেই। কখন কোথা থেকে যে বিপদ ঘটে যায়, কিছুই বলা যায় না। এই তো সেদিন একজনকে···পাড়ে নামা মাত্তরই বাঘ এসে···

এর পর তিনি আমাদের একটি রোমহর্ষক কাহিনী শোনান। সুন্দরবনের বাঘের এরকম অত্যাচার কাহিনী আমরা আগেও পড়েছি বা শুনেছি। এই টাটকা কাহিনীটিও যে সত্য তার প্রমাণ হিসেবে, সারেং বললেন, আহত ব্যক্তিটিকে এখনো মুমূর্ষু অবস্থায় কাকদ্বীপের হাসপাতালে দেখা যেতে পারে। অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু আমরা একটু ক্ষুন্ন হয়ে রইলাম।

একটু পরে দেখি যে একটা খুব সরু খাঁড়ি দিয়ে একট ছিপ নৌকোয় দু'তিনজন লোক ঢুকছে ঐ জঙ্গলে। আমরা বললাম, ঐ যে লোকগুলো যাচ্ছে ওদের ভয় নেই ?

এ প্রশ্নে · উত্তর না দিয়ে সারেং বিচিত্রভাবে হেসে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তখনই বুঝলাম আমাদের মুর্খামি। যারা প্রতিদিন না খেতে পেয়ে মরে যাবার দুশ্চিন্তা নিয়ে বেচে আছে, তাদের কি বাঘের ভয় পেলে চলে ? এ আর নতুন কথা কী ?

পঁচিশ

দহিজুড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই জিপ গাড়িটা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলো। ড্রাইভারের পাশে আমি, তারপর স্বাতী। পেছনে কল্যাণ এবং চারটি মুর্গী।

প্রথমে একটু একটু ধোঁয়া, তারপর মোষের শিং-এর মতন, তারপর কারখানার চিমনির মতন। আমরা টপাটপ নেমে পড়লুম, ড্রাইভার এসে বনেটটি খুলে ফেললেন। 'যত্র ধূমাৎ তত্র বহ্নি' লজিকের এই সূত্রটিকে সত্যি প্রমাণিত করে হুহু করে জ্বলে উঠলো আগুন, ড্রাইভার যুবকটি ব্যাটারি সংলগ্ন তারটি টানাটানি করে ছেঁড়ার চেষ্টা করেও পারলেন না। এর মধ্যে পথের দু'মুখে অনেকগুলো গাড়ি থেমে পড়েছে। তার মধ্যে একটা বাস এবং তাদের সবগুলির ড্রাইভার এক যোগে নানা রকম বিপরীত পরামর্শ দিতে লাগলো ও লাগলেন, ব্যাটারির তারটা টেনে ছেঁড়ার সাধ্য হলো না কারুরই।

স্ত্রী জাতি সহজেই উদ্বিগ্ন হয়, আর এখানে তো যথেষ্ট কারণই রয়েছে। স্বাতী শুকনো মুখে বললো, যাঃ। অর্থাৎ আমাদের আর যাওয়া হবে না।

আমি তাকালুম কল্যাণের দিকে। পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরা কল্যাণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে নির্লিপ্ত মুখে। সে যেন একজন পথের দর্শক, অন্য কারুর গাড়িতে আগুন লেগেছে, সে দেখছে। বেশ সুস্থিরভাবে পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে একটি ধরালো। পায়জামা, পাঞ্জাবিতে কল্যাণকে বেশ নিরীহ দেখায়, প্যান্ট শার্টে তার দৃঢ়-চওড়া চেহারাটা বেশ পরিষ্কার হয়। তখন তাকে মনে হয় বহুযুদ্ধে পোড় খাওয়া একজন সৈনিক।

তার পোড়ার পট পট শব্দ হচ্ছে, আমার ধারণা এক্ষুনি এই পুরো জিপ গাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলবে, মালপত্রগুলো অন্তত নামিয়ে ফেলা যায় কি না ভাবছি, এই সময় একজন ড্রাইভার একটা ছোট হাত-করাত এনে

ব্যাটারির তার কেটে দিতেই আগুনের মূল প্রতাপটা কমে গেল। তারপর জ্বলন্ত তারগুলোকে নেভাবার চেষ্টা।

কল্যাণ রাস্তার পাশে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই বললো, দেখেছেন সুনীলদা, এই সময় মাঠ ধানে ভরে যাবার কথা, কিন্তু এবার এখনো ভালো করে বৃষ্টিই হলো না—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, গাড়িটার কি হবে! কল্যাণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ও ঠিক হয়ে যাবে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, গাড়ির বনেটের নিচে যে তারের জঙ্গল থাকে তা অধিকাংশই পুড়ে কালো কালো, এই অবস্থায় গাড়ি চলার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবু কল্যাণের কথায় অবিশ্বাস করতে পারি না।

সেই কবে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', তার একটি চরিত্র কাটসিনস্কির কথা মনে পড়ে। যে কোনো পরিবেশের মধ্যে এই ধরনের মানুষ একটুও ঘাবড়ায় না। সব সময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে পারে, সব ঠিক হয়ে যাবে! কল্যাণ কথা বলে খুব কম, অনেক কথায় উত্তর দেয় শুধু হেসে। ঝাড়গ্রামে ওকে বলেছিলুম, কল্যাণ, অনেকবার তো এদিকে এলুম, কাঁকড়াঝোড়টা একবারও দেখা হলো না, স্বাতীরও খুব যাওয়ার ইচ্ছে, একটা জিপ-টিপ জোগাড় করা যাবে? 'উইদাউট ব্যাটিং অ্যান আইলিড' যাকে বলে, কল্যাণ বলেছিল, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম কিছুক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে এ বিষয়ে, কিন্তু কল্যাণ সংক্ষিপ্ততম বাক্যে জানালো, কাল সকাল দশটা-এগারোটায় বেরিয়ে পড়বো।

ঝাড়গ্রামে এসেছিলুম রাধানাথ মণ্ডলদের গল্প চক্রের অধিবেশনে। সন্তোষকুমার ঘোষ মধ্যমণি। এক সন্ধ্যের ব্যাপার। পরদিন সকালে সন্তোষদা সদলবলে ফিরে গেলেন কলকাতায়, বাংলোয় শুধু স্বাতী আর আমি। এগারোটা বেজে গেল, কল্যাণের পাত্তা নেই। স্বাতী কল্যাণকে আগে দু'একবার মাত্র দেখেছে, সুতরাং সেই একটু উতলা হয়ে উঠতেই পারে। সাজ পোষাক করে, জিনিস পত্র গুছিয়ে আমরা তৈরি। এখন যদি কল্যাণ এসে বলে, জিপ পাওয়া গেল না—এই ধরনের চিন্তা।

সাড়ে এগারোটায় কল্যাণ এলো, শুধু জিপ নিয়ে নয়। সেই সঙ্গে চাল-ডাল-তেল-নুন-আলু-লঙ্কা-পেঁয়াজ-পাউরুটি-ডিম-মুর্গী ইত্যাদি যাবতীয় বাজার করে। কাঁকড়াঝোড়ে কিছু পাওয়া যায় না। এসব কথা কল্যাণ আমাকে একবারও বলেনি। জিপ থেকে নেমে শুধু বলেছিল, কাছেই ফরেস্ট অফিস আপনি ডি-এফ-ও'র সঙ্গে একটু কথা বলে বাংলোটার বুকিং করে নিন্। গেলুম ডি-এফ-ও'র কাছে। ইনি, শ্রীসুবিমল রায় আমাদের বন্ধু পার্থসারথি চৌধুরীর সহপাঠী, তা ছাড়া কাঁকড়াঝোড়ে বেশী লোক যায় না, সুতরাং বাংলো রিজার্ভেশানের ব্যাপারে কোনে সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। সমস্যা যে কিছু হবে না, সবই যেন কল্যাণের আগে থেকে জানা।

ড্রাইভার যুবকটি পোড়া তারগুলো টেনে টেনে বার করছেন, অন্যান্য ড্রাইভাররা উপদেশের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, আমার মনে হলো, এই অবস্থায় এই গাড়িকে টেনে নিয়ে যাওয়াই একটা সমস্যা হবে, আমাদের যাওয়া তো দূরের কথা।

কল্যাণ বললো, ঐ জন্যই তো ড্রাইভার আনি নি!

আমি বললুম, তার মানে?

—যার কাছ থেকে জিপটা এনেছি, তার দুটো জিপ। ভালো, নতুন জিপটা নবগ্রামে চলে গেছে, সেটা পেলে ভালো হতো। এটাতেও কাজ চলে যায়।

—কিন্তু এখন কী হবে?

—সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন না!

আমাদের জিপ চালক অন্যান্য ড্রাইভারদের কারুর কাছ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, কারুর কাছ থেকে প্লাস ইত্যাদি ধার চেয়ে চলেছেন, তারপর শুধু একটা লম্বা তার দিয়ে কিসের সঙ্গে কী জুড়ে দিতেই গাড়ির ইঞ্জিন আবার গ-র-র গ-র করে উঠলো। আমি হতবাক। এতগুলো বড়ো তারের বদলে মাত্র একটি তার!

কল্যাণ বললো। ঐ জন্যই তো ড্রাইভার আনিনি। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে ড্রাইভাররা কিছু করতে পারে না। এ একজন মেকানিক। গাড়ির মিস্ত্রি। গ্যারেজে কাজ করছিল, জোর করে তুলে নিয়ে এসেছি।

অর্থাৎ সেইজন্যই কল্যাণের আসতে আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল।

সত্যিই আবার দিব্যি জিপটি চলতে শুরু করলো। দহিজুড়ি ছাড়বার কিছু পরেই তরুণ-শালের জঙ্গল শুরু হয়। এ রাস্তা আমার বেশ চেনা। এ পথ দিয়ে অনেকবার বেলপাহাড়ীতে এসেছি।

আমরা বেলপাহাড়ীতে এসে পৌঁছোলাম বিকেলের দিকে। গাড়িকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। আমরা নেমে পড়লুম কল্যাণের চেনা একজন লোকের বাড়িতে। জিপ-চালক আবার বনেট উঁচু করলেন। এবার ব্যাটারির সঙ্গে তারটি লাগানো হয়েছে খুব আল্‌গা ভাবে, যাতে আবার কোনো গণ্ডগোল হলে একটানে খুলে ফেলা যায়।

যাঁর বাড়িতে নেমেছি, তিনি জাতিতে সিন্ধ্রি, চমৎকার মেদিনীপুরের টানে বাংলা বলেন, ইনি একজন বিড়ি পাতা ব্যবসায়ী। লক্ষপতি বললে খুব কম বলা হবে, অর্ধকোটিপতি বলাই বোধহয় সঙ্গত। এঁর বাড়িটির ছাদ টিনের, পেছন দিকে দু' আড়াই শো মজুর-মজুরনী কাজ করছে। কল্যাণ নিজেও বিড়ি পাতার ব্যবসায়ে নেমেছিল, বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে পিছু হটে এসেছে। বিড়ি পাতার ব্যবসায়ে যেমন ঝুঁকি, তেমনি লাভ, এরকম জানা গেল, এ অঞ্চলে সিন্ধ্রিরাই একচেটিয়াভাবে এ ব্যবসা করেছে এতদিন। সরকার আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির হাতে বিড়ি পাতার জঙ্গলের ইজারা দিতে চান, কিন্তু যা হয়, সিন্ধ্রি ব্যবসায়ীদের দক্ষতার তুলনায় কেউ কিছু না। সরকারী উদ্যোগে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয় প্রতি বছর।

চকচকে কাঁসার গেলাসে জল এবং পরে সর-ভাসা বেশী দুধের চা খেয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলুম। বেলপাহাড়ী জায়গাটি সমতল ও পাহাড়ী এলাকার ঠিক সংযোগ স্থলে। যতবার আসি, দেখি যে, বেলপাহাড়ীতে মানুষ ও বাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই মানুষ বাড়ছে তো বেলপাহাড়ীতেই বাড়বে না কেন?

পাহাড় জঙ্গলে ঢোকবার মুখে একজন ফরেস্ট গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে নিলুম। কারণ, ঝাড়গ্রামেই ডি এফ ও বলেছিলেন, কাঁকড়াঝোড়ে কয়েকদিন ধরে এক

পাল হাতি দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছরই ওরা আসে, তবে এবার যেন একটু আগে এসেছে। উত্তর বাংলার হাতিদের মতন এখানকার হাতি তেমন হিংস্র নয়, তবে একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলে দুষ্টুমি করে জিপটা উল্টে দিতেও পারে।

ফরেস্ট গার্ডটির শুকনো ক্ষয়াটে চেহারা। এমনই রোগা যে ওর কোমরের বেল্টে নিশ্চয়ই নতুন ফুটো করতে হয়েছে। হাতে একটা লাঠি, হাতি সামনে এসে পড়লে এই ব্যক্তি কীভাবে আমাদের সামলাবে?

কল্যাণ বললো, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলার খুব ভয়। এ অন্তত রাস্তা চিনবে।

এ কথায় আমাদের জীপ চালক জানালেন, আমি কাঁকড়াঝোড় সাত আটবার এসেছি, রাস্তা আমার মুখস্ত।

পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে জঙ্গলের মধ্যে পাথুরে রাস্তায় ঢুকতেই বুঝতে পারলুম, কেন, কাঁকড়াঝোড়ে বেশী লোক আসে না। কলকাতা থেকে কতই বা দূর, দুশো-আড়াইশো মাইলের মধ্যে। আজকাল কয়েকটি বেশ স্মার্ট ট্রেন চলে, তাতে আড়াই বা তিন ঘণ্টায় পৌঁছোনো যায় ঝাড়গ্রাম। সেখান থেকে মজবুত জিপ পেলে আর তিন ঘণ্টার মধ্যে কাঁকড়াঝোড়। এবং পথ চেনার জন্যও সঙ্গে কারুর থাকা দরকার, কেননা, বনের মধ্যে দিয়ে চোদ্দ কিলোমিটার যেতে যেতে অনেক শাল পথ, তার যে-কোনো একটি ধরে হারিয়ে যাওয়া খুব সোজা।

এ রাস্তা বিপজ্জনক নয়, দুর্গম। প্রায়ই বড় বড় চড়াই-উৎরাই, মাঝে মাঝে গর্ত। এক একবার কেনো গর্তে পড়ে গাড়িটি লাফিয়ে উঠলেই আমি ভাবি, ব্যাটারির তারটা ছিঁড়ে গেল না তো?

স্বাতী ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। যদি হাতি দেখতে পাওয়া যায়। একটু দূরে যে-কোনো গাছপালার জটলার দিকে তাকালেই যেন মনে হয়, ওখানে কোনো হাতি ঘাপটি মেরে আছে। কল্যাণের ধারণা পথে হাতি পড়বেই, কারণ সে এদিকে আগে হাতি দেখেছে নিজের চোখে। এক জায়গায় হাতির 'গোবর' পড়ে থাকতে দেখে কল্যাণ বললো, ঐ যে

এই রাস্তা দিয়েই গেছে। আমি অভিজ্ঞ শিকারীর ভাব নিয়ে ওকে জানালু‍ম
যে, ওটা অন্তত দু'দিনের পুরোনো।

কল্যাণের মতে, এই জঙ্গলে বাঘ নেই বটে, কিন্তু নেকড়ে আছে
ডি-এফ,ও'-ও আমায় বলেছিলেন, জঙ্গলের মধ্যে জিপের পেছনে পেছনে
কখনো কখনো নাকি কুকুরের মতন কোনো প্রাণীকে ঘাড় নিচু করে ছুটে
আসতে দেখা গেছে। যদিও নেকড়ে আজকাল খুবই দুর্লভ। জঙ্গলের
নেকড়েগুলোই এখন অ্যালসেশিয়ান হয়ে শহরের অনেক বাড়িতে
শোভা পায়।

হাতি কিংবা নেকড়ে কিছুরই দর্শন লাভ ঘটলো না। আমরা বাংলোর
কাছে এসে পৌঁছোলাম বিকেলের ব্রাহ্ম মুহূর্তে। জিপ থেকে নেমেই
বললুম, বা!

বাংলোটি এমনই জায়গায়, যেখানে গোল হয়ে ঘুরে তাকালে দেখা যাবে
শুধু জঙ্গল-মাখা পাহাড়। এখানে দাঁড়ালে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে
আমরা চলে এসেছি পৃথিবীর এক প্রান্ত সীমায়, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে
যদিও দুপুরবেলাতেই আমরা একটা শহরে ছিলাম।

শেষ বিকেলের রক্তাক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বাংলোটি আমাদের
মন কেড়ে নেয়। তা বলে এমন নয় যে এর থেকে ভালো বাংলো আমরা
আগে কখনো দেখিনি। বস্তুত, ফরেস্ট বাংলোগুলির চেহারা একই রকম
হয় প্রায়। তবু এক একটি সময় আসে, যখন সুন্দরের মধ্যে কোনো তুলনার
কথা মনে আসে না, চোখের সামনের বস্তুটিকেই মনে হয় পরম প্রাপ্তি
বড় বড় শাল গাছের মধ্যে একটি কাজু বাদাম গাছ দেখে স্বাতী মুগ্ধ
ও আগে কখনো ঐ গাছ দেখেনি।

কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো, আপনি চন্দন গাছ দেখেছেন?

স্বাতী তা-ও দেখেনি। কল্যাণ সংক্ষেপে জানালো, কাল সকালে
আপনাকে দেখাবো!

দেখতে না দেখতেই ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এলো। আমরা
বাংলোর মধ্যে ঢুকে ব্যাপৃত ছিলাম পোষাক পরিবর্তনে। এবং অল্প ক্ষণের
মধ্যেই কল্যাণ জানালো যে চা, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদি তৈরি।

বাংলোর বারান্দায় বসে দ্বিতীয় কাপ চা খাচ্ছি, এমন সময় একজন লোক দু' বোতল মহুয়া এনে রাখলো কল্যাণের পায়ের কাছে। কল্যাণ বোতল দুটি তুলে প্রথমে টোকা দিয়ে টং টং শব্দ শুনলো, তারপর ছিপি খুলে দু' তিনবার ঘ্রাণ নিয়ে বললো, হ্যাঁ, খাঁটি জিনিস। আমি হাসলুম।

কল্যাণের ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। শালের জঙ্গলে এসেছি, মহুয়া তো পান করবোই। আমরা পৌঁছানো মাত্রই কল্যাণ ঠিক মনে করে মহুয়া আনতে পাঠিয়েছে। কিন্তু হাসলুম এই জন্য যে, সময়ের কত বিচিত্র রকম খেয়াল! কল্যাণকে আগে যতবার দেখেছি, ওর দুরন্তপনায় হতবাক হয়ে গেছি, ওর শরীরে ও মনে অসাধারণ শক্তি, এক বোতল মহুয়া ও এক চুমুকে শেষ করে দিতে পারে। সারা রাত জেগে তাশ খেলে, সকালবেলা একটুও না ঘুমিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে, যখন যে জিনিসটি চায় সেটা পেতেই হবে…। সেই কল্যাণ যেন ধীর, শান্ত এবং কিছুদিন আগে তীব্র শ্বাসকষ্টের অসুখ হওয়ায় ও আগামী ন' মাস এক বিন্দুও অ্যালকোহল পান করবে না। ঠিক ন' মাস কেন, তা অবশ্য রহস্যময়।

নিজেই একটি গেলাসে খানিকটা মহুয়া ঢেলে কল্যাণ বললো, আগে একটু টেস্ট করে দেখুন, সুনীলদা। বৌদিও একটু চেখে দেখবেন নাকি? দেখুন না খাঁটি মহুয়ার মতন এমন ভালো জিনিস…

নিজে পান না করলেও অপরকে পান করাবার ব্যাপারে কল্যাণের উৎসাহ একই রকম আছে। একটু পরে সে মাংস রান্নার ব্যাপারে চৌকিদারকে নির্দেশ দেবার জন্য উঠে চলে গেল।

জঙ্গলটা ডুবে আছে অরব অন্ধকারে। সৌভাগ্যের কথা, আকাশ খুব পরিষ্কার। এত বেশী তারা একসঙ্গে দেখবার জন্যই মাঝে মাঝে অরণ্যে আসা দরকার। আকাশ তার এমন রূপ আর অন্য কোথাও দেখায় না। ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে নক্ষত্র পতন দেখা যায়। নক্ষত্র কিংবা উল্কা, পরিষ্কার চোখে পড়ে, একটা আলোর বিন্দু আকাশ থেকে খসে

পড়তে পড়তে, যেন আকাশের খুব কাছাকাছি এক দীর্ঘকায় শাল গাছের মাথার কাছে এসে নিভে গেল।

কল্যাণ মাংস রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছে। একবার সে বললো, বৌদি ঐ যে দেখুন! ওটা কিন্তু তারা নয়!

আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একটা আলোর বিন্দু আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাচ্ছে, নিচে খসে পড়ছে। সত্যিই সেটা তারা নয়, বিমানও নয়, সেটা কোনো রকেট নিশ্চিত। অসংখ্য রকেট তো এখন আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে খালি চোখে তারই একটাকে দেখতে পেয়ে আমরা বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করি।

জঙ্গল আর অরব রইলো না, একটু পরে দূরে, বহু দূরে শোনা গেল দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ। মাদল কিংবা খোল। কিন্তু এমনই আধোজাগা, গম্ভীর সেই শব্দ যে রীতিমতন রহস্যময় মনে হয়। যেন আদিম কালের পৃথিবীতে কেউ কারুর কাছে কোনো সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। আমরা চুপ করে শুনি। নৈশ ভোজের পর আমরা অন্ধকারের মধ্যে একটু হাঁটতে বেরোলুম। স্বাতী একবার খুব মৃদু ভাবে জিজ্ঞেস করলো, এখানে সাপ আছে? কল্যাণ বললো, তা তো থাকতে পারেই।

এবং হাতির দলও কাছাকাছি কোথায় রয়েছে সুতরাং রাত্রে বেশী দূ অ্যাডভেঞ্চার করা যায় না। এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে, এক দিকে আঙুল দেখিয়ে কল্যাণ বললো, ঐখানে আলো দেখতে পাচ্ছেন?

চোখ সরু করে আমরা দেখলুম, জঙ্গলের ফাঁকে, বোধহয় দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে, একটা আলোর রেখা, অনেক দূরের।

কল্যাণ বললো, ঐ দিকে ঘাটশীলা। কপার মাইনসের আলো।

অর্থাৎ ঘাটশীলায় গিয়ে আমরা দূরে যে পাহাড়ের রেখা দেখি সেই পাহাড়েরই কোনো চূড়ায় আমরা রয়েছি। ঘাটশীলায় কতবার গেছি কখনো ভাবিনি, দূরের ঐ পাহাড়গুলোতে কখনো থাকবো। চাঁদে যাবার পর কেউ যদি আঙুল দেখিয়ে বলে ঐ দ্যাখো, দূরে পৃথিবীর আলো—অনেকটা সেই রকম বোধহয়। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। পাহাড়ের অন্য দিকে কোথাও তখনও দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ

সেই গম্ভীর, রহস্যময় মাদলের শব্দ। বোধহয় সারারাতই সেই শব্দ শুনেছিলাম।

অরণ্যে দিন ও রাত্রি সত্যিই আলাদা! সকাল বেলা অনেক কিছুই আর রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর থাকে না। ভারতবর্ষে বোধহয় এমন অরণ্য একটিও নেই, যা সম্পূর্ণ নির্জন। দিনেরবেলা আমি সব জঙ্গলেই মানুষের যাতায়াত দেখেছি। শুধু যাতায়াত নয়, বসতিও।

সন্ধের পর আমরা এই বাংলোটিকে যত নিরিবিলি ভেবেছিলুম, সকালে উঠে দেখা গেল, আসলে ততটা নয়। বাংলোটি টিলার ওপরে, একটু নেমে গেলেই বেশ কিছু কোয়ার্টার, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। এবং জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি গ্রামও রয়েছে। অনেক জায়গায় চাষ আবাদও হয়। প্রকৃতির শোভা দেখলেই তো চলবে না, মানুষকে তো বাঁচতেও হবে!

সকালের প্রথম চা আমরা পান করলুম বাংলোর পেছন দিকে একটা বেশ উঁচু মিনারের মতন জায়গায়। এখান থেকে পাহাড়ের গোল মালাটি স্পষ্ট দেখা যায়। অরণ্য সবুজ, কিন্তু সবুজ মোটেই একটা রং নয়, অন্তত সাত রকম সবুজ তো এই এখানেই রয়েছে।

কল্যাণ খুব সন্তর্পণে একটি ঘাস ফুলকে আদর করে। তারপর একটি শাল গাছের গা থেকে খানিকটা আঠা ভেঙে এনে স্বাতীকে বলে, জানেন, এর থেকেই ধূপধূনোর ধূনো তৈরি হয়? স্বাতী জানতো না, এই সম্পূর্ণ নতুন তথ্যে ও অবাক হয়ে বললো, ওমা, তাই নাকি?

আমাদের তুলনায় স্বাতীই সবচেয়ে কম বার বন জঙ্গলে এসেছে। ও শাল ও সেগুন গাছের তফাৎ জানে না। ও জানতো না যে কুসুম গাছ বলে কোনো গাছ থাকতে পারে, যার ফলের নাম কুসুম ফল, এবং লোকে তাই খায়। কচি অবস্থায় যে গাছের পাতা থেকে হয় বিড়ির পাতা। সেই গাছই বেশ বড় মোটা, আর কালো হয়, তার নাম কেন্দু তখন তার পাতা কোনো কাজে লাগে না, কিন্তু কেন্দু ফল জঙ্গলের লোকদের খাদ্য। আমাদের তুলনায় স্বাতীর বিস্ময়বোধ অনেক টাটকা বলে, এই জঙ্গলকে ও উপভোগ করছে বেশী।

কল্যাণ আমার একটা অচেনা গাছের পাতা ছিঁড়ে বললো, দেখুন কী সুন্দর শেপ, শিরাগুলো কেমন চমৎকার ভাবে ছড়িয়ে গেছে—।

প্রতি বছর জঙ্গলের কিছু অংশ ইজারা নিয়ে গাছ কাটা কল্যাণের পেশা। কিন্তু ও গাছকে ভালোবেসে ফেলেছে। প্রতিটি গাছ ওর চেনা, ও জানে, কোন্ কোন্ গাছ কাটতে নেই, হঠাৎ হঠাৎ এক একটা গাছের দিকে তাকিয়ে ও বলে, দেখুন দেখুন, কী সুন্দর!

কল্যাণের এই পরিচয় আমি আগে জানতুম না। আগে প্রত্যেকবার দেখেছি এক দুরন্ত কল্যাণকে। সেই দুর্দান্তপনা এবং অনর্গল নেশা করার স্বভাব ত্যাগ করেছে বলে অন্য অনেকদিকে ওর মন খুলে গেছে। ও খালি চোখে আকাশের রকেট দেখতে পায়, দারুণ মুর্গীর মাংস রান্না করে, গাছের পাতার গড়নে মুগ্ধ হয় এবং আদিবাসীদের জীবন নিয়ে চিন্তা করে। এখন ওর হাতে অনেক সময়।

জঙ্গলে এসে সবচেয়ে ভালো লাগে এইটাই যে কিছুই করবার থাকে না। যতক্ষণ ইচ্ছে চুপচাপ বসে থাকা যায়, অথবা ইচ্ছে করলে যে-দিকে খুশী ঘুরে বেড়ানোও যায়। অলসভাবে সেখানে অনেক ক্ষণ কাটিয়ে তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লুম একটা মন্দির দেখবার উদ্দেশ্যে।

স্বাতীর খুব মন্দির দেখার শখ, বিশেষত যদি পুরোনো মন্দির হয়। কল্যাণ ইতিমধ্যেই এই মন্দির সম্পর্কে একটা রোমহর্ষক গল্প শুনিয়েছে। কাল ভৈরবের মন্দির, এককালে নাকি ওখানে নিয়মিত মানুষ বলি হতো, এখনো মাঝে মধ্যে হয় লুকিয়ে চুরিয়ে। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে গর্তের মধ্যে একটা বিরাট সাপ আছে, বলির রক্ত সেই সাপটা এসে চুক চুক করে খেয়ে যায়।

বাংলো থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে চন্দন গাছ দর্শন করলাম। কিছুদূরে কমলালেবুর গাছও লাগানো হয়েছে। চন্দন গাছের পাতায় বা ডালে কোনো গন্ধ নেই, শুনলাম, ঐ গাছে সুগন্ধ আসতে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর লাগে। শিকড়ে একটু একটু গন্ধ পাওয়া যায়, তাই কারা যেন মাটি খুঁড়ে খানিকটা শিকড় কেটে নিয়ে গেছে।

এদিকে জঙ্গল অনেক পাতলা। পর পর দুটি মকাই-খেত। তারপর একটি লাল রঙের ঝর্ণা। হাঁটু জল সেই ঝর্ণা পেরিয়ে, একটা ছোট পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আবার এলাম একটা সমতল মতন জায়গায়, যার পাশে একটি বেশ ছোট্ট খাট্টো খরস্রোতা নদী, আল্গা আল্গা ভাবে দাঁড়ানো কয়েকটি বহু পুরোনো বিশাল শাল তরু। তার মধ্যে একটি গাছের গায়ে হাত দিয়ে কল্যাণ বললো, এ গাছটার দাম কম করেও অন্তত দশ হাজার টাকা!

বিস্ময়ে আবার স্বাতীর ভুরু উঠে যায়। সান গ্লাস খুলে সে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোভাবে গাছটিকে দেখে।

কল্যাণ বললো, তবে এত বড় গাছ না-কাটাই উচিত।

এখানে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট মাটির তৈরি হাতির মূর্তি ছড়ানো। মন্দিরের তীর্থযাত্রীরা মানত্ করে গেছে। বাঁকুড়ায় যেমন ঘোড়া, এখানে সে রকম হাতি। তবে, মন্দিরটি আমাদের হতাশ করলো। কল্যাণকেও। আগে সে দেখে গিয়েছিল, খুব পুরোনো একটা মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি—তাতে পুরোনো পুরোনো গন্ধ ছিল। এখন তার বদলে ইঁট-শুকি দিয়ে একটা বদখত্ চেহারার মন্দির বানানো হয়েছে।

জায়গাটি অবশ্য সম্পূর্ণ জনশূন্য। মন্দিরের পূজারী-টুজারীও কেউ নেই। মন্দিরের সামনে একটি কাঠগড়া, তাতে এখনো শুকনো রক্ত লেগে আছে। মানুষের রক্ত নিশ্চয়ই নয়। মোষ বলিরই চলন বেশী আদিবাসীদের মধ্যে। মোষের নাম এখানে কাড়া। কল্যাণের মুখে শুনলাম, এখানে কাড়া বলির পর মুণ্ডুটা পায় পূজারী, আর বাকি মাংস ভাগ-যোগ করার উপায় থাকে না! তার আগেই সব লোক ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে যে যতখানি পায় নিয়ে পালিয়ে যায়।

জায়গাটা বেশ পরিচ্ছন্ন, শান্ত ও আবিষ্ট ধরণের। আমরা তিনজনে তিনদিকে বসে রইলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে কল্যাণ বললো, ভুল হয়ে গেল, একটা মহুয়ার বোতল সঙ্গে আনলে ভালো হতো। এটাও ওর নিজের জন্য নয়, আমার জন্য। ওর পূর্ব জীবনের স্মৃতি, এই রকম পরিবেশে একটু মহুয়ায় চুমুক দিলে বেশ জমে।

কতক্ষণ বসে ছিলাম খেয়াল নেই। কথা বলারও প্রয়োজন হয় না। বড় বড় শাল গাছগুলো মাথার ওপর ছত্রছায়া বিছিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে টিয়া পাখির ঝাঁক। এই বনে পাখিদের মধ্যে টিয়ারই প্রাধান্য। মুনিয়া পাখির চেয়েও ছোট একটা পাখির ঝাঁক দেখেছিলাম। আর দূরে কোথাও একটা কুবো ডেকে চলেছে।

সাপটাকে প্রথমে স্বাতীই দেখলো। জঙ্গলে আমাদের প্রথম সাপ। খানিকটা যেন অবিশ্বাসের সুরেই স্বাতী বললো, ওটা কি, সাপ না? আমরা থমকে তাকালুম।

সাপটা আমাদের তিন জনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় কী করে কখন এলো বুঝতেই পারিনি। আমরা যেমন অবাক হয়েছি, সাপটাও তার চেয়ে কম অবাক হয়নি। কয়েক মুহূর্ত আমাদের দেখেই সে বিদ্যুতের মতন এঁকেবেঁকে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কল্যাণ বললো, চন্দ্রবোড়া!

এটাই সেই মন্দিরের সাপ বলে বিশ্বাস করা যায় না। সাপটি বয়েসে বেশ তরুণ। বহুকাল ধরে এ বলির রক্ত পান করে যাচ্ছে, একথা মানতে পারি না, এর পিতৃ-পিতামহ কেউ এ কাজ করলেও করতে পারে। সাপটা এখনো ঝোপের মধ্যেই রয়েছে, সুতরাং এ সংসর্গে আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়, শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

ফেরার পথে কল্যাণ এক জায়গায় এসে দুঃখিত হলো। একটি মাঝ বয়েসী শাল গাছ পরাজিত যোদ্ধার মতন মাটিতে শুয়ে আছে। কোনো কাঠ-চোর এটিকে কেটেছে, সবটা নিয়ে যেতে পারেনি। ছেঁটে নিয়ে গেছে ডালগুলো। শুয়ে থাকা গাছ দেখলে আরও কষ্ট হয়। বিশেষত, 'দা সিক্রেট লাইফ অব প্লান্টস' বইটা পড়বার পর থেকে গাছ সম্পর্কে আমার ধারণা আমূল বদলে গেছে।

আর একটু এগোবার পর আমরা একটি উপহার পেলাম। একটি কাচ পোকা কিংবা টিপ পোকা। সমস্ত বন মাতিয়ে বোঁ বোঁ শব্দ করতে করতে উড়ে এসে সে আমাদের সামনেই একটা নিচু গাছে এসে

নলো এবং কল্যাণ অমনি খপ করে ধরে ফেললো সেটাকে। এত বড়
প পোকা আমি আগে কখনো দেখিনি। কী অপূর্ব সুন্দর তার রং, উজ্জ্বল
াল ও সোনালি। পাখিদের মধ্যে যেমন ময়ূর, পোকাদের মধ্যে তেমনি
ই টিপ পোকাদের কেন যে এত রঙের সৌভাগ্য, তা কে জানে! মজা
ই যে, পোকাটিকে ধরে কল্যাণ ওর বাঁ হাতের তালুতে উল্টো করে শুইয়ে
খতেই সে দিব্যি গুটি সুটি মেরে শুয়ে রইলো। যেন তাকে কেউ
খছে না।

লাল রঙের ঝর্ণাটা পার হবার পর আমরা মাদলের শব্দ শুনতে পেলুম।
ল্যাণ বললো, কাছেই একটা ছোট গ্রাম আছে, চলুন, সেদিক দিয়ে ঘুরে
াই।

গ্রাম মানে কী। আট দশটা কাঁচা বাড়ি। তারই একটা বাড়ির মধ্যে
কজন লোক মাদল বাজাচ্ছে, আর একজন নাচছে, আর তাদের ঘিরে
সছে অনেকে। বাজনদার বা নাচুনে, কারুরই শরীর নিজের বশে নেই,
। টলমল, মহুয়ার নেশায় একেবারে চুর চুর। কিন্তু বাজনা বা নাচের
ৎসাহ ওদের একটুও কম নয়।

আমাদের খাতির করে একটা খাটিয়ায় বসতে দেওয়া হলো।

এই জঙ্গলে তিন জাতের মানুষ থাকে। লোধা বা শবর, তারা এখনো
উণ্ডুলে, শিকার টিকার করে খায়, বা দিন মজুরির কাজ করে, চুরির
ক্ষতার ব্যাপারেও তাদের সুনাম আছে, কিন্তু তারা চাষবাস জানে
। দ্বিতীয় দল সাঁওতালরা বেশ সুসভ্য, তারা শিকার ও চাষ দুটোই
নে এবং দুপুরবেলা মহুয়া খেয়ে নাচ-গান নিয়ে আনন্দ করতে
ানে শুধু তারাও। আর আছে মাহাতোরা, তারা অন্যদের তুলনায় কিছুটা
চ্ছল

এ বাড়িটা যে সাঁওতালদের, তা দেখেই বোঝা যায়। লোকজনের পায়ে
য় ঘুরছে—কয়েকটি একেবারে সদ্যোজাত, একদিন বা দুদিন বয়েসী
ির ছানা। ওগুলোকে ঠিক চলন্ত কদম' ফুলের মতন দেখায়।
টু দূরে বাঁধা একটা ছাগলও নাচ দেখছে এক দৃষ্টে। স্বাতীর কাছে
সবই নতুন। আগেকার দিনে হলে আমিও মহুয়া খেয়ে ওদের সঙ্গে

নাচে যোগ দিতাম। স্বাতী সঙ্গে রয়েছে বলেই শান্ত, সুশীল হয়ে বসে রইলুম। কল্যাণ আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

দরজার কাছে দাঁড়ানো একজন মাঝ বয়েসী রমণী মাঝে মাঝে নাচ চাঙ্গা করবার জন্য একটা গান ধরেছে। বেশ গলাটি। গানের ভাষা কিন্তু একেবারেই দুর্বোধ্য নয়, পুরোপুরি বাংলা, পথের মাঝে বৃষ্টি আসিল, ব আমার বান্ধা পড়িল—এই ধরনের। যে নাচছে এবং যে ঢোল বাজাচ্ছে এই দুজনের মধ্যে কেউ একজন ঐ মহিলাটির স্বামী, ঠিক কোনজন তা বুঝতে পারলুম না, বাজনার তালে ভুল হলে কিংবা নাচনেটি বেশী ঢলে পড়লে সে বকছে দুজনকেই। নাচুনেটির স্বাস্থ্য চমৎকার, চকচকে কালো শরীরটি ঘামে ভেজা, এত নেশাগ্রস্ত অবস্থাতে সে কিন্তু একবারও মাটিতে পড়ে যাচ্ছে না সে যেন আজ সারাদিন ধরে নাচবার জন্য বদ্ধপরিকর। মহিলাটির গানের প্রতি আমি একবার তারিফ জানাতেই সে অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, বাবু আমার ন'খান' ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ সে যেন জানাতে চায় যে নটি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও সে গান গাইতে পারে। এটা একটা জানাবার মত কথাই বটে।

আমি একটু কৌতুক করে বললুম, পুরোপুরি দশটা হলেই তো ভাল হতো!

তার উত্তরে সে উদাসীন গলায় বললো, হয়ে যাবে। দশটাও হয়ে যাবে এই তো আমাদের একমাত্র সুখ!

স্বাতী আমার দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গি করলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক দেখার পর আমরা উঠে পড়লুম। একটু দূরে এসেছি, তখন পেছনে পেছনে সেই মহিলাটিও আসছে। অযাচিতভাবেই সে বল ওটা আমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি ঐ সামনে। আমার দেখবে না?

বিশেষত সে স্বাতীকে বললো, ও মেয়ে, তুমি আমার বা দেখবে না

গেলুম তার বাড়িতে। এর বাড়ির উঠোনটিও অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভা

কোনো। এক পাশের চালাঘরে একটি ঢেঁকি, তার পাশের খাটিয়ার সলুম আমরা। মহিলাটি কথা বলতে ভালোবাসে।

আমাদের সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করে জানবার পর সে বললো যে তার বড় ময়ে অনেকদিন পর বাপের বাড়িতে এসেছে বলে সেই আনন্দের চোটে তার ময়ের বাপ মহুয়া খেয়ে নাচতে গেছে। ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত কৌতুকের, ইভাবে সে হাসতে লাগলো খিল খিল করে।

তিন গেলাস কুয়োর জল খেয়ে আমরা উঠে পড়তে যাচ্ছি, তখন মহিলাটি অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বললো, এ কি, তোমরা চলে যাচ্ছো? খেয়ে যাবে না, আমি যে ভাত চাপাচ্ছি?

আমরাও হতভম্ব। এদের দারিদ্রের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা আমাদের পক্ষে ত্যিই বুঝি অসম্ভব। অচেনা কোনো মানুষ বাড়িতে এলে আমরা কানোদিনই তাকে খেয়ে যেতে বলতে পারবো না।

রমণীটি আবার দুঃখিতভাবে বললো, আমার বাড়িতে এসে তোমরা না খয়ে চলে যাবে?

আমরা অত্যন্ত অপরাধীর মতন, বিনীত ভাবে বললুম আজ নয়, আর কদিন আসবো, নিশ্চয়ই এসে খেয়ে যাবো!

সে অবিশ্বাসের সুরে বললো, হ্যাঁ, আর এসেছো!

সারা বছর ভাত খাওয়া ওদের কাছে বিলাসিতা। মন্দির থেকে ফেরার থে একজন স্ত্রীলোককে দেখেছিলাম, তার কাঁখালে একটি রোগা শিশু। াথায় এক বোঝা শুকনো ডালপালা আর হাতে দুটি সবুজ পাতায় মাড়া কী যেন। সে স্ত্রীলোকটি বাংলা বুঝতে পারে না, কল্যাণ তার ঙ্গে আদিবাসীদের ভাষায় কথা বলে ঠোঙা দুটি দেখতে চাইলো। াতে আছে কিছু থেঁৎলানো বুনো জাম আর কিছু ব্যাঙের ছাতার মতন জিনিস।

কল্যাণ আমাদের বলেছিল, ঐগুলোই ঐ মা-ছেলের সারাদিনের খাদ্য। ই জঙ্গলের অনেকে মাটি খুঁজে খুঁজে এক ধরনের বুনো আলু পায়, তাই য়ই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। অনেকে শাল গাছের ডগার কচি াতাও সেদ্ধ করে খেয়ে নেয়। আর ঐ স্ত্রীলোকটি আমাদের তিনজনকে

অকারণে ভাত খেয়ে যেতে বলছিল। হয়তো, কিছু বিক্রি করে হাতে কিছু ধান এসেছে।

বাংলোয় ফিরে এসে আমরা খানিকক্ষণ চুপ করে বসলুম। এখান থেকে সেই সব বাড়িঘর কিছুই দেখা যায় না। শুধু দিগন্ত ছোঁয়া জঙ্গল আর পাহাড়। চোখকে আরাম দেওয়া প্রকৃতি। এরই মধ্যে মধ্যে র গেছে ক্ষুধার্ত মানুষ, আবার দুপুরবেলা নেশা করে নাচবার মতন মানুষ, অতিথি সেবার জন্য ব্যাকুল মানুষ। কয়েকটি ক্ষুধার্ত, অসহিষ্ণু হাতিও ঘুরে কাছাকাছি।

কল্যাণ টিপ পোকাটাকে পাতায় মুড়ে লতা দিয়ে বেঁধে একটা প্যাকেট বানিয়ে নিয়েছিল। সেই প্যাকেটটা বারান্দার ওপর রাখতেই পাতার একটু অংশ কেটে টিপ পোকাটি মুখ বার করলো। বেশ কৌতূহলী চোখ দিয়ে দেখতে লাগলো আমাদের।

স্বাতী বললো, ওটাকে ছেড়ে দিন। পোকাটাকে মেরে টিপ পরবার ইচ্ছে আমার নেই।

কল্যাণেরও সেই রকমই ইচ্ছে। পাতাটা খুলে সে পোকাটাকে হাতে করে উড়িয়ে দিল।

টিপ পোকাটা বোঁ শব্দ করে দু'পাক ঘুরলো আমাদের মাথার ওপরে তারপর দুর্দান্ত গতিতে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

ছাব্বিশ

আমি হাসতে হাসতে বললুম, যদি বলি, আমার বুকে বাঘের ছাপ আছে, কেউ বিশ্বাস করবেন ?

সত্যিই কেউ বিশ্বাস করলো না, সবাই এমন ভাবে চক্ষু অবনত করলো যেন এই নিস্তব্ধ, নিমীল সন্ধ্যায় আমি কোনো অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এখানে এসব কথা মানায় না।

আমি আবার বললুম, সত্যিই বলছি কিন্তু, ইয়ার্কি নয়। একবার একটা বাঘ দু'পা তুলে দাঁড়িয়েছিল আমার বুকে।

এবার শ্রোতারা চক্ষু তুললো। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স্ক কিশোর মাঝিটি জিজ্ঞেস করলো, সার্কেসের বাঘ, বাবু।

কথা হচ্ছিল সুন্দরবন অঞ্চলে এক বিশাল চওড়া নদী বক্ষে একটি খোলা নৌকোর ওপর। বেরিয়েছিলুম সারাদিনের মনে, এই নৌকোর ওপরেই খিচুরি ভোগ হলো, রান্না করলুম নিজেরাই। আর এমন খিচুড়ি জীবনে খাইনি, কী অমৃতের মতন স্বাদ !

আমার সঙ্গে আমার এক কলকাতার বন্ধু, তার এক স্থানীয় বন্ধু, একজন স্কুল শিক্ষক। আমি ছাড়া বাকি এই তিনজনেরই সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোগ দীর্ঘদিনের, এই অঞ্চলের অনেক কিছুর খবরাখবর রাখেন। মাঝিদের মধ্যে একজনের বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোনো জায়গায়, রোদ বৃষ্টিতে পোড়া-ভেজা লোহার মতন গড়া-পেটা শরীর, মুখে অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ। আর একজন ঐ পূর্বোক্ত কিশোর।

সুন্দরবনে এলেই বাঘের কথা মনে পড়ে। এর আগে কয়েকবার লঞ্চে চড়ে সুন্দরবন ঘুরে গেছি, কিন্তু সে শুধু প্রকৃতি দেখা। এবারে এসে আশ্রয় নিয়েছি একটি গ্রামে। যার পাশের গ্রামেই একটি ছটকে আসা বাঘ ধরা পড়েছে কিছুদিন আগে। সে বাঘটিকে রাখা হয়েছে কলকাতার

চিড়িয়াখানায়, তার নাম দয়ারাম। আমি এখানে এসে পৌঁছোবার পরের দিনই নদী সাঁতারে মোল্লাখালিতে এসে উঠেছিল একটা বাঘিনী, গ্রামের লোকজন সেটাকে ঘিরে রেখেছিল, ভেবেছিলুম সেটাকে দেখতে যাবো, বিকেলেই খবর পেলুম ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নীতির তোয়াক্কা না করে সেটিকে মেরে ফেলেছে। সুন্দরবনে ভগবানের চেয়েও বাঘের কথাই বেশী স্থান পায় আলাপচারিতে। এবারে নৌকোয় বেরিয়ে বুঝলুম, লঞ্চ-ভ্রমণের সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। নৌকোয় বসে নদীকে অনেক কাছে পাওয়া যায়, দু'পাশের জঙ্গলকে আমরাই শুধু দেখি না, জঙ্গলও আমাদের দেখে।

বাঘ সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের শহুরে কৌতুহল আছে। সেইজন্য আমি বারবার সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলুম, আপনারা কেউ বাঘ দেখেন নি? নিজের চোখে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার নৌকার সহযাত্রীরা সবাই নেতিবাচক ভাবে মাথা নাড়লো। এরা সবাই সুন্দরবনের নাড়ি নক্ষত্র জানে, এতদিন এখানে রয়েছে, অথচ কখনো বাঘ দেখেনি! আমি বাঘ সম্পর্কে রোমাঞ্চকর একাধিক গল্প শুনবো আশা করেছিলুম। বেশ নিরাশ নিরাশ লাগলো। তখন আমি শুরু করলুম এক লোমহর্ষক কাহিনী।

কিশোর মাঝিটির প্রশ্ন শুনে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম, ধরো যদি সার্কাসের বাঘই হয়। একটা সার্কাসের বাঘ যদি তোমার বুকে পা তুলে দাঁড়ায়, তুমি ভয় পাবে না?

ছেলেটি হে হে করে হাসতে লাগলো।

ইস্কুল মাস্টার এবার জিজ্ঞেস করলেন আপনি সত্যিই সার্কাসের বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলেন নাকি?

আমি বললুম, না। বাঘের থেকেও আমি শত হস্ত দূরেই থাকাই ভালো মনে করবো। পাকে চক্রে একবার আমি সত্যিই একটা মস্ত বড় কেঁদো বাঘের খপ্পরে পড়েছিলুম। ব্যাপারটা হয়েছিল উড়িষ্যায় যোশীপুরে—।

আমার কলকাতার বন্ধুটি যার নাম শিবাজী, সঙ্গে সঙ্গে বললো, ও, খৈরি ?

নৌকোর অন্যান্য সুন্দরবনবাসী সঙ্গীরা কেউ খৈরির নাম শোনেনি। এদিকের লোকের সঙ্গে খবরের কাগজের বিশেষ সম্পর্ক নেই। বড়-মাঝি জিজ্ঞেস করলো, খৈরি কি দাদা ?

রায়মঙ্গল নদী ছাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সমুদ্রের দিকে। ডান দিকে দত্ত ফরেস্ট, সেখানে বাঘ নেই খুব সম্ভবত। বাঁ দিকের জঙ্গলটা বাঘের এলাকা বলে নির্দিষ্ট, আমরা চলেছি সেই ধার ঘেঁষেই। একটা জায়গায় নদীর জল খানিকটা খাঁড়ির মতন ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, সেখানটার নাম কালীর চর সেখানে হাজার হাজার হাঁস এসে বসে। আমাদের গন্তব্য সেইদিকেই। সেখানে বাঘের উপদ্রবের ভয় আছে, আমরা কেউ শিকারী নই। সঙ্গে অস্ত্রও নেই, দূর থেকে পাখিগুলি দেখে আসাই উদ্দেশ্য।

এই পরিবেশে আমি জমিয়ে বাঘের গল্প শুরু করলুম।

অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে সুখকর ছিল না মোটেই, খানিকটা হাস্যকর হলেও হতে পারে। সেবারে যাবার কথা ছিল সিমলিপাল জঙ্গলে। কলকাতা থেকে ট্রেনে ঝাড়গ্রাম, সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বারিপদা, সেখান থেকে আবার একটা গাড়ি কোনো ক্রমে জোগাড় করে যোশীপুর। অবশ্য সিমলিপাল যাবার জন্য এত ঘুর পথে যাবার কোনো দরকার হয় না, কিন্তু আমাদের ভ্রমণটাই উল্টোপাল্টা। যোশীপুরে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমরা জিপ নিয়ে ঢুকবো জঙ্গলে, সেই অনুযায়ী যোশীপুরে বাংলো বুক করা ছিল। কিন্তু তখন খৈরির কথা মনেই পড়েনি।

যোশীপুর বাংলোর কম্পাউণ্ড মস্ত বড়, মনে হয় যেন বাংলোর পেছন থেকেই জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। ঘরগুলোর সামনে বেশ বড় একটি ঢাকা বারান্দা। লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢোকার পরই দেখলুম, একটু দূরে গাছ পালার মধ্যে ঘুরছে একটা হলুদ-কালো ডোরাকাটা কী যেন! সত্যিই একটা বাঘ! আমরা এসে গেলে বারান্দাটায় বসতে না বসতেই বাঘটা চলে এলো সেখানে। ডি এফ এ শ্রীযুক্ত চৌধুরীও সেখানে বসে বন

কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, সংক্ষেপে আমাদের জানালেন, ভয় পাবেন না। ও কিছু করে না!

বাঘটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে গন্ধ শুঁকতে লাগলো। আমাদের মধ্যে কারুকে তার পছন্দ হবে কি হবে না, কে জানে! আমি বড় সাইজের কুকুরও সহ্য করতে পারি না। কারুর বাড়িতে অ্যালসেশিয়ান কুকুর থাকলে সে বাড়িতে পারত পক্ষে যাই না। আমি লক্ষ্য করেছি, যাদের অ্যালসেশিয়ান থাকে, তারাও ঠিক ঐ ভাবেই বলে, "ভয় পাবেন না! ও কিছু করে না!" কিছু করে করে না মানে কি, কাছে এসে গন্ধ শুঁকবেই বা কেন?

একটু বাদে বাঘটা আবার বাগানে চলে গেল। আমরা চলে এলুম আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে। জামা কাপড় ছাড়বো কিনা ভাবছি, হঠাৎ শুনি জানালার কাছে মৃদু গর্জন। এবং বাঘের মুখ। বাঘটা জানলা দিয়ে আমাদের একটু ক্ষণ দেখলো, তাবপর ঢুকে এলো আমাদের ঘরে। তার আগেই আমরা দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু একজন মহিলা (পরে জেনেছি, তাঁর নাম নীহার চৌধুরী) বলে উঠলেন, দরজা বন্ধ করবেন না! ও বন্ধ-দরজা দেখলে রেগে যায়!

একটা বাঘকে খুশী করার জন্য আমাদের দরজা খোলা রাখতে হবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাঘ এসে ঘোরাঘুরি করবে, এটাই বা কেমন কথা! সারা ঘরে বাঘ-বাঘ গন্ধ! আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম তাড়াতাড়ি। আবার এসে বসলুম বারান্দায়। যোশীপুরের এই বাঘটি সাধারণ বনের বাঘের চেয়েও আয়তনে অনেক বড়। একে রোজ আট কেজি মাংস ও একটিন আমূল গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো হয়। বনের বাঘ রোজ এত খাবার পাবে কোথায়? এর পেটে চর্বি থল্ থল্ করছে। বারান্দায় বসে শ্রীমতী চৌধুরী তাঁর পালিতা কন্যা এই খৈরি বিষয়ে নানান কাহিনী শোনাতে লাগলেন। আমরা গল্প শুনছি বটে, কিন্তু আমাদের সকলের চোখ লক্ষ্য রাখছে বাঘটা কত দূরে। আমাদের পাঁচজন বন্ধুর দলের মধ্যে রয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সে ঐ খৈরি বিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি ছোটদের বই লিখে ফেলেছে। সুতরাং তার ভয় পেলে চলে না। শ্রীমতী চৌধুরীর সঙ্গেও

তার আগে থেকে চেনা, সুতরাং ঐ সব গল্প সেই উপভোগ করতে লাগলো বেশী।

এর পর হলো বাঘের ভোজন পর্ব। বাগানে এর জায়গায় ধপাস্ করে পড়লো খৈরী, আর মা যেমন নিজের শিশুর মুখে খাদ্য তুলে দেয়, সেই ভাবে শ্রীমতী চৌধুরী ওর মুখে মাংস পুরে দিতে লাগলেন। কিন্তু বাঘ এক জায়গায় বসে খায় না। এক এক গেরাস মুখে দিয়েই সে উঠে পড়ছে, চলে যাচ্ছে বাগানের দিকে, অনেক সাধ্য সাধনা করে ডেকে আনা হচ্ছে তাকে। এক সময় বাঘটা হঠাৎ উঠে এলো বারান্দায়, এবং নিমাই নামে আমাদের এক বন্ধুর বাঁ হাতের কনুই শুদ্ধু অনেকখানি মুখে ভরে দিল। এবার একটু চাপ দিলেই নিমাইয়ের বাঁ হাতখানা চিরতরে বাঘের পেটে চলে যাবে। বাঘটার হঠাৎ এরকম মতি গতির কারণ কী? ওর কি মোষের মাংস পছন্দ হয়নি বলে ও টাটকা মাংসের সন্ধানে এসেছে? ডি এফ ও শ্রীযুক্ত চৌধুরী যথারীতি বললেন, ভয় পাবেন না, ও কামড়াবে না।

ভয়ে মানুষের চুল খাড়া হয়ে যাবার কথা শুধু বইতেই পড়েছিলুম, এবার স্বচক্ষে দেখলুম। নিমাইয়ের মাথার চুল সত্যিই খাড়া হয়ে গেছে, কাঁপা কাঁপা গলায় সে বললো, ওকে সরিয়ে নিন, নইলে নইলে আমরা অজ্ঞান হয়ে যাবো! ভয়ের চোটে নিমাই আমির বদলে আমরা বলে ফেলেছে। আমরা সশঙ্ক চিত্তে অথচ খানিকটা হাসতে হাসতেও, দেখতে লাগলুম ওকে। এই হাসির শাস্তি আমি পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই!

বাঘটা নিমাইকে ছেড়ে এদিক ওদিক চেয়ে গজরাতে লাগলো। বাঘের ডাকের সঙ্গে মানুষের জন্ম জন্মান্তরের ভয়ের সম্পর্ক। পোষা বাঘ হোক আর যাই হোক, এরকম ডাক শুনলে বুক আপনিই কেঁপে ওঠে।

বাঘটা এবার চলে এলো সোজা আমার দিকে। তারপর সে আমার ডান দিকের বগলের মধ্যে ঢুঁ মারতে লাগলো। যেন সে আমার বগলের মধ্যে অতবড় মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে চায়। আমি অসহায় ভাবে তাকালুম শ্রীমতী নীহার চৌধুরীর দিকে! তিনি স্নেহের হাসি দিয়ে বললেন, ও কিছু না। ও ঘামের গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসে। তখন ঘাম মানে কী! আমার সারা শরীর দিয়ে কুলকুল করে ঘামের নদী বইছে!

বাঘটা আর একবার ঢুঁ মারতেই আমি অটোমেটিক্যালি উঠে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও দাঁড়িয়ে দুটো থাবা রাখলো আমার বুকে। সেই কয়েকটি মুহূর্ত আমি জীবনে কখনো ভুলবো না। আমার শরীরের ওপরে একটা বিরাট কেঁদো বাঘ, আমার চোখের সামনে ওর জ্বলন্ত চোখ, সেই অবস্থায় বাঘটা ফ-র্-র্ র করে থুতুতে ভিজে গেল আমার মুখ ও জামা। ওরই মধ্যে আমি ভাবলুম বাঘটা যদি আমায় না-ও কামড়ায়, আমি যদি বাঘটাকে শুদ্ধু মাটিতে পড়ে যাই, তাহলে ওর অতবড় দেহের ভারেই আমি ছাতু হয়ে যাবো। শ্রীমতী চৌধুরী বারবার বলতে লাগলেন, ভয় পাবেন না, নড়বেন না, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিন। কিন্তু হাত তোলার সাধ্য আমার নেই, আমার সারা শরীর অসাড়। আমারও মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল কিনা তা তো আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে ঐ অবস্থায় আর একটুক্ষণ থাকলে আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতুম!

ইতিমধ্যে 'খৈরি, আমার খৈরি' গ্রন্থের প্রণেতা শক্তি আমার পাশ থেকে সুট্ করে উঠে গিয়ে সোজা চলে গেছে গেটের দিকে। নিমাই বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে বললো, আমি সারারাত এই মাঠে শুয়ে থাকবো, তবু ওর মধ্যে আর যাবো না। আমাদের দল নেতা পার্থসারথি চৌধুরী বললো, নাঃ, ঐ বাঘের সঙ্গে রাত্রিবাস করা মোটেই কাজের কথা নয়। চলো, এক্ষুনি জঙ্গলে চলে যাই! তাই হলো, আমরা রওনা দিলুম সেই দণ্ডেই। গল্প বলা শেষ করে আমি আমার বুকে হাত বুলিয়ে বললুম, এই যে ঠিক এই জায়গায় বাঘটা তার থাবা রেখেছিল।

শ্রোতারা সবাই চুপ। একটু পরে বড় মাঝিটি শুধু খানিকটা বিস্ময় খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে বললো, শখ করে কেউ বাঘ পোষে? থুঃ! ওটাকে মেরে ফেলে না কেন?

আমি বললুম, মারবে কী? ঐ বাঘটা খুব বিখ্যাত, সারা পৃথিবীর অনেক পত্র পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হয়েছে।

বড় মাঝি আবার নদীর জলে থুতু ফেললো। টাইগার প্রজেক্টের জন্য সুন্দরবনে বহু টাকা খরচ করে কত রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে, কিন্তু সুন্দরবন এলাকার যতজনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তারা সকলেই বাঘকে শত্রু বলে

মনে করে, এবং তাদের মতে বাঘ নামক প্রাণী জাতিটাকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন নেই।

আস্তে আস্তে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে! কালীর চরের বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। খাড়ির মধ্যে অনেক হাসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি বটে, কিন্তু আলো কমে আসায় আর ঠিক মতন দেখা যাচ্ছে না। আমি আর একটু ভেতরে যাবার কথা বললুম, কিন্তু মাঝি বা অন্য কেউ রাজি হলো না। একটু পরেই ভাঁটা শুরু হলে ফেরা মুস্কিল হবে। তা ছাড়া জায়গাটা ভালো নয়। এই বনে বাঘ আছে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভয় ডাকাতের। আমি বললুম, আমাদের কাছে তো টাকা পয়সা কিছু নেই, ডাকাত আমাদের কী করবে? মাস্টার মশাইটি বললেন, এখানকার ডাকাতদের ব্যাপার আপনারা জানেন না। কিছু না পেলে ওরা জামা কাপড় খুলে নেয়। আপনি যে প্যাণ্ট-শার্ট পরে আছেন, তার দামও তো কিছু না হোক সত্তর আশী টাকা। আর এই নৌকোটা, এরও তো দাম আছে। জামা প্যাণ্ট খুলে নিয়ে ওরা লোককে এই জঙ্গলের পাশে নামিয়ে দিয়ে যায়।

আমি পাশের জঙ্গলের দিকে তাকালুম। দিনের বেলা দেখতে চমৎকার লাগছিল। এখন অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সেই জঙ্গলের দিকে তাকাতেই গা ছম্ ছম্ করছে। নগ্ন অবস্থায় রাত্রিবেলা এই জঙ্গলের পাশে পড়ে থাকা মোটেই উপাদেয় চিন্তা নয়।

সকলেরই মত হলো, তা হলে এবার ফেরা যাক! কিন্তু খুব নির্বিঘ্নে ফেরা গেল না। একটুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো ভাঁটার টান, এখন উল্টো দিকে যাওয়া যাবে না। আমাদের নৌকো একটা চরে আটকে গেল। জোয়ার আসবে ঘণ্টা দেড়েক বাদে।

আমাদের নৌকোটা অবশ্য জঙ্গলের খুব কাছে নয়। কোনো বাঘ হঠাৎ এক লাফে নৌকোর ওপর পড়তে পারবে না, সাঁতরে আসতে হবে। এই নদীর জলেও খুব কামঠের উপদ্রব, এবং কুমীর প্রকল্পের উদ্যোগে কিছুদিন আগেই এই নদীতে চল্লিশটি কুমীরের বাচ্চা ছাড়া হয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। জঙ্গলের দিকে

তাকালেই মনে হয়, একটা বাঘ বুঝি আমাদের এক দৃষ্টে দেখছে। খুবই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এ জঙ্গলে জোনাকিও জ্বলে না। কিন্তু বাঘের চেয়ে ডাকাতের কথাই আমার মনে পড়তে লাগলো বেশী।

বড় মাঝিকে আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, আপনি এতদিন সুন্দরবনের নদীতে নৌকো চালাচ্ছেন, সত্যিই কখনো বাঘ দেখেন নি?

বড় মাঝি বললেন, না!

তারপর যেন একটু ধমকের সুরেই আমায় আবার বললো, বাবু একটু চুপ করেন তো! অথবা এই সময়টা আপনি একটু ঘুমিয়ে লিন বরং।

আমি একটু ক্ষুন্ন হলুম। এই ভর সন্ধেতে হঠাৎ আমি ঘুমোতে যাবো কেন? তবে নৌকোর অন্য আরোহীদের মধ্যে যেন একটা ঝিমুনির ভাব এসে গেছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। অগত্যা আমিও চুপ করে গেলুম।

এক সময় নৌকোর তলায় জলের কলকল শব্দেই টের পাওয়া গেল জোয়ার এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন এক সঙ্গে জেগে উঠলো। নৌকো চললো আবার। রাত সাড়ে দশটায় আমরা ফিরে এলুম আমাদের গ্রামের কাছে।

জেটিতে নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসার পর বড় মাঝি বললো, দাদা, আপনি বাঘের কথা জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন না? এই ছাখেন। টর্চটা মেরে ছাখেন।

এই বলে সে জামাটা তুলে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। টর্চের আলোয় দেখলুম, তার পিঠে গভীর ক্ষত। খুব বেশী পুরোনোও মনে হলো না।

মাস্টার মশাই বললেন, ওর কী কড়া জান্, বাঘে কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরও বেঁচে উঠেছে।

বড় মাঝি দম্ভ করে বললো, আমারে খাবে, এমন বাপের ব্যাটা বাঘ আজও জন্মায় নি, বোঝলেন!

মাস্টারমশাই বললো, ও বাঘের গুনিন। সবাই ভাবে, সেই জন্যই বাঘে ধরার পরও বেঁচে উঠেছে।

ওদের মুখ থেকে আরও শুনলুম, এই মাঝি তার এই নৌকো নিয়ে প্রায়ই জঙ্গলে যায় বে-আইনী কাঠ কাটতে। সুন্দরবনের অনেকেরই জীবিকার সঙ্গে

কাঠ জড়িত। একবার নয়, মোট পাঁচ বার, ঐ মাঝি দলবল নিয়ে বাঘের সামনে পড়েছে' তবু আবার যায়। ডাকাতের পাল্লায়ও পড়েছে অনেক বার। অন্য বন্ধুটি বললো, দীনেশ নামে একটি ছেলে তার বাড়িতে কাজ করতো, মাত্র মাস খানেক আগে সে এই রকম একটি কাঠ কাটার দলের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরে নি।

এদের সকলেরই বাঘ বা ডাকাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু নৌকোর ওপর বসে আমি যখন এদের কাছ থেকে দু' একটা ঘটনা শুনতে চাইছিলুম, তখন সবাই চুপ করে ছিল কেন? মাস্টারমশাই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, জঙ্গলের কাছে বাঘের এলাকার মধ্যে গিয়ে বাঘের গল্প করা তো দূরের কথা, কেউ বাঘের নামও উচ্চারণ করে না। ঐ প্রসঙ্গ তুলে আমিই ভুল করেছিলুম।

সত্যিই আমার ভুল হয়েছিল।